

# বাংলার কীট-পতঙ্গ

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য



20/-

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

# বাংলার কীট-পতঙ্গ



আশা প্রকাশনী
৭৪ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০০০৯

Banglar Keet-Patanga
Gopal Chandra Bhattacharya



প্রথম প্রকাশ
মার্চ, ১৯৭৫



প্রকাশক
শীলা ভট্টাচার্য
আশা প্রকাশনী
৭৪, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর
মাঝি প্রেস
বিরেশ্বর রায়
২৮ বি, সিমলা ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ
পরিমল চৌধুরী

মূল্য কুড়ি টাকা

পরিমল গোস্বামী

—বন্ধুবরেষু ।

# ভূমিকা

কয়েক মাস আগে আচার্য জগদীশচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত বসু বিজ্ঞান মন্দিরে শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের যে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় তাতে অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গোপালবাবুর যে সব মনোজ্ঞ প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল তার একটি সংকলন গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলে ভাল হয়। সেই অনুযায়ী গোপাল বাবুর প্রবন্ধগুলির একটি সংকলন বর্তমানে প্রকাশিত হচ্ছে জেনে বিশেষ আনন্দিত হলাম।

মাকড়সা, পিঁপড়ে এবং কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর কীট-পতঙ্গের আচরণ ও তাদের শারীরবৃত্তীয় ধর্মাবলী সম্পর্কে গোপালবাবুর গবেষণালব্ধ তথ্যগুলি শুধু ভারতেই নয়, বিদেশের বিজ্ঞানী মহলেও এক সময় যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল বলে আমরা জানি। যে যুগে কেউই মাতৃভাষায় নিজের গবেষণালব্ধ তথ্য প্রকাশের কথা ভাবতেই পারতেন না, তখন গোপালবাবু বাংলাভাষায় তাঁর গবেষণার তথ্যাদি প্রকাশ করে সকলকে বিস্মিত করেছিলেন। তিনি অতি সহজ সাবলীল বোধগম্য ভাষায় তাঁর প্রবন্ধগুলি লিখতেন। এজন্যে ছোটবড় সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছে তাঁর লেখাগুলি খুবই সমাদৃত হত। জীববিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার নানা বিষয়ে তিনি লিখেছেন, তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো তাঁর জীববিদ্যা সম্পর্কিত রচনাগুলি। এই লেখাগুলি যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি আকর্ষণীয়। তিনি যে পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-সাহিত্যের সেবা করে আসছেন, তাতে তাঁকে এ যুগের অন্যতম পথিকৃৎ বললে অত্যুক্তি হয় না।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত গোপালবাবুর রচনাগুলি প্রকৃতিবিজ্ঞানের নিগূঢ় রহস্যের দিকে ছেলেমেয়েদের যেমন আকৃষ্ট করবে, তেমনি বড়রাও এই লেখাগুলি পড়ে যথেষ্ট আনন্দ পাবেন। এই সংকলন গ্রন্থটি সকলের কাছে সমাদৃত হবে বলে আমি মনে করি।

অসীমা চট্টোপাধ্যায়

26 মার্চ 1975

## প্রকাশকের নিবেদন

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা দীর্ঘকাল শুরু হলেও, এখনও যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি। কারণ হিসাবে নানাকথা বলবার অবকাশ থাকলেও, এটি সত্য, আমাদের দেশে বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণার বিষয়বস্তু ইংরেজীতে লিখেছেন এবং আজো লেখেন। বিজ্ঞানকে লোকপ্রিয় করবার জন্য তাঁদের প্রয়াস থেকেছে সীমাবদ্ধ।

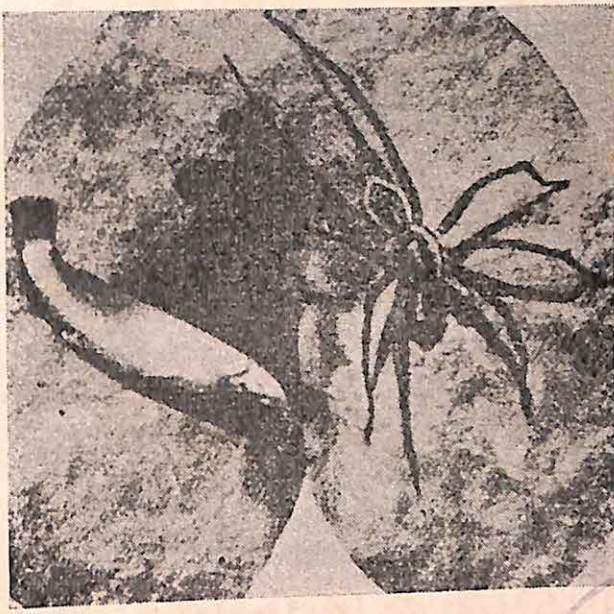
সম্ভবত, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যই এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমিক চরিত্র। তাঁর উচ্চমানের গবেষণা-ফল বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত হলেও, মাতৃভাষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক বিষয়কে বিশ্লেষণ করছেন সুদীর্ঘ পঞ্চাশবছর কাল ধরে। কীট-পতঙ্গের আচার-ব্যবহার বিজ্ঞান সম্পর্কে ভারতে কাজ শুরু করেন গোপালচন্দ্রই প্রথম। তিনি লিখেছেন পিঁপড়ের লড়াই, কীট-পতঙ্গের প্রণয় রীতি, শোঁয়াপোকার মৃত্যু অভিযান-বিচিত্র বিষয়ের অসংখ্য কাহিনী—যা লেখককে দিয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতি। বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর বিজ্ঞান প্রবন্ধমালার সংখ্যা আট শতাধিক।

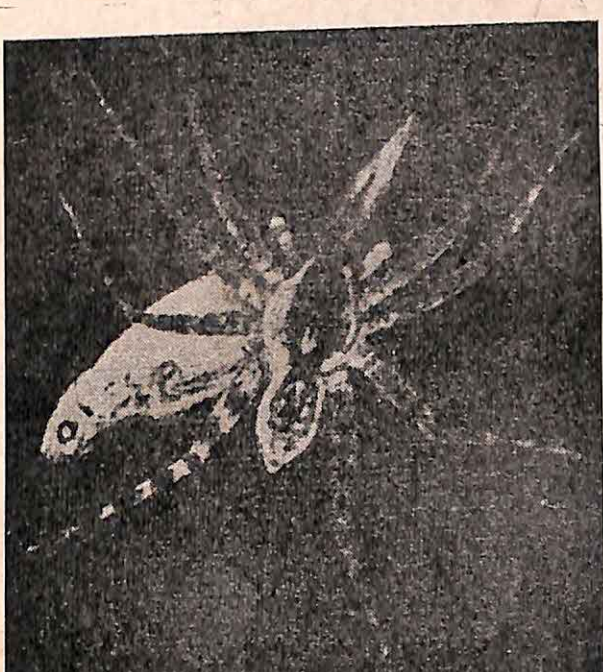
শ্রীভট্টাচার্যের সমগ্র প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রয়োজন। সুনির্বাচিত এই সংকলনটি প্রকাশ করে, আমরা অনাড়ম্বর, নিরহংকার, সদালাপী ও অসীম কর্মক্ষম একটি মানুষের প্রতি সমগ্র বাংলাভাষীর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

যাঁরা এই গ্রন্থ প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়, "অন্বিষ্ট" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ও বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষক ডঃ অজিতকুমার মেদ্দাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ডঃ মেদ্দার একটি মূল্যবান প্রবন্ধের অংশবিশেষ এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হয়েছে। আলোকচিত্র সংগ্রহের ব্যাপারে রামমোহন লাইব্রেরী ও প্রখ্যাত ফোটোগ্রাফার শ্রীশম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও উল্লেখযোগ্য।

## সূচীপত্র

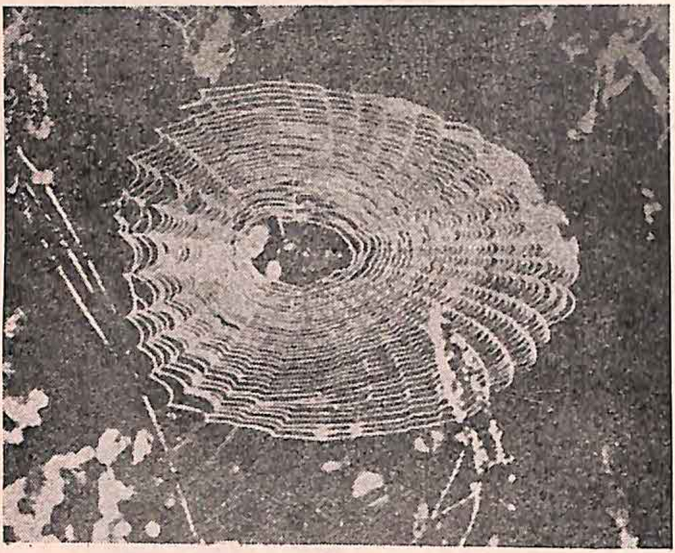
মেছো মাকড়সার মাছ শিকার



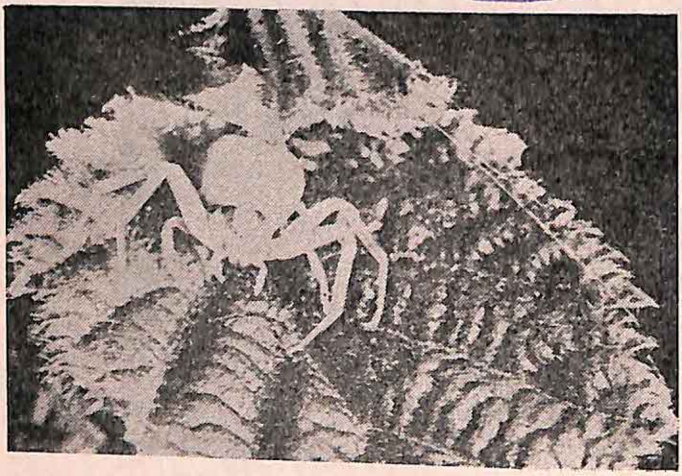


মেছো মাকড়সা শিকার করা মাছ খাচ্ছে

মাকড়সার জাল

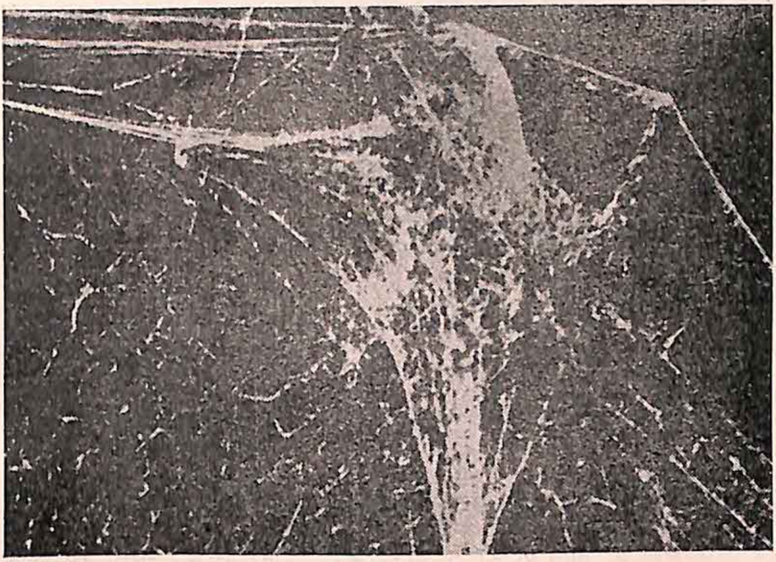


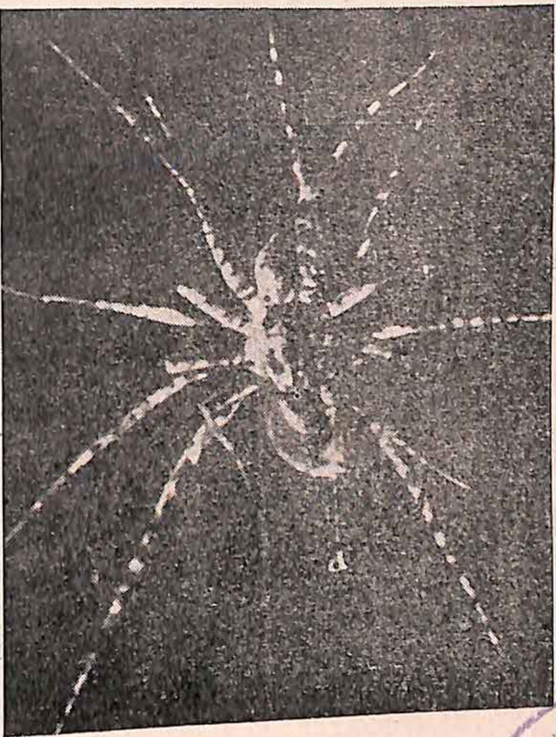




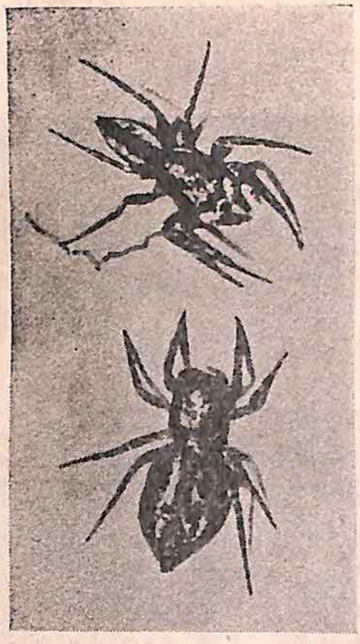
পত্রগুচ্ছের ওপর কাঁকড়া মাকড়সা

মাকড়সার বাচ্চা ডিম থেকে বেরিয়ে সুতো বের করে জাল বুনছে





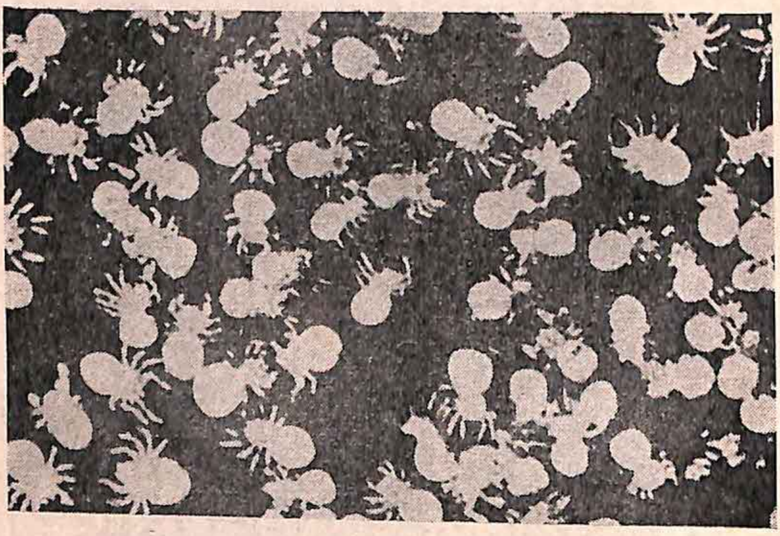
মেছো মাকড়সার যৌন মিলন



উপরে পুরুষ ও নীচে স্ত্রী
মাকড়সা—মিলন নৃত্য

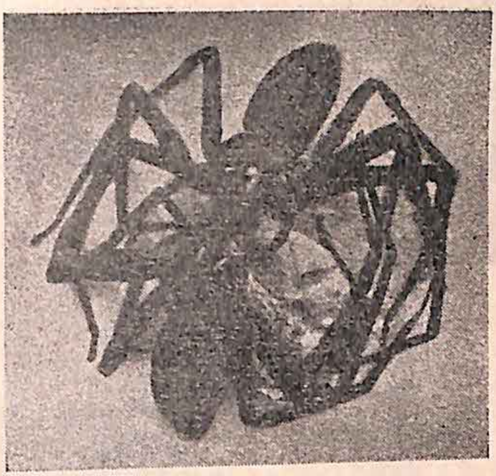


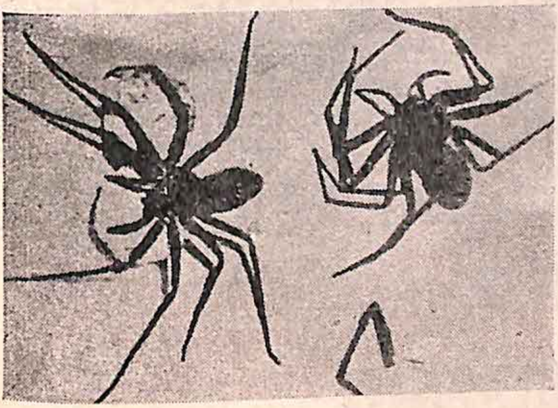
টিকটিকি ধরা পড়েছে
মাকড়সার জালে



মাকড়সার বাচ্চাগুলির ডিম থেকে বেরোবার দুদিন পরের
চেহারা

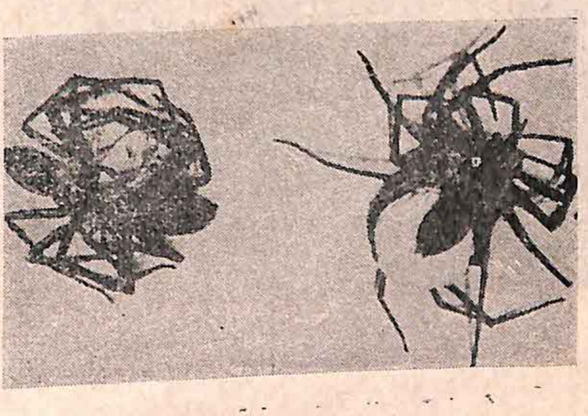
অপর মাকড়সার
ডিম কাড়বার প্রয়াস

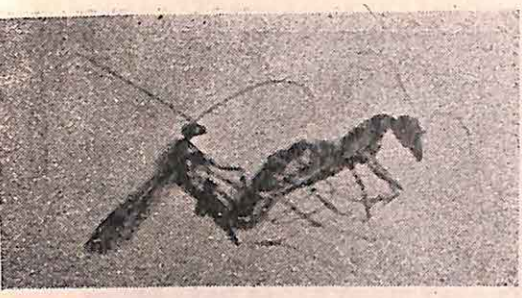




বিজেতা নিজেরটি ও
পরাজিত মাকড়সার
ডিম কেড়ে নিয়ে
পালিয়ে যাচ্ছে।

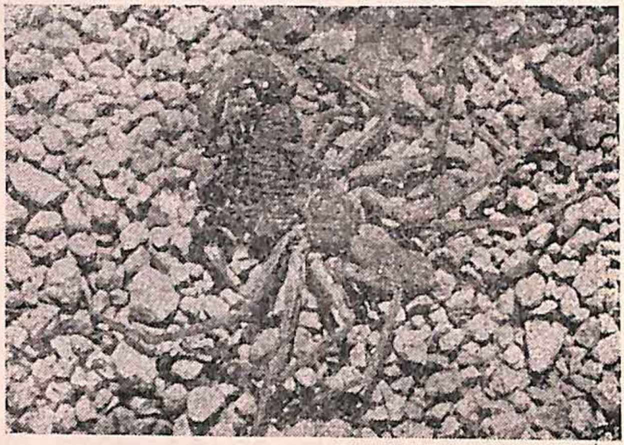
দেয়াল মাকড়সার
লড়াই। বাম দিকে
লড়াই চলছে।
ডান দিকে পরাজিত
মাকড়সা

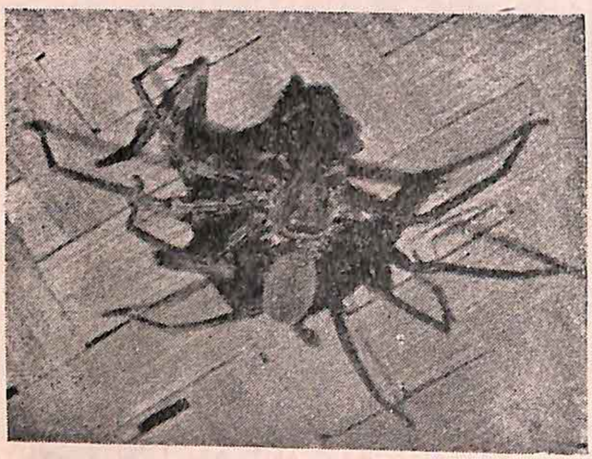




কাঠ পিঁপড়ার যৌন মিলন
( ডানাওয়ালাটি পুরুষ )

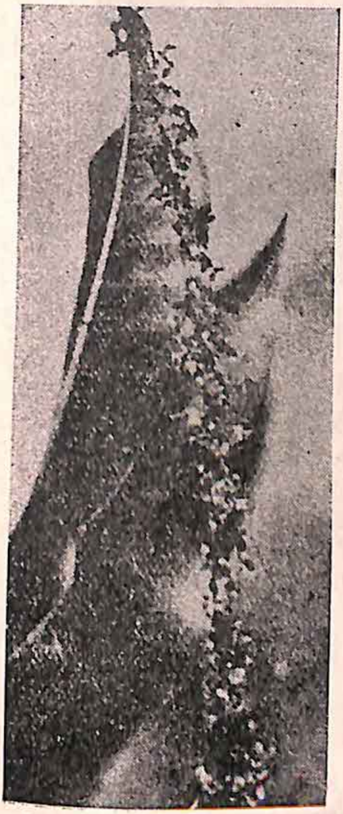
দেয়াল মাকড়সা ও
কাঁবড়া বিছার লড়াই



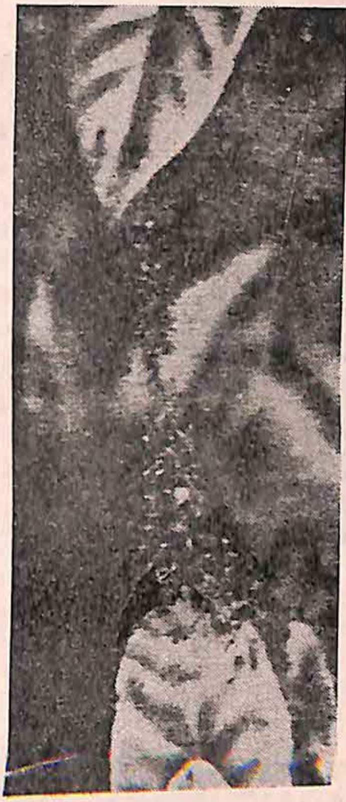


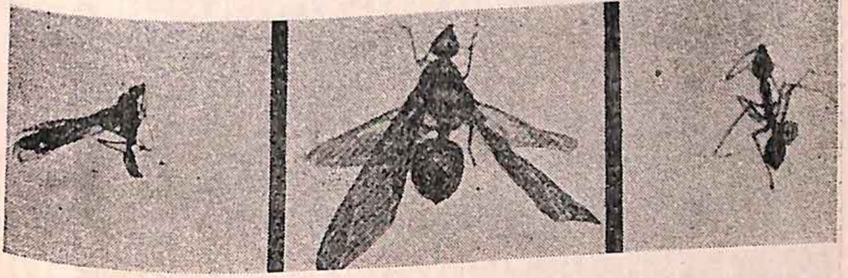
দেয়াল মাকড়সার
চামচিকা শিকার

বাসা বাঁধবার উদ্দেশ্যে নালসোদের বিচিত্র কৌশল

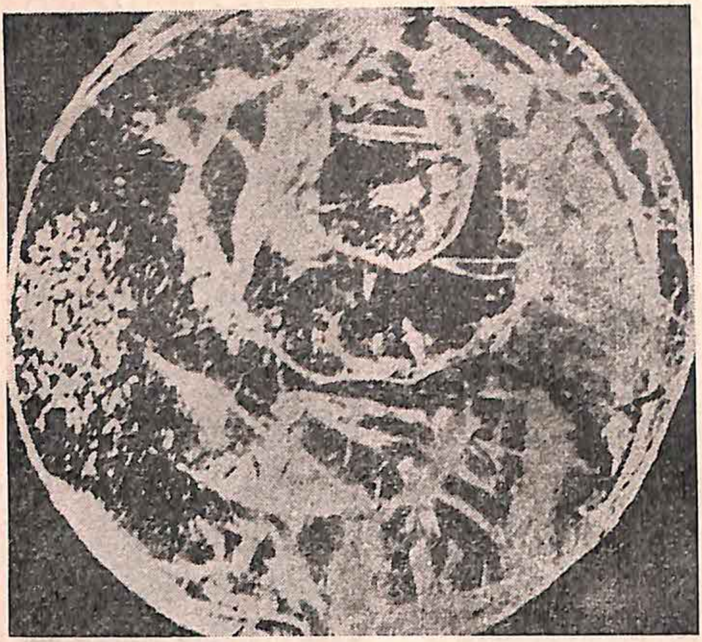


নালসো পিঁপড়ে দুটো পাতা টেনে আনছে কাছাকাছি





বাম থেকে ডাইনে—নালসো পিঁপড়ের পুরুষ, মধ্যে নালসো পিঁপড়ের রাণী



নালসো পিঁপড়ের বাসা



ভীমরুলের আক্রমণে নিঃশেষিত প্রায় বোলতার বাসা

# পিঁপড়ে

## শ্রমিক-পিঁপড়ের জন্ম-রহস্য

আমাদের আশেপাশে রকমারি পিঁপড়ে দেখতে পাই। এদের বাসস্থান অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে—প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাতে দুই, তিন বা ততোধিক বিভিন্ন আকৃতির পিঁপড়ে রয়েছে। একই জাতীয় পিঁপড়ের এই আকৃতি-বৈষম্য স্বভাবতঃই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। খুঁটিনাটি বৈষম্য থাকলেও সন্তান, মাতা অথবা পিতার মত আকৃতি পরিগ্রহ করে থাকে। জীবজগতের এটাই অতি পরিচিত ঘটনা। কদাচিৎ কখনও দু-এক ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায়, কিন্তু তার কারণও সুস্পষ্ট। পিঁপড়েদের ক্ষেত্রে কিন্তু মাতা অথবা পিতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতির সন্তান জন্মগ্রহণ করাটাই স্বাভাবিক নিয়ম। মাতা বা পিতার অনুরূপ সন্তান জন্মগ্রহণ করাটা কতকটা সাময়িক এবং অনেকটা আকস্মিক ব্যাপারের মত। এক-একটা পিঁপড়ের বাসায় সাধারণতঃ চার-পাঁচ রকমের পিঁপড়ে থাকে—কয়েক শত পুরুষ, কয়েক শত রাণী এবং কয়েক হাজার কর্মী বা শ্রমিক। আমরা সচরাচর শ্রমিক-পিঁপড়েই দেখে থাকি এবং এদের দেখেই জাতি নির্ণীত হয়। শ্রমিকদের মধ্যে কতকগুলি থাকে মাথা মোটা সৈন্য এবং বাকীগুলি ছোট, বড় ও মাঝারি—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। রাণীর আকৃতি সাধারণ পিঁপড়েদের তুলনায় অসম্ভব বড়। পুরুষের আকৃতি মাঝারি গোছের। কিন্তু কর্মীরা সর্বাপেক্ষা ছোট এবং পিতা বা মাতার সঙ্গে আকৃতিগত কোনও সামঞ্জস্য দেখা যায় না। পুরুষ বা রাণী পিঁপড়েদের

প্রত্যেকেরই ডানা আছে ; কিন্তু কর্মীদের কারও ডানা নেই, অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পুরুষ ও রাণীর মধ্যে মিলন সংঘটিত হবার পর রাণীর ডিম থেকে কেবল এই কর্মী শ্রেণীর পিঁপড়েরাই জন্মগ্রহণ করে থাকে। কি উপায়ে এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হয়ে থাকে, প্রত্যেকেরই তা জানবার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। বিভিন্ন জাতীয় কয়েক প্রকার পিঁপড়ের মধ্যে এরূপ আকৃতিগত বৈষম্য দেখে এক সময় আমারও কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠেছিল। ইতিপূর্বে বৈজ্ঞানিকেরা এ সম্বন্ধে অনেক প্রকার গবেষণা করেছেন বটে, কিন্তু কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি।

কিছুকাল যাবৎ পিঁপড়েদের এই অদ্ভুত প্রজনন-রহস্য উদ্ঘাটনের নিমিত্ত পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। পরীক্ষার ফলে এই রহস্য সম্বন্ধে যতটুকু জানতে পেরেছি, তা মোটামুটিভাবে আলোচনা করবো। প্রথমতঃ কাঠপিঁপড়ে নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলাম। তার পর ক্রমাগত ডেঁয়ো-পিঁপড়ে, বিষ-পিঁপড়ে, সুড়সুড়ে-পিঁপড়ে নিয়ে পরীক্ষা করেও বিশেষ কোন সুবিধা করতে পারি নি। কারণ এই পিঁপড়েরা প্রত্যেকেই মাটির নীচে গর্ত খুঁড়ে বাস করে। বাচ্চা প্রভৃতি মাটির নীচে অন্ধকারেই প্রতিপালিত হয়, বাইরে থেকে দেখবার কোনও উপায় নেই। কৃত্রিম বাসা তৈরী করে তাতে হাজার হাজার পিঁপড়ে প্রতিপালন করে দেখেছি, তারা—রাণী, বাচ্চা, ডিম্ প্রভৃতি অন্ধকারে অথবা কোনও কিছুর আড়ালে অতি সংগোপনে রক্ষা করে। কাজেই এদের স্বাভাবিক কার্যপ্রণালী প্রত্যক্ষ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। অবশেষে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করবার নিমিত্ত লাল-পিঁপড়ে পুষতে আরম্ভ করি। লাল-পিঁপড়েরা গাছের ডালের পাতা পরস্পর জুড়ে গোলাকার বাসা নির্মাণ করে। পাতার ভিতর দিয়ে বাসার ভিতরের অবস্থা দেখা যায় না ; কাজেই কৃত্রিম বাসার সাহায্য নিতে হয়েছিল। অনেক কিছু ব্যর্থ চেষ্টার পর অবশেষে পাত্‌লা সেলোফিন মুড়ে বাসা তৈরী করতে সক্ষম হলাম। পুরুষ, রাণী, ডিম ও বাচ্চা সমেত হাজার হাজার পিঁপড়ে বাসায় ছেড়ে দিলাম! তারা সেলোফিনে আবৃত বাসায় উপস্থিত হয়ে কাটা এবং ফুটা স্থানগুলি বন্ধ

করে দিল এবং বিভিন্ন কুঠ্‌রি নির্মাণ করে বেশ সহজভাবেই বসবাস করতে লাগলো। পাত্‌লা সেলোফিনের পর্দার ভিতর দিয়ে পিঁপড়েগুলির কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করতে কোনই অসুবিধা হয় না। বিভিন্ন জাতীয় পিঁপড়েদের আকৃতি এবং প্রকৃতি বিভিন্ন হলেও তাদের সমাজ-ব্যবস্থা এবং প্রজনন ব্যাপারে মোটামুটি একটা সামঞ্জস্য দেখা যায়। কাজেই লাল পিঁপড়েদের সম্বন্ধে আলোচনা করলেই সাধারণভাবে পিঁপড়েদের সামাজিক-বিধি-ব্যবস্থার বিষয় অবগত হওয়া যাবে।

মানুষ সামাজিক প্রাণী। অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীর জীবের মধ্যে মানুষের মত সমাজ-ব্যবস্থা না থাকলেও মৌমাছি, পিপীলিকা প্রভৃতি নিম্ন স্তরের কীট-পতঙ্গের মধ্যে এর‍ূপ সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। তাদের সমাজের রীতিনীতি যাতে অক্ষুণ্ণভাবে নিরুপদ্রবে চলতে পারে, তার জন্যেও একটা স্বাভাবিক অবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। মানুষেরা বুদ্ধিমান এবং কৌশলী হলেও পিঁপড়ে অথবা মৌমাছির মত সুনির্দিষ্ট এবং সুনিয়ন্ত্রিত একটা পাকাপোক্ত সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে নি। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি এবং ব্যক্তিগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। প্রত্যেকেই সুবিধামত সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে থাকে। তার ফলেই দাসত্ব প্রথা, বাধ্যতামূলক বেগার খাটা এবং অন্যান্য দুর্নীতিমূলক প্রথার উদ্ভব ঘটেছিল। স্বার্থান্বেষী ও প্রভুত্ব প্রয়াসী ব্যক্তিরা অস্ত্রপ্রয়োগে মানুষের প্রজননশক্তি নষ্ট করে নিজেদের সুখসুবিধা বিধানের নিমিত্ত কায়েমী-ভাবে এক ধরণের শ্রমিকশ্রেণী উৎপাদনে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু যে কারণেই হোক তাদের এই প্রচেষ্টা অধিক দুর প্রসার লাভে সক্ষম হয় নি। যা হোক, মানুষের প্রয়োজনে আজ পর্যন্তও গৃহপালিত পশুপক্ষীর উপর এ ব্যবস্থা অবাধে প্রযুক্ত হচ্ছে। উদ্দেশ্য যাই হোক, উপায়টা যে সম্পূর্ণ নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। শ্রমসাধ্য যাবতীয় কার্য নির্বাহের জন্যে পিঁপড়েরা কিন্তু অতি সহজ উপায়ে এর‍ূপ একপ্রকার শ্রমিক শ্রেণী উৎপাদন করবার উপায় আয়ত্ত্ব করে নিয়েছে। মনুষ্য কর্তৃক অবলম্বিত উপায় অপেক্ষা তাদের উপায় যে সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ, এ কথা অস্বীকার করবার

উপায় নেই। স্বার্থান্বেষী, পুঁজিবাদী, প্রভুত্বপ্রয়াসী মানুষেরা যদি পিঁপড়েদের অবলম্বিত কৌশলের মত এমন কোনও সহজসাধ্য উপায় আবিষ্কারে সক্ষম হতো, তবে তার প্রভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই হয়তো বংশানুক্রমে কায়েমী শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত হতো। প্রভুর তুষ্টি-বিধান ও স্বার্থ ছাড়া তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ বলে কোনও কিছুরই অস্তিত্ব থাকতো না। কৃত্রিম বাসার মধ্যে হাজার হাজার পিপীলিকা প্রতিপালন করে বছরের পর বছর তাদের আচার-ব্যবহার যা প্রত্যক্ষ করেছি, তাথেকে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়।

আগেই বলেছি, এক-একটা পিঁপড়ের বাসায় কয়েক শত রাণী, কয়েক শত পুরুষ এবং হাজার হাজার কর্মী বা শ্রমিক পিপীলিকা দেখা যায়। রাণী এবং পুরুষ পিঁপড়েরা কোনও কাজই করে না, কেবল অলসভাবে বাসার মধ্যে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায় মাত্র। শ্রমিকেরা রাণী ও পুরুষকে সর্বপ্রকার সেবা-যত্ন করে থাকে। শ্রমিকেরা খাবার সংগ্রহ করে পুরুষ ও রাণীদের মুখের কাছে তুলে ধরে। আহারান্তে একাধিক শ্রমিক মিলে গাত্র মার্জনা করে দেয় এবং অবসরমত তাদের প্রসাধনে ব্যাপৃত হয়। ডিম পাড়বার সময় হলেই হাজার হাজার কর্মী-পিঁপড়ে তার আপাদমস্তক আড়াল করে অপেক্ষা করতে থাকে। সে সময় শ্রমিকেরা রাণীর যেরূপ সেবাযত্ন করে থাকে, তা দেখলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। একটির পর একটি করে ডিম বেরিয়ে আসতে আরম্ভ করলেই শ্রমিকেরা সেগুলিকে অতি যত্ন সহকারে মুখে তুলে নিয়ে একটা নির্দিষ্ট কুঠুরীতে সাজিয়ে রাখে। অন্য এক দল শ্রমিক তখন ডিমের তদারকে নিযুক্ত হয়। তারা ডিম ছেড়ে কোথাও নড়ে না। দু-এক দিনের মধ্যেই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। এক-একটি কর্মী এক-একটি বাচ্চা প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করে। এগুলিকে খাওয়ানো, পরিষ্কার করা, উন্মুক্ত স্থানে বেড়িয়ে আনা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ শ্রমিকেরাই করে থাকে। পুরুষ বা রাণীরা কোনও কাজেই বিন্দুমাত্র অংশ গ্রহণ করে না। এরা বহু দূর দূরান্তর থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে বাসায় নিয়ে আসে এবং পুরুষ-রাণীকে শ্রেষ্ঠাংশ খাওয়াবার পর অবশিষ্ট অংশ সকলে মিলে

ভাগাভাগী করে খায়। এদের সঞ্চয়ের অভ্যাস নেই। যা সংগৃহীত হয়, তাই খেতে সুরু করে দেয়। যদি খাদ্যের অনটন ঘটে তবে যৎসামান্য যা সংগৃহীত হয়, তাথেকে প্রথমে বাচ্চাগুলিকে খাওয়ায় এবং পরে পুরুষ ও রাণীকে খাইয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তা নিজেরা ভাগাভাগী করে খায়, নচেৎ অনাহারে থেকেই প্রয়োজনীয় কাজকর্ম চালিয়ে যায়! অনাহার সহ্য করে মৃত্যু বরণ না করা পর্যন্ত এরা নিজের কর্তব্যকর্মে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করে না। শত্রুর আক্রমণে ভীত হয়ে হয়তো বাচ্চা মুখে করে কোনও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করতে ছুটছে, সেই সময়ে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—এমন কি, অর্ধাংশ দ্বিখণ্ডিত করে দিলেও বাচ্চাকে মুখ থেকে ফেলে দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করে না। শত্রু-কবলিত বাচ্চা, রাণী অথবা পুরুষ পিঁপড়েকে উদ্ধার করবার জন্যে নিষ্ফল প্রচেষ্টায়ও কেউ জীবন দিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। দু-একটি ব্যতীত অধিকাংশ ঘটনা দেখে মনে হয়—জীবনের প্রতি এদের সত্য-সত্যই কোনও মমত্ববোধ আছে কিনা সন্দেহ। এদের কোনও চালকও নেই বা কার্য বণ্টনও কেউ করে দেয় না। যখন যার প্রয়োজন উপস্থিত হয়, সংস্কারবশেই যেন সে কার্যে আত্মনিয়োগ করে এবং সুশৃঙ্খলার সঙ্গে তা সম্পন্ন করে। এদের মধ্যে কঠিন বা সহজ বলে কোনও কাজের বিচার নেই। কঠিনই হোক, কি সহজই হোক প্রয়োজন উপস্থিত হওয়া মাত্র এরা নির্বিচারে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে। শত্রু প্রবলই হোক, কি দুর্বলই হোক, নাগালের মধ্যে আসামাত্রই সমস্ত শক্তি দিয়ে নির্বিচারে তাকে আক্রমণ করবে। একটা কাঠি বা এক টুক্‌রা ইট কাছে আনামাত্রই তাকে প্রাণপণে কামড়ে ধরবে এবং ভারী হলে তা টেনে তুলতে না পারলেও সেই নিরীহ ইটের টুক্‌রাটা মুখে করে সারা দিন ঝুলে থাকবে—এমনই কর্তব্যপরায়ণ এবং বিশ্বস্ত এরা।

বাসা বাঁধবার সময় কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম করতে দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে থাকতে হয়। লাল-পিঁপড়েরা একটির পর একটি পাতা জুড়ে গাছের ডালে গোলাকার বাসা নির্মাণ করে। শত শত কর্মী একযোগে কাছাকাছি অবস্থিত দুটি পাতা টেনে ধরে পরস্পর সংলগ্ন করে রাখে। আর এক দল

কর্মী বাচ্চা মুখে করে সে স্থানে উপস্থিত হয় এবং বাচ্চার মুখনিঃসৃত সুতার সাহায্যে পরস্পর সংলগ্ন পাতা দুটিকে জুড়ে দেয়। এভাবে অনেক পাতা জুড়ে ক্রমশঃ একটি বড় বাসা গড়ে তোলে। অনেক সময় দেখেছি—হাজার হাজার পিঁপড়ে একত্রিত হয়ে এক সঙ্গে গাছের পাতা জুড়ে টেনে ধরে রয়েছে। সুতা বোনা শেষ হলে কর্মীরা একে একে সেই টানা ছেড়ে দিতে থাকে। কিন্তু পরীক্ষার উদ্দেশ্যে একবার সুতা-বোনা পিঁপড়েগুলিকে অগ্রসর হতে দেওয়া হলো না। কৌশলে তাদের গতিরোধ করা হলো। এদিকে কর্মীরা পাতা টেনে ধরেই আছে। এক দিন, দু'দিন করে ক্রমাগত কয়েক দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল, তথাপি পাতার টানা ছাড়বার কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। অনাহারজনিত দুর্বলতায় দু'একটা করে পিঁপড়ে কামড় ছেড়ে নীচে পড়ে যেতে লাগলো। কিন্তু অন্য পিঁপড়ে এসে তৎক্ষণাৎ তাদের স্থান পূরণ করতে লাগলো। কিন্তু সুতা বোনবার সুযোগ আর এলো না। এথেকেই পিঁপড়েদের স্বভাবের দৃঢ়তার এবং কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

একই জাতীয় দুই দল পিঁপড়ের মধ্যে সময় সময় লড়াই বাধতে দেখা যায়। পরস্পর পরস্পরকে কামড়ে ধরে হয় উভয়ে টানাটানি নতুবা গড়াগড়ি দিতে থাকে। বিজেতা পরাজিতকে টুক্‌রা টুক্‌রা করে ফেলে। অনেক সময় দেখা যায়—বিজেতার পায়ে অথবা শুঁড়ে পরাজিতের মস্তক অথবা দেহের প্রথমার্ধ ঝুলে রয়েছে। পরাজিত যে মরণ-কামড় দিয়েছিল, মৃত্যুর পরেও তা ছাড়ে নি। তাছাড়া দেখা যায়, শরীরের কতকাংশ সমেত তা বিজেতার শরীরে আঁকড়ে রয়েছে। বিজেতাকে আমরণ এভাবে শত্রুর দেহাংশ বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে। কর্মীদের এই যে কর্তব্যপরায়ণতা, দৃঢ়তা এবং পুরুষ ও রাণীর প্রতি সেবাপরায়ণতা—এই সকল প্রবৃত্তির বিকাশ হলো কেমন করে? অথচ এরা নিজের সুখদুঃখ সম্বন্ধে অনেকটা উদাসীন—এটাই বা সম্ভব হলো কিরূপে? তাছাড়া আর একটা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এদের প্রজনন-ক্ষমতা নেই। কিন্তু কোনও কারণে বাসার শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকলে অথবা রাণীর অভাব ঘটলে এই শ্রমিক দলের মধ্য থেকে দু-একটি, যৌন-সম্পর্ক ব্যতীতই ডিম পাড়তে আরম্ভ করে এবং এই প্রকার ডিম থেকে

কেবলমাত্র শ্রমিকই জন্মগ্রহণ করে। এস্থলে একটি কথা জানা দরকার যে, পিঁপড়েদের শ্রমিকেরা সকলেই স্ত্রী-জাতীয়, কিন্তু অপরিপুষ্ট অর্থাৎ এদের প্রজনন-যন্ত্র মোটেই পরিপুষ্টি লাভ করে না। তথাপি প্রয়োজনবোধে যৌন-সংসর্গ ব্যতীরেকেই ডিম পাড়তে পারে।

কিন্তু কেমন করে রাণীর ডিম থেকে নির্দিষ্ট আকৃতিবিশিষ্ট লক্ষ লক্ষ শ্রমিক পিপীলিকা জন্মগ্রহণ করে? পর্যবেক্ষণের ফলে যতদূর জানা গেছে, তাতে দেখা যায়—সাধারণতঃ ফাল্গুন মাসের প্রথম দিক থেকে বাসার মধ্যে রাণী এবং পুরুষদের অপরিণত বাচ্চার আবির্ভাব ঘটে। এর পর আষাঢ়-শ্রাবণ মাস থেকে আবার পুরুষ এবং রাণীর অভাব লক্ষিত হয়। যা হোক, পুরুষ এবং রাণী পরিণত অবস্থায় উপনীত হবার পর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ডানায় ভর করে আকাশে উড়ে যায়। উড়তে উড়তে পুরুষ ও রাণীর মিলন সংঘটিত হয়। পুরুষ পিঁপড়েরা আর বাসায় ফিরে আসে না। রাণী যে কোনও একটা বাসায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। তার পরেই তার ডানা খসে যায় এবং কিছুকাল বাদেই ডিম পাড়তে আরম্ভ করে। এই ডিম থেকে যে সকল বাচ্চা হয় তারা সকলেই শ্রমিক শ্রেণীর। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে—রাণীর সঙ্গে পুরুষ পিঁপড়ের মিলন ঘটতে না দিলেও রাণী ডিম পেড়ে থাকে। কিন্তু সে সকল ডিম থেকে কেবল পুরুষ পিঁপড়েই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই ডিম থেকে সরাসরি রাণী জন্মগ্রহণ করে না। আবার এও দেখা গেছে, বাসা থেকে রাণীদের সরিয়ে নিলে কিছুকাল পরেই শ্রমিকদের মধ্য থেকে দু-একটি বেশ কিছু সংখ্যক ডিম পাড়তে সুরু করে এবং সেই ডিম থেকে শ্রমিক-পিপীলিকাই জন্মগ্রহণ করছে। সমস্যা এতে বড়ই জটিল বোধ হলো, কারণ জীব-জগতের প্রজনন প্রক্রিয়ার সাধারণ নিয়মের মধ্যে এদের আনা চলে না।

বিবিধ পরীক্ষার পরে অবশেষে দেখা গেল যে, পিঁপড়েদের ডিম পর্যন্ত আদিম জৈব-বস্তুর বংশানুবর্তী একটা ধারাবাহিকতা আছে বটে, কিন্তু ডিম ফোটবার পর থেকেই একটা বিশেষ খাদ্যবস্তুর প্রভাবে বাচ্চার আকৃতি এবং প্রকৃতি পরিবর্তিত হতে থাকে। এই খাদ্যবস্তুর পরিমাণের উপর আকৃতি

এবং প্রকৃতিগত পরিবর্তন নির্ভর করে। অবশ্য এরও একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। ব্যাপারটা আরও একটু পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে বলছি। বছরের অধিকাংশ সময়েই বাসার মধ্যে কেবল হাজার হাজার শ্রমিক-পিপীলিকাই দেখতে পাওয়া যায়। শ্রমিকদের দু-একটার ডিম থেকে সেই সময়ে আরও কিছু কিছু শ্রমিক-পিপীলিকা জন্মগ্রহণ করে। পূর্বেই বলেছি, এই পিঁপড়েরা গাছের উপর বাসা বাঁধে এবং সাধারণতঃ গাছের উপরেই ঘোরাফেরা করে থাকে এবং মৃত কীট-পতঙ্গ, পাখীর পালক, মাছের কাঁটা প্রভৃতি সংগ্রহ করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। শীত ঋতুর অবসানে ফাল্গুনের প্রারম্ভে গাছে গাছে নতুন পত্র-পল্লব এবং মুকুল বেরুতে সুরু করে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—এই সময় নতুন নতুন পত্র-পল্লব এবং মুকুলের মধ্যে কয়েক প্রকারের অজস্র গাছ-উকুন আত্মপ্রকাশ করে থাকে। এই সব মুকুল এবং গাছ-উকুনের শরীর থেকে অতি অল্প পরিমাণে মধুর মত এক প্রকার পদার্থ নিঃসৃত হয়ে থাকে। এই সময়ে পিঁপড়েদের মধু সংগ্রহ করবার মরসুম। তারা প্রায় সকল কাজ পরিত্যাগ করে এই মধুর লোভেই দিনরাত্রি পত্র-পল্লব এবং গাছ-উকুনের মধ্যে অবস্থান করে। এই মধুর মধ্যে ভিটামিন—বি-১ নামক এক প্রকার খাদ্যপ্রাণের অস্তিত্ব আছে। এই মধু খাবার পর শ্রমিক পিঁপড়েরা বাসায় এসে তা উদ্গীরণ করে বাচ্চাগুলিকে খাওয়ায়। শ্রমিক-পিপীলিকারা অনেকেই পরপর বাচ্চাগুলিকে উদ্গীর্ণ মধু খাওয়াতে থাকে। এক-একটা বাসায় হাজার হাজার বাচ্চা থাকে এবং শ্রমিকদের সংখ্যাও অগণিত ; কাজেই কোন্ কোন্ বাচ্চাকে কতবার খাওয়ানো হলো, তার কোন হিসাব ঠিক রাখতে পারে না। এর ফলে কোন কোন বাচ্চা প্রচুর পরিমাণে এই খাদ্য পায় আবার অনেকে অতি সামান্য মাত্র পেয়ে থাকে। যারা এই খাদ্য বেশী পরিমাণে পায় তারা অতি দ্রুতগতিতে বর্ধিত হয়ে রাণীর আকৃতি পরিগ্রহ করে। যারা মাঝামাঝি পরিমাণে মধু খেতে পায়, তারা পুরুষ-পিঁপড়েতে পরিণত হয়। যারা অতি সামান্য পায় অথবা মোটেই পায় না, তারাই বড় এবং ছোট বিভিন্ন রকমের কর্মী বা শ্রমিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। যৌন-মিলন ব্যতিরেকে উৎপন্ন পুরুষ এবং মধুর প্রভাবে

উৎপন্ন পুরুষ পিপীলিকার মধ্যে হয়তো কোনও প্রকৃতিগত পার্থক্য বিদ্যমান থাকতে পারে, তবে তা এখনও পরীক্ষাসাপেক্ষ বলে নিশ্চিতরূপে কোনও কথা বলা যায় না। তবে একথা ঠিক যে, পত্র-পল্লব এবং গাছ-উকুনের দেহনিঃসৃত রস পরিবেশনের তারতম্যানুসারে প্রয়োজনমত রাণী এবং কর্মী-পিপীলিকা উৎপাদন করা যেতে পারে। মোটের উপর খাদ্য পদার্থের মধ্যে ভিটামিন-বি এবং সেই জাতীয় অন্যান্য কোন কোন পদার্থের অভাবের ফলেই শ্রমিক পিঁপড়ের উৎপত্তি ঘটে থাকে।

## পিঁপড়ের বুদ্ধি

নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে পিঁপড়েদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কিছু শুনে থাকবেন। কিন্তু অনেকের ধারণা—যতই কৌতূহলোদ্দীপক হোক না কেন, এরা প্রত্যেকটি কাজই স্বাভাবিক প্রেরণা বা সংস্কারবশেই করে থাকে। আমাদের দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর বহু জাতীয় পিঁপড়ে দেখা যায়। এদের বিচিত্র জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যে এমন কোন কোন ঘটনা ঘটে, যাতে এরা যে প্রত্যেকটি কাজই সংস্কারবশে করে থাকে, এমন কথা বলা যায় না। বিভিন্ন জাতীয় পিঁপড়ের বাসস্থান নির্মাণ ও সন্তানপালনের কৌশল, শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিবেচনা শক্তি স্বাভাবিক প্রেরণার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে; কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ, আত্মরক্ষা এবং খাদ্য সংগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে সময়ে সময়ে এমন দু-একটি কৌশল অবলম্বন করতে দেখা যায়, যা স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন প্রাণীর পক্ষেই সম্ভব। এস্থলে আমাদের দেশের বিভিন্ন জাতীয় পিঁপড়ে সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ কয়েকটি ঘটনার বিষয় উল্লেখ করছি। এ কি অন্ধসংস্কার না স্বাধীন বিচারবুদ্ধির ফল, তা পাঠকবর্গই বিবেচনা করবেন।

কিছু দিন পূর্বের কথা—সকাল নটা সাড়ে নটার সময় পল্লী অঞ্চলের রাস্তা দিয়ে চলছি। সকাল থেকেই শিশিরবিন্দুর মত গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। কিছু দূর অগ্রসর হতেই রাস্তার এক পাশে পরিষ্কার স্থানেই একটা সুপুরী গাছের উপর নজর পড়লো। কতকগুলি নালসো (লাল

পিঁপড়ে ) সার বেঁধে গাছটার উপরের দিক থেকে নীচের দিকে ছুটে আসছিল। অবশ্য দু-চারটা পিঁপড়ে উপরের দিকেও উঠছিল। নালসোরা সাধারণতঃ গাছের উপরেই চলাফেরা করে, নেহাৎ প্রয়োজন না হলে মাটিতে বা নীচু জায়গায় বড় একটা নামতে চায় না। তাছাড়া সুপুরি গাছের উপর এদের প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় না। কাজেই ব্যাপারটা কি দেখবার জন্যে কৌতূহল হলো। কাছে গিয়ে দেখলাম—গাছটার এক পাশে মাটি থেকে প্রায় এক ফুট উপরে, কালো রঙের একদল ক্ষুদে পিঁপড়ে ছোট্ট একটা গুবরে পোকাকে আক্রমণ করে নীচে নামাবার জন্যে তার ঠ্যাং ধরে প্রাণপণে টানাটানি করছে। উপর দিক থেকে আবার পাঁচ-ছয়টা নালসো তার সামনে দুটা পা ও ঘাড় ধরে এমন ভাবে টান হয়ে রয়েছে যেন আর একটু হলেই ছিঁড়ে যাবে। গুবরে পোকাটার কাছ থেকে নীচের দিকে গাছটার গোড়ার উপর এখানে-সেখানে আরও অসংখ্য ক্ষুদে পিঁপড়ে ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি করছিল। সুপুরী গাছটা প্রকাণ্ড একটা আমগাছের উপর হেলে পড়েছিল। আমগাছটাতেই ছিল নালসোদের বাসা। সেখান থেকে সুপুরী গাছটার উপর দিয়ে দু-একটা টহলদার পিঁপড়ে নীচের অবস্থা তদারক করতে আসায় হয়তো শিকারটা নজরে পড়ে যায়। তার ফলেই খুব সম্ভব উভয় দলে শক্তি পরীক্ষা চলেছে। লক্ষণ দেখে বোধ হলো—ক্ষুদেরাই প্রথম শিকারটাকে আক্রমণ করে তাকে অনেকটা কাবু করে এনেছিল—তারপর এসেছে এই নালসোর দল। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই যে এই কাণ্ডটা চলছিল, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু উভয় পক্ষের টাগ-অব-ওয়ারটা চলছে অল্পক্ষণ ধরে। কারণ জায়গাটায় তখনও অধিক সংখ্যক নালসো জমায়েৎ হয় নি। তারা এদিকে ওদিকে দুচারটা খাড়া পাহারা মোতায়েন করেছে মাত্র। এই পাহারাদার শান্ত্রীরা শুঁড় উঁচিয়ে, মুখ হা করে, নিশ্চল ভাবে অপর পক্ষের গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রেখেছে। পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে বাকী রইলো না যে, শীঘ্রই একটা গুরুতর 'পরিস্থিতি'র উদ্ভব হবে।

প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে আরও অনেক নালসো এসে পোকাটাকে ক্ষুদে-পিঁপড়েদের কবল থেকে

ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল এব     এক ইঞ্চি উপরে শিকারটাকে টেনে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। শিকার হাতছাড়া হয় দেখে ক্ষুদেরা এবার সার বেঁধে দলে দলে অগ্রসর হতে লাগলো। সংখ্যাধিক্যের জোরে পরক্ষণেই তারা পোকাটাকে প্রায় তিন-চার ইঞ্চি নীচে টেনে আনলো। সঙ্গে সঙ্গেই উভয় দলের মধ্যে 'হাতাহাতি লড়াই' শুরু হয়ে গেল। সে এক ভীষণ কাণ্ড, এক-একটা লাল পিঁপড়েকে প্রায় দশ-বারোটা ক্ষুদে পিঁপড়ে এক সঙ্গে আক্রমণ করে কাবু করবার চেষ্টা করছিল। পায়ে, শুঁড়ে, চোখে-মুখে সর্বত্র এতগুলি পিঁপড়ে একটা লাল-পিঁপড়েকে কামড়ে ধরলে সে আর কতক্ষণ টিকতে পারে? দু-চারটা মাত্র কালো-পিঁপড়েকে ছিন্ন-ভিন্ন করে এক-এক করে লাল-পিঁপড়েরা পিঠের দিকে উল্টোভাবে ধনুকের মত বেঁকে গিয়ে জীবন-লীলা শেষ করতে লাগলো। কিছুক্ষণ এভাবে চলবার পর লাল-পিঁপড়েরা বেগতিক দেখে শিকার ছেড়ে দিল, কিন্তু লড়াই থামলো না। গাছটার গোড়ার উপর এখানে-সেখানে তুমুল লড়াই চলছিল। অসংখ্য ক্ষুদে-পিঁপড়ের আক্রমণে লাল-পিঁপড়েগুলির পরাজয় যে আসন্ন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইলো না। কিন্তু অনেক সৈন্য ক্ষয়ের পর তারা বোধহয় বুঝতে পেরেছিল যে, এভাবে আর চলবে না। তারা যেন নতুন 'প্ল্যানে' অগ্রসর হবার ব্যবস্থা করছিল। এতক্ষণ নালসোরা যুদ্ধ করছিল একক ভাবে, এখানে—সেখানে। কাজেই এক-একটা নালসো ক্ষুদে-পিঁপড়ে অপেক্ষা পাঁচ-সাত গুণ বড় এবং শক্তিশালী হলেও দশ-বারোটা ক্ষুদের বিষাক্ত দংশনে সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু বরণ করছিল। এবার নালসোরা আক্রমণ ক্ষান্ত করে দলে দলে সে স্থানটায় সমবেত হতে লাগলো। অবশ্য এই সমবেত হওয়াটা খুব সুশৃঙ্খল না হলেও সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল ছিল না। এ অবস্থায় দু-একটি ক্ষুদে পিঁপড়ে দল ছেড়ে তাদের লাইনের নিকট উপস্থিত হওয়া মাত্রই সেগুলিকে ধরে সাঁড়াশীর মত ধারালো চোয়ালের সাহায্যে খণ্ড খণ্ড করে ফেলতে লাগলো। এই নতুন কৌশলে ক্ষুদেরা ক্রমশঃই নীচের দিকে হটতে বাধ্য হচ্ছিল। ইতিমধ্যে এক দল ক্ষুদে পিঁপড়ে শিকারটাকে টেনে নিয়ে অনেক নীচে চলে গিয়েছিল এবং বাসার ভিতরকার শ্রমিক পিঁপড়েরা গাছের গোড়ার

একাংশে চার-পাঁচ ইঞ্চি স্থান জুড়ে প্রায় ¼ ইঞ্চি খাড়াই একটা মাটির দেয়াল গেঁথে তুলেছিল! এই জাতীয় পিঁপড়েরা কিন্তু সাধারণতঃ মাটির দেয়াল নির্মাণ করে না। এরা মাটির নীচে গর্তের মধ্যে বিভিন্ন কুঠরি নির্মাণ করেই বসবাস করে। বাইরে ক্ষুদ্র একটি মুখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। যাহোক লাল পিঁপড়েদের ধারালো সাঁড়াশী ও বিষাক্ত গ্যাসের আক্রমণে ক্ষুদেরা ক্রমশঃ হটে গিয়ে সেই নব নির্মিত দেয়ালের আড়ালে আত্মগোপন করে অবস্থান করতে লাগলো। এদিকে শ্রমিকেরা দেয়ালটাকে ক্রমশঃ উপরের দিকে গেঁথেই তুলছিল। ভিজা মাটির জন্যে দেয়াল গেঁথে তুলতে তাদের বিশেষ সুবিধাই হয়েছিল প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যাপারটা তখন ট্রেঞ্চ লড়াইয়ের আকার ধারণ করলো। দেয়াল গাঁথবার সময় মাঝে মাঝে দু-চারটা শ্রমিক পিঁপড়েকে নালসোরা ছোঁ মেরে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল বটে, কিন্তু তার সংখ্যা খুবই কম। বলা বাহুল্য, দেয়াল গেঁথে অগ্রসর হবার ফলে নালসোরা শত্রুপক্ষের আর তেমন কোনও অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে নি। এপর্যন্ত দেখে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। প্রায় সাড়ে বারোটার সময় ফিরে গিয়ে দেখি—নালসোরা অনেকেই তখন বাসায় ফিরে গেছে। যদিও কিছু কিছু লাল-পিঁপড়ে দলছাড়া ভাবে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছিল, তথাপি তাদের সেই লড়াইয়ের 'মুডটা' যেন আর ছিল না। ক্ষুদে পিঁপড়েরা ইতিমধ্যে সুপুরী গাছের গোড়াটার অনেকটা স্থান জুড়ে ছয়-সাত ইঞ্চি উপর অবধি লম্বা দেয়াল তুলে গুবরে পোকাটাকে সেই দেয়ালের নীচে ঢেকে ফেলেছে।

একবার আঠার শিশির মধ্যে একটা আরশুলা পড়ে মরেছিল। আরশুলা সমেত আঠাগুলিকে এক স্থানে ঢেলে ফেলে দিয়েছিলাম। কিছুকাল পর দেখলাম আরশুলার মৃতদেহ সংগ্রহের নিমিত্ত লাল রঙের এক প্রকার ক্ষুদে বিষ-পিঁপড়ে আঠার চতুর্দিক ঘেরাও করেছে। কলকাতার সর্বত্র এই জাতীয় বিষ- পিঁপড়ে সর্বদাই দেখা যায়। দেখা গেল দু-চারটা পিঁপড়ে আরশুলার নিকটে যাবার চেষ্টা করায় তরল আঠার মধ্যে বন্দী হয়ে তখনও

হাবুডুবু খাচ্ছে। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় এই দৃশ্য দেখে মনে মনে ভাবলাম বেশ হয়েছে—এবার আর আরশুলার দেহ উদরসাৎ করতে হবে না। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ফিরে ফিরে এসে দেখলাম, তখনও তারা মৃত আরশুলার দেহটাকে উদরসাৎ করবার আশা পরিত্যাগ করে নি—বরং সেস্থানে পিঁপড়ের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বেশী হয়েছে বলেই মনে হলো। একটু মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করতেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেলাম। পিঁপড়েগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁকর মুখে করে আঠার উপর জড়ো করছে। আঠার উপর দিয়ে এইরূপ কাঁকরের পথ প্রস্তুত করতে তাদের প্রায় আরও দু-ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। কিন্তু সময়ের দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কোন রকমে আরশুলাটা পর্যন্ত পথ নির্মিত হওয়া মাত্রই দলে দলে পিঁপড়েরা তার উপর দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলো। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদেই আরশুলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহ-খণ্ড মুখে করে সার বেঁধে মহোল্লাসে বাসার দিকে অগ্রসর হতে দেখা গেল।

এই ঘটনার পর এক দিন মেঝেতে বসে কাজ করছি। কতকগুলি কালো রঙের সুরসুরে-পিঁপড়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছিল। মেঝের উপর এক স্থানে অল্প খানিকটা জল পড়েছিল। তিন-চারটা সুরসুরে-পিঁপড়ে প্রায় একসঙ্গে ঐ জলটার পাশ দিয়ে কয়েকবার ছুটে গেল। আবার এসে জলটার পাশেই ঘোরাফেরা করতে লাগলো। এদের স্বভাব অদ্ভুত—চলতে চলতে খানিকক্ষণ থম্‌কে দাঁড়ায়—কিছুক্ষণ হাত-পা আর শুঁড় পরিষ্কার করে—পর মুহূর্তেই আবার দ্রুতগতিতে ছুটতে থাকে। মেঝের উপর জলটুকুর পাশ দিয়ে দুটি একসঙ্গে ছুটে যাবার সময় অকস্মাৎ একটা পিঁপড়ে জলের সঙ্গে আটকে গেল। পিঁপড়েটা জল থেকে সরে আসবার জন্যে যতই চেষ্টা করে, জলটাও সঙ্গে সঙ্গে ততটা ছড়িয়ে পড়ে। মোটের উপর জলটা যেন তরল আঠার মত তার দেহের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল! পিঁপড়েদের দলের মধ্যে কেউ মরে গেলে অথবা চলচ্ছক্তিহীন হলে তাকে অন্য পিঁপড়েরা অনেক সময়ই খাদ্য হিসাবে মুখে করে নিয়ে যায়; কিন্তু এরূপ ভাবে বিপন্ন হলে একে অন্যকে বড় একটা সাহায্য করতে দেখা যায়

না। হয় তারা ব্যক্তিগত বিপদ সম্পর্কে উদাসীন নয়তো ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। যাহোক এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনাই লক্ষ্য করলাম। অপর পিঁপড়েটা কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে অবশেষে জলমগ্ন পিঁপড়েটার শুঁড় ধরে তাকে জল থেকে অনেকটা দূরে টেনে নিয়ে গেল এবং একটা শুকনো জায়গায় রেখে এক দিকে ছুটে চলে গেল। জলমগ্ন পিঁপড়েটাঅনেকক্ষণ সেই স্থানে নির্জীবের মত পড়ে রইলো এবং শরীরের জল শুকাবার পর ধীরে ধীরে চাঙ্গা হয়ে পা, চোখ, মুখ পরিষ্কার করবার পর ছুটে পালালো। ঘটনাটা তুচ্ছ হলেও এটা যে পিঁপড়ের মত নিম্নস্তরের প্রাণীর পক্ষে বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তি ও সহানুভূতির পরিচায়ক, সে সম্বন্ধে বোধ হয় কেউ দ্বিমত হবেন না।

লাল পিঁপড়েদের বাসা নির্মাণ, সন্তানপালন, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং খাদ্য-সংগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে অনেক কিছু অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছি; কিন্তু সেগুলি কৌতূহলোদ্দীপক হলেও স্বাভাবিক সংস্কারের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় বলেই উল্লেখ করবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যাকে নিছক সংস্কারমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না এরূপ দু-একটা ঘটনার বিষয় বলছি।

কলকাতার বটানিক্যাল গার্ডেন্‌সে কীট-পতঙ্গ সংগ্রহ করবার সময় একদিন দেখলাম—মাটির উপরে কতকগুলি উইয়ের সুড়ঙ্গ প্রকাণ্ড একটা গাছের গুঁড়ি অবধি বরাবর চলে গেছে। গাছটার লম্বা গুঁড়ির এখানে-সেখানে অনেকগুলি নালসোকে এদিক-ওদিক ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করতে দেখলাম। তাদের গতিবিধি অনুসরণ করে দেখা গেল, অনেক পিঁপড়ে মাটিতে নেমে উইপোকার সুড়ঙ্গের আশেপাশে প্রায় নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপারটা কি বুঝতে না পেরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পর ওঠবার উপক্রম করছি, এমন সময় একটু দূরে একটা লাল-পিঁপড়ে যেন কিছু খুঁটে খাচ্ছে বলে মনে হলো। কাছে গিয়ে দেখি—প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা একটা ছোট্ট উইয়ের সুড়ঙ্গের উপর নালসোটা সুড়ঙ্গের মাটি সরিয়ে গর্ত করবার চেষ্টা করছে। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই দু-এক টুক্‌রা মাটি সরিয়ে সুড়ঙ্গের উপরের দিকে সে ছোট্ট একটা গর্ত করতে সক্ষম হলো। গর্ত হবার প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ সেকেণ্ড পরেই সুড়ঙ্গের ভগ্ন

স্থানের মধ্য দিয়ে একটা উইপোকাকে মুখ বাড়াতে দেখা গেল। উইপোকাটা শ্রমিক শ্রেণীর, গর্ত বোজাবার জন্যেই এসেছিল। এদিকে নালসোটা শুঁড় উঁচু করে গর্তের মুখে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়েছিল। উইপোকাটাকে নজরে পড়বামাত্রই তাকে শক্ত চোয়ালের সাহায্যে ধরে গাছের দিকে ছুটে চললো। এই ঘটনার পর আরও অনেক ক্ষেত্রে এরূপ ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। উইপোকা নালসোদের অতি উপাদেয় খাদ্য।

এই ঘটনার কিছুদিন আগে ঐ বাগানেই একদিন দেখলাম—একটা ফলসা গাছের কচি ডালের ডগার পাতাগুলি মুড়ে নালসোরা একটা বাসা নির্মাণ করেছে। বাসাটাকে আরও বড় করবার জন্যে তারা বোধহয় অনেক চেষ্টা করেছিল—কিন্তু সুবিধা করতে পারে নি, কারণ পরস্পর সন্নিহিত পাতাগুলি সবই ইতিপূর্বে মুড়ে ফেলেছে। কাছাকাছি হলেও খানিকটা কোঁকড়ানো একটা মাত্র পাতা বাকী ছিল। সেটাকে বাসার সঙ্গে জুড়ে দেবার জন্যে অনেকগুলি পিঁপড়ে মিলে প্রাণপণে চেষ্টা করছিল। সে পাতাটাকে ছিঁড়ে ফেলে অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রায় তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেল—নতুন কিছুই দেখা গেল না। আরও কিছুকাল অপেক্ষা করবার পর দেখা গেল—পিঁপড়েরা ডালটার নীচের দিকে স্তূপাকারে একত্রিত হয়ে ঝুলে পড়বার চেষ্টা করছে। উপরের ডালটার সমান্তরালে নীচের দিকে আর একটা সরু ডাল ছিল। বাসা থেকে তার পাতাগুলির ব্যবধান ছিল প্রায় আট-দশ ইঞ্চির মত। ঐ পাতাগুলিকে কাছে টেনে বাসার সঙ্গে জোড়বার উদ্দেশ্যেই তারা শিকল গাঁথবার মতলব করছিল। প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই শত শত পিঁপড়ে পরস্পর জড়াজড়ি করে প্রায় ¼ ইঞ্চি মোটা ও ফুটখানেক লম্বা একটা শিকল তৈরী করে নীচের ডাল পর্যন্ত ঝুলে পড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গেই নীচের ডালের একটা পাতার প্রান্ত ভাগ কামড়ে ধরে পুনরায় ক্রমশঃ শিকলের দৈর্ঘ্য কমাতে লাগলো। প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে তারা নীচের পাতাটাকে বাসার উপরে টেনে আনতে সক্ষম হয়েছিল। তারপর পাতাটাকে বাসার সঙ্গে জুড়ে দেবার পালা। বয়নকারী শ্রমিক পিঁপড়েরা তখন শূককীট অর্থাৎ লার্ভা মুখে করে তাদের সাহায্যে বয়নকার্য সুরু করে দিল।

পরীক্ষার উদ্দেশ্যে লেবরেটরিতে কৃত্রিম বাসায় লাল-পিঁপড়ে পুষেছিলাম। হলদে রঙের ক্ষুদে-পিঁপড়েরা এদের ভীষণ শত্রু। সুবিধা পেলেই এরা লাল-পিঁপড়ের ডিম, কীড়া, পুত্তলী, পুরুষ ও রাণী পিঁপড়েগুলিকে উদরসাৎ করবার চেষ্টা করে। কৃত্রিম বাসার চতুর্দিকে প্রশস্তভাবে জলের বেষ্টনী দেওয়া ছিল। একবার দেখলাম—ক্ষুদে পিঁপড়েরা জলের উপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে হেঁটে গিয়ে লাল পিঁপড়ের বাসায় যাবার চেষ্টা করছে। সাত-আট দিনের চেষ্টায় তারা জলের উপর দিয়ে লাইন করে যেতে সক্ষম হয়েছিল। এই বেষ্টনীর জল সর্বদাই স্থিরভাবে থাকে বলে আর একবার পিঁপড়েগুলিকে অভিনব উপায়ে পার হতে দেখেছিলাম। প্রথম বার জল অতিক্রম করতে গিয়ে কতকগুলি ক্ষুদে পিঁপড়ে জলে ডুবে মারা যায়। তাদের মৃতদেহগুলি সেই স্থানেই ভাসতে থাকে ; আবার কতকগুলি অগ্রসর হয়। তাদেরও অনেকেই মারা যায় এবং বাকীগুলি ফিরে আসে। এইভাবে ক্রমশঃ মৃতদেহের একটা লাইন অগ্রসর হতে থাকে। এই মৃতদেহের ফাঁকে ফাঁকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুকনো ঘাসের টুক্‌রা এনে তারা সুন্দর একটি ভাসমান রাস্তা তৈরি করেছিল। এই রাস্তার উপর দিয়েই ক্ষুদে পিঁপড়েরা দলে দলে অগ্রসর হয়ে লাল-পিঁপড়েদের ডিম, বাচ্চা, পুত্তলীগুলিকে অপহরণ তো করলোই, অধিকন্তু পিঁপড়েগুলিকে মেরে ফেলে মৃতদেহগুলি খণ্ড খণ্ড করে নিজেদের বাসায় নিয়ে গেল।

আমাদের দেশের সোলেনপ্‌সিস্‌ জাতীয় লাল রঙের এক প্রকার ক্ষুদে-পিঁপড়ে মাঠে-ঘাটে মাটির নীচে গর্ত খুঁড়ে বাস করে। সময়ে সময়ে এরা গর্তের চারদিকে বেশ উঁচু মাটির স্তূপ সাজিয়ে রাখে। বর্ষার সময় অতি বৃষ্টিতে মাঠ-ঘাট জলে ডুবে গেলে এদের দুর্দশার সীমা থাকে না। দুর্দশা যতই হোক—জলমগ্ন হয়ে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়াটাই প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্যে তারা এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করে থাকে। গর্তে জল ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে মিলে জড়াজড়ি করে এক-একটা ডেলা পাকিয়ে জলের উপর ভেসে বেড়ায়। ডেলার নীচের দিকে যারা থাকে, তারা যাতে শ্বাসরুদ্ধ না হয়, সে জন্যে প্রত্যেকেই ডেলাটাকে আঁকড়ে

উপরের দিকে উঠতে চেষ্টা করে। ফলে ডেলাটা জলের উপর ধীরে ধীরে গড়াতে থাকে। এতে একটি পিঁপড়েরও প্রাণহানি ঘটে না। জল নেমে গেলেই আবার পুরাতন বাসায় ফিরে যেতে পারে। স্থানভ্রষ্ট হলে নতুন বাসার পত্তন করে। উটপাখীরা তাড়া খেলে যেমন বালিতে মুখ গুঁজে আত্ম-গোপন করেছে বলে নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করে—আমাদের দেশীয় কাঠ-পিঁপড়েদের মধ্যেও এরূপ ব্যাপার দেখতে পাওয়া যায়। শত্রুর আগমন টের পেলেই তারা এমন নিশ্চলভাবে অবস্থান করে যে, সহজে খুঁজে বের করা যায় না। কিন্তু শত্রু অনুসরণ করলে এরা ছুটতে ছুটতে কোনও কিছুর আড়ালে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। শুধু মুখটা আড়ালে পড়লেই মনে করে—সে যেমন কাকেও দেখতে পাচ্ছে না, শত্রুও বোধ হয় সেরূপ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। কাজেই সেই অবস্থায় সে নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে। উপরের আবরণটি সরিয়ে নিলেও সে নিশ্চিন্ত মনেই চুপ করে থাকে।

আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে উপরিউক্ত কৌশল দুটি কৌতূহলোদ্দীপক হলেও নিঃসন্দেহেই তা সংস্কারমূলক। কিন্তু অন্যান্য ঘটনাগুলি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক কিনা তাই বিবেচ্য।

পিঁপড়ে-সমাজে খাদ্য-সংগ্রহ, সন্তানপালন, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি যাবতীয় কাজ কর্মীরাই করে থাকে। উল্লিখিত ঘটনাগুলিতে কর্মীদের কথাই বলা হয়েছে। আকৃতি, প্রকৃতিতে কর্মীরা পুরুষ ও স্ত্রী পিঁপড়ে থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। স্ত্রী ও পুরুষের ডানা গজায়, কিন্তু কর্মীদের ডানা নেই। আবার এমন এক সময় আসে যখন স্ত্রীদেরও ডানা থাকে না। যাঁরা এ বিষয়ে পর্যবেক্ষণে আগ্রহী তাঁদের পক্ষে এদের স্ত্রী, পুরুষ, কর্মী, ডিম, বাচ্চা ও পুত্তলী সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

## পিঁপড়ের লড়াই

কীট-পতঙ্গের মধ্যে পিঁপড়েদের জীবনকাহিনী খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। এরা সামাজিক প্রাণী এবং সর্বদাই দলবদ্ধভাবে বাস করে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এপর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর বহু পিঁপড়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিভিন্ন জাতের অধিকাংশ দলেই সাধারণতঃ স্ত্রী, পুরুষ ও কর্মী—এই তিন শ্রেণীর পিঁপড়ে দেখতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও জাতের কর্মীদের মধ্যে আবার ছোট কর্মী, বড় কর্মী ও যোদ্ধা—এই তিন রকমের বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট পিঁপড়ে দেখা যায়। বাসগৃহ নির্মাণ, খাদ্যসংগ্রহ, সন্তানপালন—এমন কি, যুদ্ধবিগ্রহ পর্যন্ত যাবতীয় কাজ ক্রীতদাসের মত এই কর্মীদেরই করতে হয়। স্ত্রী ও পুরুষ পিঁপড়ের একমাত্র কাজ বসে বসে খাওয়া এবং বংশবৃদ্ধি করা। আমাদের দেশেও বিভিন্ন জাতীয় বহুবিধ পিঁপড়ে দেখতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও জাতের পিঁপড়ের দলে হাজার হাজার কর্মী থাকে ; আবার কোনও কোনও জাতের দলে কর্মীর সংখ্যা ত্রিশ-চল্লিশটি মাত্র। অধিকাংশ পিঁপড়েই গর্তের মধ্যে অথবা বৃক্ষ-কোটরে বাস করে থাকে। আবার কেউ কেউ বড় বড় গাছের উপরে সবুজ পত্র-পল্লবের সাহায্যে বাসগৃহ নির্মাণ করে বসবাস করে। উগ্র প্রকৃতি ও বিষাক্ত দংশনের জন্যে নাল্‌সো নামে এক জাতীয় লাল রঙের পিঁপড়ে আমাদের দেশে সর্বজনপরিচিত। হাজার হাজার নাল্‌সো

এক বাসার মধ্যে একসঙ্গে বাস করে। বাসস্থান নির্মাণ, খাদ্য-সংগ্রহ ও যুদ্ধবিগ্রহের সময় এরা যেরূপ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেয়, তা কতকটা সংস্কার-মূলক হলেও এতে সহজেই তাদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

নাল্‌সো-পিঁপড়েরা গাছের উঁচু ডালে অনেকগুলি সবুজ পত্র একসঙ্গে জুড়ে বড় বড় গোলাকার বাসা নির্মাণ করে এবং তার মধ্যে শত শত পিঁপড়ে একসঙ্গে বসবাস করে থাকে। এদের বাসা নির্মাণপ্রণালী অতি অদ্ভুত। কতকগুলি নাল্‌সো কর্মী একসঙ্গে পাশাপাশি ভাবে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পরস্পর সন্নিহিত দুটি পাতাকে একত্রিত করে টেনে ধরে রাখে। তখন অপর কর্মীরা তাদের কীড়া মুখে করে উপস্থিত হয়। শুঁড়ের সাহায্যে এই কীড়াগুলির মুখের কাছে সুড়সুড়ি দিলেই তারা এক প্রকার আঠালো সূতা বের করতে থাকে। কাপড় বোনবার সময় তাঁতিরা যেমন একবার এদিকে আবার ওদিকে মাকু চালায়, কতকটা সেই কায়দায় কর্মীরা কীড়াগুলির মুখ একবার এ-পাতায় আবার ও-পাতায় ঠেকিয়ে সূক্ষ্ম সূতার সাহায্যে পাতার ধারগুলি জুড়ে দেয়। এইরূপে বুনন শেষ হলে বড় বড় ফাঁকগুলিকে বারবার সুতা বুনে সাদা কাগজের মত পাত্‌লা পর্দায় ঢেকে দেয়। বাইরে বেরোবার জন্যে একটি, কি দুটি মাত্র পথ রাখে। পাতার পর পাতা জুড়ে ক্রমশঃ বাসা বড় করে তোলে। বাসা বড় করবার জন্যে যদি কোনও সময়ে একটু দুরবর্তী নীচের ডাল থেকে পাতা নেবার প্রয়োজন হয়, তখন এরা দলে দলে বাসার নীচের দিকে জড়ো হতে হতে পরস্পর একে অন্যকে আঁকড়ে ধরে শিকলের মত নীচের দিকে ঝুলে পড়ে। ক্রমে ক্রমে অপরাপর কর্মীরা এসে সেই শিকল বাড়াতে বাড়াতে সর্বশেষে পাতার নাগাল পেলেই কয়েকজন সেটাকে কামড়ে ধরে থাকে। অপর কর্মীরা তাদের পা কামড়ে ধরে। তখন উপর দিক থেকে শিকল ক্রমশঃ খাটো করতে করতে নীচের পাতাকে টেনে কাছে এনে কীড়ার সাহায্যে মূল বাসার সঙ্গে শক্ত করে গেঁথে দেয়।

এরা মাংসাশী প্রাণী। মৃত কীট-পতঙ্গ, মাছের কাঁটা, পাখীর পালক প্রভৃতি সংগ্রহ করে বাসায় নিয়ে যায় এবং অবসর মত সকলে মিলে সেগুলি চেটে খায়। অন্যান্য পিঁপড়ের ডিম ও উই এদের উপাদেয়

খাদ্য। নাল্‌সোরা সুকৌশলে উই ধরে থাকে। উইয়েরা কখনও অনাবৃত স্থানে যাতায়াত করে না, সর্বদাই অন্ধকারে থাকতে ভালবাসে। এই জন্যই মাটির সুড়ঙ্গ গাঁথতে গাঁথতে অগ্রসর হয়ে থাকে। শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডেন্‌সে নাল্‌সোদের উই-শিকার প্রত্যক্ষ করেছিলাম। প্রকাণ্ড একটা গাছের গুঁড়ির চারদিক ঘিরে অসংখ্য সুড়ঙ্গ-নির্মাণ করে উই ক্রমশঃ উপর দিকে উঠে গেছে। ওই সব গাছে নালসো পিঁপড়ের অভাব নেই। তারা খাদ্য সংগ্রহের আশায় দল বেঁধে উপরে-নীচে ওঠা-নামা করছিল। নীচে এসে অনেকে দল ছেড়ে বেশী দূরে না গেলেও আশেপাশে ইতস্ততঃ খাদ্য অন্বেষণে ঘোরাঘুরি করে বেড়ায়। উইয়ের সন্ধান পেয়ে গোটা দুই পিঁপড়ে মাটির সুড়ঙ্গের ধারে এসে ধারালো চোয়ালের সাহায্যে খানিকটা অংশ ভেঙে দিল এবং একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। উইয়েরা তৎক্ষণাৎ সেই ভগ্ন স্থান মেরামত করতে আসা মাত্রই একটা নাল্‌সো তার ধারালো চোয়ালের সাহায্যে একটাকে কামড়ে ধরে একেবারে শূন্যে তুলে নিয়ে বাসার দিকে পলায়ন করলো। অপর নাল্‌সোটা তখন আবার শিকারের আশায় সেই ভগ্ন স্থানে এসে ওৎ পেতে রইলো।

জীবন্ত ফাড়িং বা ঐ জাতীয় কোনও পতঙ্গকে একবার ধরতে পারলে আর রক্ষা নেই। একটা পিঁপড়ে কোনও রকমে একবার শিকার কামড়ে ধরলেই হলো—দেখতে দেখতে দলের অন্যান্য পিঁপড়েরা এসে চতুর্দিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করতে থাকে। দংশন-যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে শিকার উড়ে পালাবার জন্যে প্রাণপণে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে; কিন্তু পিঁপড়েরাও তাকে কাবু করবার জন্যে দ্বিগুণ উৎসাহে বলপ্রয়োগ করতে থাকে। ডানা চেপে ধরতে না পারলে শিকার সহজেই উড়ে যেতে সক্ষম হয়; সে অবস্থায় কিন্তু পিঁপড়েরাও কামড় ছাড়ে না। অন্যান্য পিঁপড়ে এসে তখন সে পিঁপড়েটার পা অথবা কোমর কামড়ে ধরে টেনে রাখতে চেষ্টা করে। এই অবস্থায় ক্রমশঃ একটা পিঁপড়ের শিকল গেঁথে ওঠে। অনেক সময় দেখা যায়, ফড়িং উড়ে যাচ্ছে আর তার লেজ অথবা পা কামড়ে ধরে দু-তিনটা নাল্‌সো শিকলের মত ঝুলছে।

নাল্‌সো পিঁপড়েদের প্রকৃতি এতই উগ্র যে, শত্রু হোক কি মিত্রই হোক বাসার কাছে এলে কারও নিস্তার নেই ; প্রবল-দুর্বল নির্বিশেষে দলে দলে ছুটে এসে আক্রমণ করবে। প্রাণের ভয় যেন এদের মোটেই নেই। একবার আক্রমণ করলে কিছুতেই পিছু হটবে না। শত্রুর আক্রমণে সঙ্গীরা দলে দলে প্রাণ হারাচ্ছে দেখেও এরা যেন মোটেই বিচলিত হয় না বরং চতুর্গুণ উত্তেজনার সঙ্গে মরণপণ লড়াই সুরু করে দেয়। একবার শত্রুকে কাম্‌ড়ে ধরতে পারলেই হয়—কিছুতেই আর কামড় ছাড়বে না। মস্তক থেকে দেহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও মস্তকটি সেই একই ভাবে মরণ-কামড় দিয়ে শত্রুর দেহসংলগ্ন হয়ে থাকে। শত্রুর আগমনের আশঙ্কা হলেই দেহের প্রান্তদেশ থেকে এক প্রকার বিষাক্ত রস পিচকিরির মত ছুড়ে মারতে থাকে। এই রসের বিষাক্ত উগ্র গন্ধে অনেকে দূর থেকেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। লড়াই সুরু হবার মুখে এরা শরীরের পশ্চাদ্দেশ ঊর্ধ্বে তুলে সম্মুখের পা উঁচু করে এমন উত্তেজিত অবস্থায় মুখ হাঁ করে ছুটে এসে দলে দলে বাসার উপর সার বেঁধে দাঁড়ায় যে, অতি বড় শত্রুও অগ্রসর হতে ইতস্ততঃ করতে বাধ্য হয়। উত্তেজিত জনতা যেমন জিগির তুলে সকলের প্রাণে উৎসাহের সঞ্চার করে, প্রবল উত্তেজনার সময় এরাও তেমনই শরীরের পশ্চাদ্দেশ পাতার উপর ঠুকে ঠুকে এক প্রকার অদ্ভুত শব্দ উৎপাদন করে। বাসার সম্মুখে কান পেতে রাখলে এক প্রকার অস্ফুট খস্‌ খস্‌ শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

এদের দুর্ধর্ষ কোপন স্বভাবের ফলে, অন্যান্য পিঁপড়েদের সঙ্গে হামেশাই ঝগড়া-ঝাঁটি লেগে থাকে—এমন কি, বিভিন্ন দলের স্বজাতীয়দের মধ্যে সময় সময় ভীষণ লড়াই বেঁধে যায়। এই জন্যেই বোধ হয় অন্যান্য জাতের পিঁপড়েরা এদের নিকট থেকে যথাসম্ভব দূরে দূরেই অবস্থান করে। তবে দলে ভারী বলেই হোক বা উগ্র বিষের ভয়েই হোক ক্ষুদে পিঁপড়েদের সঙ্গে কিন্তু এরা কিছুতেই এঁটে উঠতে পারে না। ক্ষুদেরা কোনও রকমে সন্ধান পেলে নাল্‌সোদের সমূলে ধ্বংস না করে ছাড়ে না। এই জন্যেই যে সব স্থানে ক্ষুদে পিঁপড়ের আস্তানা আছে, সেখানে কখনও নাল্‌সো পিঁপড়ে দেখতে পাওয়া যায় না। ক্ষুদে, ডেঁয়ো ও ছোট ছোট কালো বিষ-

পিঁপড়ের সঙ্গে এদের লড়াই অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছি ; কিন্তু এদের স্বজাতীয়ের পরস্পরের মধ্যে দল ভাঙার যে ভীষণ লড়াই প্রত্যক্ষ করেছিলাম, সেটা সত্যই ভয়াবহ।

একবার বিকালের দিকে কলকাতার সন্নিহিত সোনারপুর অঞ্চলের একটা বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। বাগানের চার দিকে পালিতা মাদারের মোটা মোটা ডাল পুঁতে তার গায়ে খুব ফাঁক করে বাঁশের বাখারী এঁটে এমনভাবে বেড়া দিয়ে রেখেছে যেন গরু-বাছুর ভিতরে ঢুকতে না পারে। বাগানের গাছপালার অবস্থা দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারা গেল যে, আগের দিন সেখানে বেশ ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেছে। আর একটু অগ্রসর হতেই নজরে পড়লো—খুব বড় একটা লাল-পিঁপড়ের বাসা সমেত ছোট একটা আমের ডাল একটা খুঁটির খুব কাছেই বাখারীর সঙ্গে ঝুলে রয়েছে। মনে হলো ঝড়ের বেগে ডালটা ভেঙে বেড়ার গায়ে পড়ে আট্‌কে গিয়েছিল। খুব কাছে গিয়ে দেখলাম---ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বাসাটার ভিতরে সহস্র সহস্র পিঁপড়ে অবস্থান করছে। কতকগুলি পিঁপড়ে বাসার উপরে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছে আর কতকগুলি একবার ডালটার গা বেয়ে উপরের দিকে উঠছে আবার নেমে আসছে। তাদের গতিবিধি দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, তারা ঐ ঝুলন্ত ভাঙা বাসা থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও যাবার রাস্তা খুঁজছে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলাম, তাদের বাইরে যাবার রাস্তা বন্ধ। কারণ যে বাখারীটার সঙ্গে বাসাটা ঝুলছিল, সেই বাখারীটার উপর দিয়ে বরাবর এক সার লাল-পিঁপড়ে যাতায়াত করছে। বাগানের কোণে একটা ঝোপের ভিতর পূর্ব থেকেই আর একদল লাল-পিঁপড়ে বাসা তৈরী করে বসবাস করছিল। তারাই বাখারীর উপর দিয়ে প্রায় ২৫।৩০ ফুট লম্বা লাইন করে একটা সদ্যকর্তিত কচ্ছপের খোলা থেকে মাংসের কণা সংগ্রহ করে বাসায় তুলছিল। ঝুলন্ত বাসার পিঁপড়েরা ডাল বেয়ে বাখারীর কাছে এসে উক্ত পিঁপড়ের দল দেখেই আর অগ্রসর হতে সাহসী হয় নি। বাখারীর উপরের পিঁপড়েদের অতিক্রম না করে তাদের অন্যত্র যাবার কোনই উপায় নেই। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ভগ্ন বাসাতেও বেশী দিন

বাস করা অসম্ভব। একে তো শত্রু নিকটে, তার উপর পাতা শুকিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বাসা কুঁচকে যাবে, নয়তো শুকনো পাতার জোড়া মুখ খুলে গিয়ে বাসাটার স্থানে স্থানে ফাটল দেখা দেবে। কাজেই এই বাসা পরিত্যাগ করে অন্যত্র নতুন আশ্রয়ের সন্ধান করতেই হবে। বিশেষতঃ বাসার ভিতরে অসংখ্য ডিম ও বাচ্চা রয়েছে, তাদের নিরাপদ স্থানে রক্ষা করা দরকার। এই সব নানা ব্যাপারে বিব্রত হয়ে ঝুলন্ত বাসার অধিবাসীরা বিষম উত্তেজিতভাবে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করছিল। বাখারীর উপরে যারা যাতায়াত করছিল, তারাও এই আগন্তুক দলের সন্ধান পেয়েছিল বোধ হয়, কারণ তাদের ভিতরেও উত্তেজনার ভাব লক্ষিত হচ্ছিল। তারাও ক্রমে ক্রমে ঝুলন্ত ডালটার কাছাকাছি এসে ভিড় জমাচ্ছিল। প্রায় আধ ঘণ্টার উপর দাঁড়িয়ে উভয় দলের এই তোড়জোড় লক্ষ্য করছিলাম। একমাত্র উত্তেজিত ভাব বা এক স্থানে দলে দলে জমায়েৎ হওয়া ব্যতিরেকে লড়াইয়ের আর কোনও লক্ষণই দেখতে পাই নি। ঝুলন্ত বাসার পিঁপড়েরা কিরূপ কৌশল অবলম্বন করে বাখারীর উপরের পিঁপড়েদের লাইন অতিক্রম করে যায়—কেবল সেটাই দেখবার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আরও দশ-পনেরো মিনিট এ ভাবেই কাটলো।

অবশেষে দেখলাম, ঝুলন্ত বাসার প্রায় পাঁচ-সাতটা পিঁপড়ে ডাল বেয়ে বাখারীটার কাছে এসেই ইতস্ততঃ করতে লাগলো। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর সেই দলের গোটা তিনেক পিঁপড়ে বাসায় ফিরে গেল। বাকী যারা রইলো তারা শুঁড় উঁচু করে যেন বাখারীর উপরের দলটাকে মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগলো। ইতিমধ্যে অগ্রবর্তী পিঁপড়েটা অসীম সাহসে ভর করেই যেন অকস্মাৎ বাখারীর পিঁপড়েদের লাইনের মধ্য দিয়ে ছুটে পার হতে গিয়েই তুমুল কাণ্ড ঘটিয়ে তুললো। বাখারীর দলও যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। তৎক্ষণাৎ দশ-বারোটা পিঁপড়ে মিলে একযোগে তাকে কামড়ে ধরে বন্দী করে ফেললো। বন্দী করবার কায়দাও অদ্ভুত। ছয়জনে ছয়টা ঠ্যাং কামড়ে ধরে যথাসম্ভব টেনে ফাঁক করে রাখলো। তখন আর দুজনে দুটা শুঁড় টেনে ধরে পিঁপড়েটাকে এমন অবস্থায় রাখলো যে, বেচারার

আর নড়াচড়ার সাধ্য ছিল না। এবার দু-দলে সত্যিকারের লড়াই সুরু হয়ে গেল। উভয় দলের সৈন্য-সামন্তেরাই শুঁড় উঁচিয়ে পুচ্ছদেশ ঊর্ধ্বে তুলে প্রবল উত্তেজনায় যেন তাণ্ডব নৃত্য সুরু করে দিল। মাঝে মাঝে এক-একটা পিঁপড়ে অন্য একটার শুঁড়ে শুঁড় ঠেকিয়ে কি যেন বলে দেয়। তৎক্ষণাৎ সে ছুটে বাসার ভিতর চলে যায় এবং পরক্ষণেই কতকগুলি নতুন সৈন্য দল বেঁধে বাইরে এসে পড়ে। এরূপে ঘটনাস্থলে উভয়পক্ষেরই ভিড় জমে গেল। ইতিমধ্যে বাখারীর উপরকার দল শত্রুপক্ষের একটাকে বন্দী করে উৎসাহের আতিশয্যেই বোধ হয় আস্ফালন করতে করতে ভাঙা ডালটার খুব নিকটে এগিয়ে গেল। ভাব দেখে মনে হলো যেন তারা বাসাটাকেই দখল করতে যাচ্ছে; কিন্তু তার ফল হলো বিপরীত। মুহূর্তের মধ্যেই ছিন্ন বাসার পিঁপড়েরা শত্রুপক্ষের পাঁচ-সাতটি অগ্রবর্তী সৈন্যকে শুঁড় কামড়ে ধরে একেবারে তাদের দলের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সৈন্যসামন্ত তাদের ঘিরে ফেললো। তাদের কয়েকটা এসে তাদের কেটে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিল আর বাকী ক'টাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সকলে মিলে পূর্বোক্ত উপায়ে টানা দিয়ে রেখে দিল। এই সব ঘটনা ঘটতে দু-তিন মিনিটের বেশী সময় লাগে নি। এদিকে বাখারী ও ঝুলন্ত ডালের সংযোগস্থলে দ্বৈরথ যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে। দু-দলের দুজন করে টানাটানি কামড়াকামড়ি চলছে। দেখলাম বেড়ার উপরের দলের কয়েকটি সৈন্য ঝুলন্ত বাসার কয়েকটি সৈন্যকে শুঁড়ে কামড়ে ধরে তাদের দিকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, আবার ঝুলন্ত বাসার সৈন্যেরাও এক এক জনে এক-একটি করে শত্রুসৈন্যকে শুঁড়ে কামড়ে ধরে তাদের দিকে টানছে। যাকে টানছে সে প্রাণপণে পিছু হটবার চেষ্টা করছে, আবার কেউ কেউ ছ'টি পা দিয়ে অবলম্বন-স্থল আঁকড়ে রয়েছে। অনেকক্ষণ টানাটানির পর কেউ কেউ শুঁড়ের অর্ধাংশ শত্রুর মুখে রেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করছে। ক্রমশঃ লড়াই এমন ভীষণাকার ধারণ করলো যে, দু-তিন হাত প্রশস্ত স্থানের মধ্যে প্রায় সর্বত্র এরূপ টানাটানি কামড়াকামড়ি চলতে লাগলো। এখন শুধু টানাটানি নয়, কামড়াকামড়িই যেন বেশী দেখা যেতে লাগলো। আর সঙ্গে সঙ্গে

সেই বিষ-বাষ্পের অবাধ প্রয়োগ। এতগুলি পিঁপড়ের দেহনিঃসৃত বিষাক্ত রসের উগ্র গন্ধে যেন নাক জ্বলে যাচ্ছিল। কামড়া-কামড়ি করতে করতে জড়াজড়ি করে শত শত পিঁপড়ে ঝুপ ঝুপ করে নীচে পড়ছিল। নীচে মাটির উপর চেয়ে দেখলাম—প্রায় পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যে উভয় পক্ষের এত পিঁপড়ে মারা গেছে যে, ঘাসপাতাগুলি তাদের মৃতদেহের নীচে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। মনে হলো উভয় পক্ষের সৈন্যসংখ্যা প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। যারা তখনও ছুটাছুটি করছিল, তাদের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম—প্রায় প্রত্যেকেরই শুঁড় অথবা পায়ের সঙ্গে মরণ-কামড় দিয়ে ঝুলে রয়েছে শত্রুদের ছিন্ন মস্তক অথবা দেহের সম্মুখাংশ। বেড়ার উপরের পিঁপড়েরা সর্বদাই চেষ্টা করছিল, যাতে বাসাটাকে গিয়ে দখল করতে পারে। এত লড়াইয়ের পরেও দেখলাম, তাদের উৎসাহ কিছুমাত্র কমে নি। তাদের বাসা থেকে নতুন নতুন সৈন্য এসে পূর্ণোদ্যমে আবার আক্রমণ শুরু করলো। এবার যেন তারাই জয়ী হয়েছে বলে বোধ হলো। ঝুলন্ত বাসার সৈন্যদের সংখ্যা আর বেশী দেখা যাচ্ছিল না। বিশেষতঃ উভয় পক্ষের সৈন্যদের আকৃতি একই প্রকার বলে বিশেষ কিছু বুঝতে পারছিলাম না যে, কে শত্রু কে মিত্র। কিন্তু এরা পরস্পর শুঁড়ে শুঁড় ঠেকিয়ে বা অন্য কোনও উপায়ে শত্রু-মিত্র চিনে নিচ্ছিলো। এদিকে বাখারীর উপরের দল দুই চারটি করে ক্রমে ক্রমে বাসার উপরে এসে জড়ো হতে লাগলো, কিন্তু তারাও যে বেশ ভয়ে ভয়ে ইতস্ততঃ করে অগ্রসর হচ্ছিল, তাও বেশ বোঝা গেল। কিছুক্ষণ বেশ চুপচাপ। বাসার সৈন্যসামন্ত যেন ক্রমশঃ বিরল হতে লাগলো। ঝুলন্ত বাসার পিঁপড়েরা যে যুদ্ধে হেরে গেছে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ ছিল না! কিন্তু বাসাটার খুব কাছে গিয়ে কান পেতে শোনলাম—ভিতরে যেন অজস্র পিঁপড়ের একটা খস্ খস্ আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট এভাবে কেটে গেল, তার পরেই দেখি—গুটি কয়েক পিঁপড়ে বাসার ভিতর থেকে অপরিণতবয়স্ক বাচ্চাগুলিকে মুখে নিয়ে বেরিয় এলো। পিছনে তাদের একদল সৈন্য যেন পাহারা দিতে দিতে

চলেছে। বাচ্চাবহনকারীরা কোনও দিকেই ভ্রূক্ষেপ না করে গাছের ডাল ও বাখারীটার উপর দিয়ে অতি দ্রুতগতিতে পালিতা-মাদারের খুঁটিটার উপর যেতে লাগলো। সৈন্যরাও তাদের অনুসরণ করছিল। এই ব্যবধানটুকুর মধ্যে শত্রুরা বিশেষ কিছু বাধা দেবার চেষ্টা করলো না, কেবল দু-একটা সৈন্যকে ধরে টানা দিয়ে রাখলো মাত্র। বিশেষতঃ তখন সেস্থানে শত্রুর সংখ্যাও খুব কমই ছিল। যারা ছিল তাদের অধিকাংশই যেন মারামারি করা অপেক্ষা বাসাটা লুট করবার উৎসাহে সেই দিকেই ছুটছিল। খানিক পরে দেখা গেল, আরও অনেকে ডিম ও বাচ্চাগুলিকে মুখে নিয়ে দলে দলে বাসা থেকে ছুটে বের হয়ে সেই গাছটার দিকেই প্রাণপণে ছুটছে। তন্মুহূর্তেই আবার ভীষণ লড়াই শুরু হয়ে গেল। বাসার ভিতরে এতক্ষণ অসংখ্য সৈন্য যেন দম নেবার জন্যে চুপ করে বসেছিল—এবার তারা দলে দলে বেরিয়ে এসে শত্রুদের খণ্ড খণ্ড করে ফেলতে লাগলো। এদিকে ফাঁকে ফাঁকে তারা বাসার ডিম ও বাচ্চাগুলিকে সরিয়ে নিচ্ছিল। সেই গাছটার উপর শত্রুরা এবার সত্যসত্যই পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। খুঁটিটার মাথার উপর কতকগুলি নতুন ডাল গজিয়েছিল। সেই ডালের পাতা মুড়ে সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি কর্মী পিঁপড়ে নতুন বাসা নির্মাণে লেগে গেল। এভাবে একটা ডালের মধ্যেই তিন-চারটা ছোট ছোট বাসা তৈরি হয়ে গেল। বাসা নির্মাণ শেষ হতে না হতেই তারা ডিম ও বাচ্চাগুলিকে তার মধ্যে স্তূপাকারে রাখতে লাগলো। এদিকে ঝুলন্ত বাসাটার নীচের দিকে নজর পড়তেই দেখি—এক আশ্চর্য ব্যাপার। যখন শত্রু-সৈন্যেরা ভিতরে ঢুকে পড়েছিল, সেই সময়ে ভয় পেয়ে কতকগুলি কর্মী পিপঁড়ে বাচ্চা মুখে করে বাসাটার নীচের দিকে জড়ো হয়েছে। ক্রমশঃ স্থানাভাব হওয়ায় কর্মীরা বাচ্চা মুখে করে স্তূপাকারে নীচের দিকে ঝুলে রয়েছে। যাহোক, এদিকে শত্রুপক্ষ পরাভূত হওয়ায় তাদের রাস্তা খোলাসা হয়ে গিয়েছিল। এখন বাখারী ও গাছটার দুদিকে ইতস্ততঃ অনেক সৈন্য পাহারায় নিযুক্ত করে তারা ডিম ও বাচ্চাগুলিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। ডিম ও বাচ্চাগুলিকে সরাবার পর তারা পুরুষ পিঁপড়েগুলিকে ঠিক নিশান বহন করবার মত উঁচু

করে নিয়ে আসতে লাগলো। পুরুষের সংখ্যাও কম ছিল না। দেড় শত কি দুই শতের উপর হবে। তার পর রাণীদের পালা। রাণীরা আকারে ওদের তুলনায় খুবই বড়। সেগুলিকে বহন করে আনা অসুবিধাজনক। রাখালেরা যেমন গরুর পাল তাড়িয়ে নেয়, কর্মীরাও রাণীগুলিকে তেমনি পিছনে পিছনে তাড়িয়ে আনছিল। শত্রুপক্ষের লাইন তখন ভেঙে গেছে। কেবলমাত্র দু-চারটা কর্মী বিচ্ছিন্নভাবে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছিল। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। এপর্যন্ত দেখেই সেদিন সেখান থেকে ফিরে এসেছিলাম। তার পরের দিন সকালে গিয়ে দেখি—বাসাটি শূন্য অবস্থায় ঝুলছে। বাসিন্দাদের কতকগুলি অবশ্য তখনও সেখানে এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করছিল। পালিতা-মাদারের খুঁটির গা বেয়ে বাখারীর উপর দিয়ে তারা পরিষ্কার রাস্তা করে দলে দলে উপরে-নীচে আনাগোনা করছে। আর শত্রুপক্ষ বাখারীর বিপরীত দিক দিয়ে পূর্বের ন্যায় লাইন করে চলছে। এখন আর শত্রুতার ভাব দেখা গেল না।

## ক্ষুদে-পিঁপড়ের ব্লিৎস্‌ক্রিগ

কেবল বিদ্যুৎগতিতে সৈন্য পরিচালনাই নয়, শত্রু-ঘাঁটির যাবতীয় বিধি-ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা উৎপাদন এবং তৎসহ অবিরাম শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাত সহকারে প্রবল বন্যাপ্রবাহের মত যান্ত্রিক বাহিনীর যুগপৎ দুর্ধর্ষ আক্রমণই ব্লিৎসক্রিগের বিশেষত্ব। আকাশ থেকে বোমারু বিমানের নিরবচ্ছিন্ন অগ্নিবর্ষণ, সঙ্গে সঙ্গে প্যারাশুটিষ্ট সৈন্যদের নগরাভ্যন্তরে অবতরণ এবং পঞ্চমবাহিনীর সহায়তায় পেট্রোল সরবরাহের আস্তানা, বিমান ঘাঁটি, যানবাহন চলাচল ও সংবাদ আদান-প্রদানের কেন্দ্রসমূহ দখল করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলেই সাধারণ নাগরিকেরা ভীতিবিহ্বল চিত্তে প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে স্বপক্ষীয় সৈন্য চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং অনেকে দলিত ও পিষ্ট হয়ে বেঘোরে প্রাণ হারাতে বাধ্য হয়। ছোটখাটো পাহাড়-পর্বত বা উচ্চভূমিতে বাধা পেয়ে বন্যার জল যেমন বর্ধিত তেজে ভীমগর্জনে প্রবাহিত হতে থাকে, যান্ত্রিক বাহিনীও সেইরূপ জীবন-মরণ তুচ্ছ করে সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই হলো সমর-কৌশলের চমকপ্রদ অভিব্যক্তি। মানুষের পক্ষে এরূপ সমরনীতি বা 'ব্লিৎসক্রিগ' পরিচালনা সম্ভব হলেও মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে কোথাও যে এইরূপ কৌশল অনুসরণ করা সম্ভব নয় এটা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু পিঁপড়েদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে এমন কয়েকটি লড়াই প্রত্যক্ষ করবার

সুযোগ ঘটেছিল যাতে তাদের এক পক্ষের রণকৌশল—সৈন্য পরিচালন, সৈন্য-সংস্থান এবং অসতর্ক মুহূর্তে বিদ্যুৎ-গতিতে আক্রমণ প্রভৃতি ব্যাপার, বহুলাংশেই 'ব্লিৎস্‌ক্রিগে'র অনুরূপ বলে মনে হয়। এমন কি, ব্যাপক ধ্বংস ও লুণ্ঠনাদি ব্যাপারের ভীষণতায় হয়তো তা মনুষ্যপরিচালিত 'ব্লিৎসক্রিগকে'ও হার মানায়। এরূপ 'ব্লিৎস্‌ক্রিগে'র এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলছি।

লড়াই বেধেছিল বিভিন্ন জাতীয় দুই দল পিঁপড়ের মধ্যে। এক দল ক্ষুদে, অপর দল বৃহদাকৃতির নালসো পিঁপড়ে। বিভিন্ন জাতীয় পিঁপড়ের জীবনযাত্রা-প্রণালীর বিষয় যাঁরা সম্যক অবগত নন, তাঁদের বোঝবার সুবিধার জন্যে যুদ্ধমান পিঁপড়েদের মোটামুটি একটু পরিচয় দিচ্ছি। আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই আম, জাম, পাকুড় প্রভৃতি গাছে লাল রঙের এক প্রকার দুর্ধর্ষ পিঁপড়ে দেখতে পাওয়া যায়। কতকগুলি পাতা একত্রে জুড়ে এই পিঁপড়েরা গাছের ডালে বড় বড় গোলাকার বাসা নির্মাণ করে থাকে। এদের স্বভাব অতিশয় উগ্র; কাকেও বাসার নিকটে পেলেই দলে দলে ছুটে এসে আক্রমণ করে। মরে গেলেও কামড় ছাড়ে না। এদের পরিবারের মধ্যে শ্রমিক, পুরুষ ও রাণী—এই তিন রকমের পিঁপড়ে দেখা যায়। পুরুষ ও রাণী উভয়েরই ডানা আছে; কিন্তু শ্রমিকদের ডানা থাকে না। পুরুষের শরীরের রং কালো, রাণীদের রং সবুজ; কিন্তু একমাত্র শ্রমিকদের শরীরের রং-ই লাল। রাণীরা লম্বায় প্রায় এক ইঞ্চির মত বড় হয়। পুরুষের শরীরের দৈর্ঘ্য আধ ইঞ্চির কিছু বেশি। শ্রমিকরা সিকি ইঞ্চি থেকে আধ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। শ্রমিকেরাই তাদের সংসারের যাবতীয় কাজ করে থাকে। যুদ্ধের সময় সৈনিকের কাজও এরাই করে। এক একটি বাসার মধ্যে প্রায় শতাধিক রাণী, কয়েক শত পুরুষ এবং চার-পাঁচ হাজার বা ততোধিক শ্রমিক বাস করে। তাছাড়া বাসার মধ্যে থাকে হাজার হাজার ডিম, বাচ্চা ও পুত্তলী। বাচ্চাগুলিই পিঁপড়েদের প্রধান সম্পত্তি। এগুলিকে রক্ষা করবার জন্যে শ্রমিকেরা প্রাণ বিসর্জনেও কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। বাচ্চা না হলে এদের বাসা তৈরি করা সম্ভব হয় না। বাচ্চার সাহায্যে

সুতা বুনে বাসা নির্মাণ করে। এদের যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র হচ্ছে ধারালো সাঁড়াশীর মত একজোড়া শক্ত চোয়াল এবং একপ্রকার বিষাক্ত গ্যাস। যুদ্ধ বাধবার উপক্রম হলেই শরীরের পশ্চাদ্দেশ উঁচু করে শত্রুর প্রতি অনবরত গ্যাস ছুড়তে থাকে। তারপর সুরু হয় কামড়াকামড়ি। এই পিঁপড়েগুলিকে সাধারণতঃ লাল-পিঁপড়ে বলা হয়। বাংলা দেশে এরা নালসো-পিঁপড়ে নামে পরিচিত।

আমাদের দেশে বহু জাতীয় ক্ষুদে পিঁপড়ে দেখা যায়। তাদের মধ্যে এক জাতীয় ক্ষুদে পিঁপড়ের শরীরের সম্মুখভাগ লাল্‌চে হলুদ বর্ণের, কিন্তু পশ্চাদ্ভাগ কালো। দেড় থেকে দুই মিলিমিটারের বেশী বড় হয় না। এগুলিকে প্রায়ই সুদীর্ঘ লাইন করে উঁচু জমি, ঘরের দেয়াল বা বড় বড় গাছের উপর বিচরণ করতে দেখা যায়। এক-একটি ফাটলে বা গর্তে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে পিঁপড়ে বসবাস করে। নালসো-পিঁপড়ে অপেক্ষা এরা অনেক ধীরগতিসম্পন্ন। ক্ষুদে পিঁপড়েরা নালসো-পিঁপড়ে এবং তাদের ডিম ও বাচ্চাগুলিকে অতি উপাদেয় বোধে উদরসাৎ করে থাকে। ক্ষুদে পিঁপড়েদের দংশন অতি বিষাক্ত, বিশেষতঃ নালসোদের পক্ষে এই বিষ অতি মারাত্মক বলেই মনে হয়। নালসোদের সম্পত্তি লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে ক্ষুদেরা তাদের সঙ্গে লড়াই বাধায় এবং শত্রুকে পর্যুদস্ত করবার জন্যে বিবিধ কৌশল অবলম্বন করে। নালসোদের সঙ্গে এদের যুদ্ধ প্রায়ই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। সময় সময় উভয় পক্ষে একটা সাময়িক সন্ধিও হতে দেখা যায়। নালসোরা প্রায়ই চুক্তি ভঙ্গ করে না; কিন্তু ক্ষুদেরা সুযোগ বুঝলেই যখন-তখন চুক্তি ভঙ্গ করে নাল্‌সোদের আক্রমণ করে থাকে।

পিঁপড়েদের জন্মরহস্য বড়ই জটিলতাপূর্ণ। এই জন্মরহস্যের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ধারণের জন্যে কিছুকাল থেকে নালসো-পিঁপড়ে নিয়ে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। আণুবীক্ষণিক পরীক্ষার জন্যে বহুসংখ্যক পিঁপড়ের দেহ ব্যবচ্ছেদ করবার প্রয়োজন হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কলকাতার আশেপাশে নালসো-পিঁপড়ের প্রাচুর্য লক্ষিত হলেও শহরের অভ্যন্তরে যথেষ্ট গাছপালার অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও কোথাও এদের সন্ধান পাওয়া যায় না।

এই অসুবিধার জন্যে কিছুকাল পূর্বে শিবপুরের বাগান থেকে পিঁপড়ে সমেত বড় বড় বাসা থলেয় পুরে নিয়ে এসে পরীক্ষাগারের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ছোট্ট একটা আমগাছে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, পিঁপড়েরা নতুন বাসা বেঁধে গাছটাতে উপনিবেশ স্থাপন করবে। প্রথমতঃ একটা থলের মুখ খুলে বাসাটাকে বের করে গাছের একটা নীচু ডালে আট্‌কে দিয়েছিলাম। পাত্‌লা সাদা কাগজের মত পর্দার সাহায্যে পাতাগুলিকে পরস্পর জুড়ে নালসোরা বাসা নির্মাণ করে। দূরবর্তী স্থান থেকে থলেয় পুরে আনবার সময় জোড়ামুখের পর্দা ছিঁড়ে বাসাগুলি স্বভাবতঃই কিছু না কিছু জখম হয়ে থাকে। তাছাড়া বাসার পাতাগুলি শুকোতে সুরু হতেই বাসাটা ক্রমশঃ বাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে। বাসাটা ভাঙ্গবার লক্ষণ দেখেই সহজাত সংস্কারবশে পিঁপড়েরা নতুন পত্র-পল্লবের মধ্যে নতুন বাসা নির্মাণ করতে সুরু করে। স্বাভাবিকভাবে বিপদ-আপদ সংঘটিত হলে সাধারণতঃ এদের এরূপ কার্যপ্রণালীই অনুসরণ করতে দেখা যায়। এই ভরসাতেই পত্র-পল্লবের মধ্যে বাসাটাকে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিক। মাঝে মাঝে এক-আধ পশলা বৃষ্টি হচ্ছে। পিঁপড়েগুলি পুরাতন বাসা থেকে ছুটাছুটি করে বেরিয়ে আসতে লাগলো। সকলেই ভয়ানক উত্তেজিত। তাদের অনেকগুলি বাসাটাকে ঘিরে পাহারা দিয়ে আর মাঝে মাঝে একে অন্যের মুখে মুখ ঠেকিয়ে কি যেন সঙ্কেত করে, আবার ছুটে গিয়ে চতুর্দিক তদারক করে আসে। কতকগুলি আবার নিশ্চল পুত্তলিকার মত শুঁড় উঁচিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে খাড়া পাহারায় নিযুক্ত। আমাকে সেখানে নড়াচড়া করতে দেখে আর একদল—প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি হবে—বাসার শেষ প্রান্তে এসে নিম্নভাগ ঘেঁষে সম্মুখের পা দুটি শূন্যে তুলে অদ্ভুত ভঙ্গীতে ভীতি প্রদর্শন করছিল। কতকগুলি আবার শরীরের পশ্চাদ্ভাগ ঊর্ধ্বে তুলে আমার প্রতি বিষাক্ত গ্যাস ছড়াচ্ছিল, একটা অপ্রীতিকর গন্ধে তা বুঝতে পারলাম। কয়েক শত নালসো তড়িদ্‌গতিতে ছুটাছুটি করে গাছটার বিভিন্ন ডালে নতুন স্থানের অবস্থা তদারক করতে লেগে গেল। ভাবলাম শীঘ্রই হয়তো নতুন বাসার পত্তন সুরু হবে, কিন্তু কোথায় হবে তার কিছুই

বুঝা গেল না। প্রায় তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেল, তথাপি বাসা নির্মাণ করবার কোনই তোড়জোড় দেখা গেল না। বাসার নীচের দিকটা ছিঁড়ে যাবার ফলে কতকগুলি ডিম ও বাচ্চা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। সেগুলির লোভে ইতিমধ্যে কতকগুলি ক্ষুদে পিঁপড়ে আনাগোনা সুরু করেছে। আমার নজর ছিল তখন নালসোদের দিকে। ক্ষুদে পিঁপড়ে তো সর্বত্রই আছে—এখানেও ছিল, ডিমের লোভে এসেছে—এই ভেবেই ব্যাপারটা উপেক্ষা করে গেলাম।

বেলা তখন ৫টা হবে। হালকা এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। গাছের ডালে ডালে যে নালসোগুলি ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়েছিল, বৃষ্টির দরুণ তাদের আনাগোনা কমে গেছে। তাদের অনেকেই বাসায় ফিরে এসেছে। খাড়া পাহারা ও টহলদাররাও অনেকেই বাসায় আশ্রয় নিয়েছে। ইতিমধ্যে একটা জিনিষ লক্ষ্য করে বিস্মিত হলাম। ঘণ্টা দুই পূর্বে যে ক্ষুদে পিঁপড়েরা মাটির উপর বিচরণ করছিল, তারা এখন একটা সরু লাইন করে প্রায় ছয়-সাত হাত তফাৎ থেকে গাছের গুঁড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এর ফলে যে একটা গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, সে বিষয়ে তখন কিছুমাত্র সংশয় জাগে নি। যাহোক, নিরাশ হয়ে সেদিনের মত পর্যবেক্ষণ বন্ধ করতে হলো।

তার পরের দিন সকাল সাড়ে আটটার সময় অবস্থার কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হলো। নালসোগুলিকে গাছের উপর ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম না। এতদ্ব্যতীত যে ডালটায় তাদের বাসা ঝুলছিল, সেই ডালটার আগাগোড়া কতকগুলি টহলদার নালসো মোতায়েন হয়েছে। বাসাটার উপরেও কয়েকটা খাড়া পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে। গাছটার বিপরীত দিকে যেতেই শিকড়ের প্রায় কাছাকাছি গুঁড়িটার গায়ে ৫০।৬০টা লাল পিঁপড়েকে শুঁড় উঁচিয়ে নীচের দিকে মুখ করে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। তার কিছু উপর থেকেই ডালটা পর্যন্ত দশ-বারোটা নালসো বার্তাবাহকের মত একবার উপরে একবার নীচে ছুটাছুটি করছে। এক-একটি বার্তাবাহক নীচ থেকে বাসার দিকে ছুটে যাবার পথে ডালের উপরে টহলদার ও খাড়া

পাহারাদারদের প্রত্যেকের মুখের সঙ্গে মুখ ঠেকিয়ে কি যেন বলে যাচ্ছিল। যাই বলুক, সেটা যে কোনও উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদ, তাতে কোনই সন্দেহ ছিল না। কারণ বার্তাবাহকের মুখ ঠেকাঠেকি হবার পরক্ষণেই প্রত্যেকটি পাহারাদার যেন জোড় পায়ে লাফাতে লাগলো। এক দিন এক রাত কেটে গেছে—উত্তেজনা একটু মন্দীভূত হবারই কথা। তবে এরা আজ আবার বাসা থেকে এত দূরে এসে ঘাঁটি নিয়েছে কেন? চারদিক ঘুরে ফিরে দেখতেই নজরে পড়লো ক্ষুদে পিঁপড়েরা গাছের গোড়াটার চারদিকে আল্‌গা মাটি তুলেছে। আগের দিন যে সরু লাইনটি দেখেছিলাম, সেটি আজ অনেক চওড়া হয়েছে এবং ক্ষুদেরা উৎসাহভরে দলে দলে আনাগোনা করছে। লাইনটি শেষ হয়েছে গাছের গোড়ার কাছে মাটির নীচে। অল্‌গা মাটির উপর এখানে-সেখানে কতকগুলি নালসোর মৃতদেহ পড়েছিল। আল্‌গা মাটির নীচ থেকে অলক্ষিতে ক্ষুদেরা সেই মৃতদেহগুলি টেনে নিয়ে আসছিল। বুঝতে বাকী রইলো না যে, ইতিপূর্বেই উভয় দলে একটা লড়াই হয়ে গেছে। ক্ষুদেরা হয়তো নালসোদের নিকট পরাজিত হয়ে মাটির আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে! যাহোক, ক্ষুদে পিঁপড়েদের অত্যাচার থেকে নালসো-পিঁপড়েগুলিকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে গাছটার চতুর্দিকে পরিখার মত করে সেটাকে জলে ভর্তি করে দিলাম। গাছটার ডালপালার সঙ্গে অন্য কোনও গাছের যোগাযোগ না থাকায় নালসোদের অন্য কোথাও চলে যাবার উপায় ছিল না। এখন ক্ষুদে পিঁপড়েদের সঙ্গে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে গুঁড়ির উপর দিয়ে, নীচের দিকে নেমে আসাতে মাটির উপর দিয়ে অন্যত্র পলায়ন করবার আশঙ্কা ছিল। গাছের গোড়ার চতুর্দিকে জলের বেষ্টনী দেবার ফলে এক দিকে যেমন নালসোগুলির অন্যত্র পলায়নের পথ বন্ধ হলো, ক্ষুদে পিঁপড়েগুলির পক্ষেও তেমনি জল অতিক্রম করে গাছের নিকট পৌঁছুবার উপায় রইলো না।

বেলা প্রায় একটার সময় ফিরে এসে দেখি—বেষ্টনীর জলের প্রায় অর্ধেকটা মাটিতে শুষে গেছে। বেষ্টনীর অপর পাড় পর্যন্ত ক্ষুদে পিঁপড়ের লাইনটা পূর্বের মতই বজায় আছে, কিন্তু জলের বাধার জন্যে পিঁপড়েরা

অনেকেই নতুন রাস্তা বের করবার জন্যে বাঁধটার নানা স্থানে ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি করছে। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় এই যে, গাছের গোড়ায় মাটির নীচে যে পিঁপড়েগুলি লুকিয়ে ছিল, তারা নালসোদের সংগে অভিনব পরীখা-যুদ্ধ আরম্ভ করে দিয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে একে পরীখা-যুদ্ধ না বলে সুড়ংগ-যুদ্ধ বলাই উচিত। কারণ উইপোকারা যেমন সুড়ংগ নির্মাণ করে অগ্রসর হয়, এরাও সেরূপ মাটির বেষ্টনী তুলে গোড়াটার ৬।৭ ইঞ্চি উপর পর্যন্ত একটা দিক প্রায় ঢেকে ফেলেছে। নালসোদের সৈন্যসংস্থান পূর্বের মতই রয়েছে বটে, কিন্তু পূর্বের অধিকৃত এলাকা থেকে প্রায় ৪।৫ ইঞ্চি পিছু হট্‌তে বাধ্য হয়েছে। হাজার হাজার ক্ষুদে সুড়ংগের অভ্যন্তরে কাজ করছিল ; সুড়ংগের প্রান্তভাগে তাদের মুখ ও শুঁড়গুলি ছাড়া আর কিছুই বড় একটা দেখা যাচ্ছিল না। নালসো-প্রহরীরা অতি সতর্কভাবে তাদের দিকে দৃষ্টি রেখেছে। দৈবাৎ এক-একটি ক্ষুদে বাইরে এসে পড়লে ছোঁ মেরে ধরে নিয়ে কেটে ফেলছে। সময় সময় দুই-একটা ক্ষুদে পিঁপড়েকে শুঁড় ধরে সুড়ংগ থেকে টেনেও বের করছিল। তারাও আবার পাল্টা আক্রমণে তার মুখে বা শুঁড়ে কামড়ে ধরেছে। অবশেষে কামড়ের বিষে জর্জরিত হয়ে উভয়েই জড়াজড়ি করে নীচে পড়ে যাচ্ছে। এদিকে সুড়ংগ ক্রমশঃ উর্ধ্ব দিকে অগ্রসর হয়েই চলছে। বেলা তিনটার সময় সুড়ংগটা প্রায় ১০ ইঞ্চি উর্ধ্বে উঠেছিল। এদিকে আর এক অদ্ভুত কাণ্ড দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বাঁধের জল প্রায় শুকিয়ে আসছিল। জলের মধ্যস্থলে খানিকটা উঁচু জায়গা দ্বীপের মত জেগে উঠেছে। অপর পারের সেই ক্ষুদে পিঁপড়ের লাইন থেকে কয়েকটা পিঁপড়ে একটা দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হয়েছে। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না করলে এরূপ ঘটনার কথা হয়তো বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হতো না। ক্ষুদে পিঁপড়েরা একটার পিছনে আর একটা —এরূপভাবে সার বেঁধে জলের পাত্‌লা আবরণের উপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে দ্বীপটার উপর জড়ো হয়েছে। এখান থেকে গাছের গুঁড়ির দূরত্ব মাত্র দেড় ইঞ্চির কিছু বেশী ছিল। প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যে দেখতে দেখতে তারা সকলে জড়াজড়ি করে একটা মোটা লাইনের

মত জলের উপর ভেসে পড়লো; কিন্তু ব্যবধানটুকু অতিক্রম করতে পারলো না।

প্রায় ৫টার সময় দেখলাম গাছের গুঁড়িটার প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় উভয় পক্ষে ভীষণ লড়াই বেধে গেছে। বাঁধের মধ্যে স্থানে স্থানে সামান্য জল রয়েছে। সেই কর্দমাক্ত জমির উপর দিয়েই ক্ষুদে পিঁপড়েরা এবার মোটা লাইন বেঁধে গাছের গুঁড়ির উপর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। অগ্রবর্তী নালসোরা ক্ষুদে পিঁপড়েদের সঙ্গে মোটেই এঁটে উঠতে পারছিল না। প্রায় প্রত্যেকটা নালসোরই—কারো শুঁড়ে, কারো পায়ে দুই-তিনটা করে ক্ষুদে পিঁপড়ে কামড়ে ধরে ঝুলছিল। নালসোরা এক-একটা ক্ষুদেকে কামড়ে ধরা মাত্রই সেও আবার তার মুখ কামড়ে ধরে। নালসো তখন বিষের জ্বালায় মুখ ঘষতে ঘষতে একদিকে ছুটে পালাতে থাকে। ইতিমধ্যে আরও দু-চারটা ক্ষুদে পিঁপড়ে এসে তাকে কামড়ে ধরতেই শরীরটাকে ধনুকের মত বাঁকিয়ে সবাইকে নিয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে যায়। ক্ষুদেরা প্রবলবেগে আক্রমণ চালিয়েছে, এক-একটা নালসোকে ৪।৫টা ক্ষুদে-পিঁপড়ে মিলে আক্রমণ করছে আর বাকীগুলি ফাঁকফন্দী দিয়ে বন্যার জলের মত অগ্রসর হয়ে চলেছে। প্রায় মিনিট দশেকের মধ্যেই অগণিত নালসো ও ক্ষুদে পিঁপড়ে হতাহত হয়ে ঝুপ্ ঝুপ্ করে নীচে পড়তে লাগলো। ক্ষুদে পিঁপড়েরা করছে এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ আর নালসোরা করছে আত্মরক্ষা। ক্ষুদেদের একটা মারা পড়লে তার স্থলে আরও দশটা এসে দাঁড়ায় আর নালসোরা চায় বাধা দিতে, যাতে শত্রুরা তাদের বাসায় প্রবেশ করতে না পারে। কাজেই নালসোরা পিছু হটে ঘর সামলাতেই ব্যস্ত। যে ডালে বাসাটা ঝুলছিল, ক্ষুদে পিঁপড়েরা আরও প্রায় মিনিট পনেরোর মধ্যেই সেই ডাল ও কাণ্ডের সংযোগস্থলে এসে পৌঁছুলো। ক্ষুদেরা যাতে সেই ডালটায় আসতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে নালসোরা এবার প্রবলভাবে বাধা দিতে লাগলো। বাসা থেকে দলে দলে নালসোরা এসে সেই সংযোগস্থলে সমবেত হতে লাগলো। ক্ষুদে পিঁপড়েরা এস্থলে লাইন করে অগ্রসর হচ্ছিল, কাজেই সংকীর্ণ লাইনের সুবিধা পেয়ে নালসোরা তাদের ধারালো

সাঁড়াশীর সাহায্যে এক-একটা করে ক্ষুদেগুলিকে ধরে কেটে ফেলতে লাগলো। কেউ কেউ আবার ক্ষুদেগুলিকে ধরে ঝুপ্ ঝুপ্ করে নীচে ফেলে দিচ্ছিল। অনেকে আবার জড়াজড়ি করে নীচে পড়ে যাচ্ছিল। নালসোরা উত্তেজিতভাবে এত বিষাক্ত গ্যাস ছাড়ছিল যে, প্রায় দু-হাত তফাৎ থেকে বেশ ঝাঁঝালো গন্ধ অনুভব করছিলাম। বিষাক্ত গ্যাসের উগ্র গন্ধে এবং সমবেতভাবে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়ে ক্ষুদেরা এবার মোটেই সুবিধা করতে পারছিল না। যে পথে অগ্রসর হয়েছিল তারা সেই পথে ফিরতে লাগলো। কিন্তু নালসোরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো না। ডাল ও কাণ্ডের সংযোগ স্থলেই ঘাঁটি আগ্‌লে রইলো। তখনও ক্ষুদেরা সকলেই একেবারে চলে যায় নি, তবে খুবই অল্পসংখ্যক সৈন্য আনাগোনা করছিল। লড়াই চলবার সময় সম্মুখের ঘাঁটি ও ডালের প্রান্তভাগে অবস্থিত বাসা পর্যন্ত দীর্ঘ পথ জুড়ে বার্তাবাহকগুলিকে খুবই উত্তেজিতভাবে ছুটাছুটি করতে দেখা গেল। বাসাটার মধ্যে কি হচ্ছিল তখন লক্ষ্য করবার অবসর পাই নি। এবার বাসার কাছে গিয়ে দেখলাম, যে স্থানে বাসাটা ঝুলছিল, তা থেকে প্রায় হাতখানেক তফাতে কতকগুলি পাতার উপর প্রায় চার-পাঁচ শত নালসো একত্রিত হয়ে নতুন একটা বাসা নির্মাণ করতে সুরু করেছে। কতকগুলি নালসো সারবন্দীভাবে অবস্থান করে অনেকগুলি পাতাকে পরস্পর সংলগ্ন করে কাম্‌ড়ে ধরে রয়েছে। এখনও সুতা বুনে সেগুলিকে জোড়া দেওয়া হয় নি। তারই পাশে আর একটা অপেক্ষাকৃত ছোট্ট বাসারও পত্তন করেছে। শত শত নালসো অতি দ্রুতগতিতে সেই অসম্পূর্ণ বাসার মধ্যেই তাদের ডিম ও বাচ্চাগুলিকে স্থানান্তরিত করছিল। যে ডালটার উপর দিয়ে ডিম, বাচ্চা প্রভৃতি স্থানান্তরিত করা হচ্ছিল, তার এক পাশে শতাধিক খাড়া পাহারা মোতায়েন রয়েছে। অগ্রবর্তী ব্যূহ ভেদ করতে পারলেও শত্রুর পক্ষে এই ঘাঁটি ভেদ করা সহজ হতো না। সন্ধ্যার একটু পূর্বে দেখা গেল, বাচ্চার সাহায্যে সূতা বুনে নতুন বাসার জোড়া মুখগুলি আট্‌কাবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

তৃতীয় দিন বেলা একটা পর্যন্ত যুদ্ধ সম্পর্কে উভয় পক্ষের কোনও

কর্মতৎপরতা দেখা গেল না। নালসোদের পাহারার ব্যবস্থায় একটু শৈথিল্য লক্ষিত হলো। কিন্তু তখনও তাদের ডিম, বাচ্চা অপসারণ পূর্ণোদ্যমে চলছিল। ক্ষুদে পিঁপড়েরা অন্য দিকের একটা ডালের গা বেয়ে উপরের দিকে লাইন করে চলছিল, অবশ্য নালসোদের অধিকৃত ডালটার আশেপাশেও দু-একটা ক্ষুদে পিঁপড়েকে আনাগোনা করতে দেখা গেল। ডালটার একটু কাছে যেতেই গোটা তিনেক পাহারাদার নালসো হঠাৎ যেন কেমন একটা ভয় পেয়ে উল্টোমুখে ছুটে গিয়ে খাড়া একটা ডালের উপর উঠলো। ক্ষুদে পিঁপড়েরা সেই ডালটার অপর পার্শ্ব দিয়েই উপরে যাতায়াত করছিল। দলভ্রষ্ট নালসোদের একটা ছুটতে ছুটতে গিয়ে তাদের লাইনে পড়লো। আর যায় কোথা! পাঁচ-সাতটা ক্ষুদে মিলে সেটাকে কাবু করে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেললো এবং বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে বাসার দিকে বয়ে নিয়ে চললো। এই আকস্মিক ব্যাপারে ক্ষুদেদের লাইনের ভিতর একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হলো। লাইন ছেড়ে অনেকেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে যেন অপরাপর দুষ্কৃতকারীদের সন্ধান করতে লাগলো। ইতিমধ্যে আর একটা নালসোর সঙ্গে হঠাৎ আবার ক্ষুদেদের দেখা হয়ে গেল। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে তাদের অধিকৃত স্থানে উপস্থিত হয়ে একেবারে বাসার মধ্যে ঢুকে পড়লো। ক্ষুদে পিঁপড়েরা নালসোর সঙ্গে সমান বেগে ছুটতে না পারলেও বোধ হয় তার গন্ধ অনুসরণ করে কিছুক্ষণ পরেই পূর্বোক্ত লড়াইয়ের স্থলে উপনীত হলো এবং কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে লাইনের মধ্যে ফিরে গেল। প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট পরে ক্ষুদেরা ঊর্ধ্বগামী লাইন থেকে খুব ক্ষীণ একটা লাইনে নালসোদের অধিকৃত ডালের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। নালসোদের ডালের মাঝামাঝি তারা কোনই বাধা পেল না। আর কিছুদূর অগ্রসর হতেই একটা টহলদার নালসো অগ্রবর্তী ক্ষুদে পিঁপড়েটাকে ধরে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেললো। আর একটাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হওয়া মাত্রই দুটা ক্ষুদে পিঁপড়ে তার দুই ঠ্যাং কামড়ে ধরলো। যন্ত্রণায় নালসোটা কিছুক্ষণ লাফালাফি করে অতি অল্প সময়েই নিস্তেজ হয়ে পড়লো। তখম একে একে ক্ষুদেরা অর্ধমৃত পিঁপড়েটাকে ঘিরে ধরলো।

ক্ষুদেদের প্রধান লাইনে এই সংবাদ পৌঁছুতে বিলম্ব হলো না। দেখতে দেখতে ক্ষুদেপিঁপড়েরা কাতারে কাতারে ডালটার দিকে অভিযান শুরু করে দিল। ডালটার ঠিক মধ্যস্থলে প্রায় হাতখানেক স্থান জুড়ে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলতে লাগলো। ক্ষুদেদের প্রবল চাপ নালসোরা এবার সহ্য করতে পারছিল না! বাধা দিতে দিতে তারা ক্রমেই পিছু হট্‌তে লাগলো। দলে দলে নালসোরা প্রাণ দিতে লাগলো, কিন্তু ক্ষুদেদের সৈন্যসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বোধ হলো যেন বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধেই তারা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারছিল না। কারণ সে স্থলে বহু নালসো সমবেত হয়ে একযোগে গ্যাস ছাড়ছিল। প্রায় মিনিট পাঁচ-সাত এভাবে চলবার পর দেখা গেল, ক্ষুদে পিঁপড়েরা এক নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে। পুরাতন বাসাটার প্রায় দুই ইঞ্চি উপরে অন্য ডালের একটা পাতার ডগা ঝুলছিল। উপরের ডাল ধরে ঘুরে গিয়ে ক্ষুদেরা সেই পাতাটার ডগা পর্যন্ত পৌঁচেছে; কিন্তু যোগাযোগ না থাকায় নামতে পারছিল না। বাসাটা যে খুবই নিকটে, গন্ধে বোধহয় তা টের পেয়েছিল। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করবার পর অবশেষে ক্ষুদেরা একে একে ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ করে বাসাটার উপর পড়তে লাগলো, যেন প্যারাশুটিষ্টের অবতরণের মত। অবতরণ করে বিনা বাধায় তাদের অনেকেই বাসাটার ছিন্ন অংশ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো। বাসার উপরেই এই অবতরণকারী সৈন্যদের কয়েকটার সঙ্গে নালসোদের ভীষণ ধস্তাধস্তিও চলছিল। প্রায় ৬০।৭০টা ক্ষুদে পিঁপড়ে ভিতরে প্রবেশ করেছে। ভিতরে তখন কি ঘটছিল, বাইরে থেকে তা দেখবার উপায় ছিল না; কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখা গেল নালসোরা বাসার বিভিন্ন বিছিন্ন অংশেব ভিতর দিয়ে দ্রুতগতিতে যে দিকে পারে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। অনেকে আবার ডিম ও বাচ্চাগুলিকে মুখে নিয়ে বের হয়েছে। তাদের চাল-চলন ও গতিভঙ্গী দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারা গেল যে, তারা ভয়ানক ভয় পেয়ে গেছে। চতুর্দিকে একটা ভীষণ অরাজক কাণ্ড। এদিকে ডালের উপরের ক্ষুদে-পিঁপড়েরা অগ্রগতিতে বাধা পেয়ে একটা নতুন পন্থা অবলম্বন করেছে। এতক্ষণ ডালটার উপর দিকেই যুদ্ধ চলছিল। পাশে ও নীচের দিকে

নালসোদের কোনও রক্ষণ ব্যবস্থা ছিল না। এই সুযোগে ক্ষুদেরা ডালটার নীচ ও পাশের দিক দিয়ে আরও দুটা নতুন লাইনে অগ্রসর হতে লাগলো। এই কৌশলে এক রকম বিনা বাধায় বহু সংখ্যক শত্রুসৈন্য নালসোদের বাসার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো। পূর্বেই বাসার মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল। —এখন অতর্কিতে বহু শত্রুসৈন্য বাসার প্রবেশ পথ ধরে আক্রমণ করবার ফলে বিশৃঙ্খলা চরমে উঠলো। মাঝখানে এক দল এবং বাসাটার নিকটে দু-তিন দলে বিচ্ছিন্ন ভাবে লড়াই চলতে লাগলো। নালসোদের মধ্যে যোগাযোগ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কাজেই প্রাণভয়ে সকলেই পালাতে ব্যস্ত। তারা এতই ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে, অকে পিঁপড়ে দিশাহারা হয়ে ছুটতে গিয়ে বাসার উপর থেকে ঝুপ্ ঝুপ্ করে নীচে পড়তে লাগলো। সেখানে তারা মাটিতে অবস্থিত ক্ষুদে-পিঁপড়েদের কবলে পড়ে প্রাণত্যাগ করতে বাধ্য হলো। বাসাটার বাইরের দিকে একস্থানে দেখলাম, প্রায় ৪০।৫০টা রাণী এক সঙ্গে জড়াজড়ি করে ভয়ে আত্মগোপন করে রয়েছে। নতুন বাসার মধ্যে অসংখ্য নালসো আশ্রয় গ্রহণ করলেও পুরাতন বাসায় তখনও কয়েক হাজার পিঁপড়ে অবস্থান করছিল। ডিম, বাচ্চা প্রভৃতিও কম ছিল না; তাছাড়া পুরুষ ও রাণী যথেষ্ট ছিল। সেগুলিকে তখনও নতুন বাসায় স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয় নি। ক্ষুদেদের আক্রমণ থেকে এদের একটি প্রাণীও রক্ষা পেল না। প্রায় আধ ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই ক্ষুদেরা এই যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করলো। তখন বাসার উপরে ও আশেপাশে নালসোদের অজস্র মৃতদেহ ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ছিল না; অবশ্য ওদের সঙ্গে ক্ষুদে সৈন্যদের মৃতদেহও অনেক ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত ক্ষুদেরা মৃতদেহগুলি খণ্ড খণ্ড করে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল। যুদ্ধের পরেও দুই দিন পর্যন্ত এই মৃতদেহ, ডিম ও বাচ্চার অপসারণ-কার্য চলেছিল। এক স্থানে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। লড়াইয়ের সময় কতকগুলি নালসো উপরের একটা পাতা থেকে শিকল গেঁথে নীচের অন্য একটি ডালে পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছিল। ক্ষুদেদের আক্রমণ থেকে তারাও কেউই রেহাই পায় নি। জ্যান্ত পিঁপড়ের শিকলটি এখন কতকগুলি মৃতদেহের শিকলে পরিণত হয়ে ঝুলছিল। পুরাতন বাসাটা দখল করবার পর ক্ষুদেরা নতুন বাসাটা আক্রমণ করে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে ফেলে; কিন্তু সেটা বিশেষ সুরক্ষিত থাকায় যুদ্ধ চলেছিল প্রায় দিন দুয়েরও বেশী।

# প্রজাপতি

## দুধলতা প্রজাপতির জন্মকথা

রূপকথার ব্যাং যেমন রাজকন্যা সকাশে তার কুৎসিত আবরণটা পরিত্যাগ করে রাজপুত্রের রূপ ধারণ করতো, প্রাণী-জগতে কিন্তু এরূপ সত্যিকার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। আমাদের আশেপাশে অহরহ কত বিচিত্র বর্ণের সুদৃশ্য প্রজাপতিকে উড়ে বেড়াতে দেখতে পাই। তাদের জন্ম-ঘটনা পর্যবেক্ষণ করলেই তার সত্যতা প্রমাণিত হবে। এস্থলে আমাদের দেশীয় লাল্চে, হল্দে রঙের দুধলতা প্রজাপতির জন্ম কথা বলছি।

কলকাতার আশেপাশে বনে-জঙ্গলে বড় গাছ বা বেড়ার গায়ে অযত্ন-বর্ধিত এক প্রকার বন্য লতার প্রাচুর্য দেখতে পাওয়া যায়। এদের পাতাগুলি একটু গোলাকার ধরণের, প্রায় প্রত্যেকটা গাঁট থেকে এক-একটা লম্বা বোঁটার ডগায় এক জোড়া কাঁটাওয়ালা সবুমুখ ফল ধরে। ফলগুলি শুকিয়ে ফেটে যায় এবং ঝাঁটার মত এক গোছা সূক্ষ্ম তন্তু সমন্বিত বীজ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে, পাতা বা ডাঁটা ছিঁড়লে দুধের মত রস ঝরতে থাকে। এই জন্যেই বোধ হয় এগুলিকে দুধলতা বলা হয়ে থাকে। একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলেই এই লতার গায়ে অদ্ভুত আকৃতি-বিশিষ্ট এক প্রকার অজস্র শোঁয়াপোকা দেখতে পাওয়া যাবে। এই শোঁয়াপোকাগুলি প্রায় এক ইঞ্চি থেকে দেড় ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। গায়ের উপরিভাগে হল্দে ও কালো রঙের ডোরাকাটা। দেহের সম্মুখভাগে পিঠের উপর দুই জোড়া এবং পিছনের দিকে এক জোড়া কালো রঙের লম্বা শুঁড় আছে। মুখটা শাদা-কালো ডোরায় চিত্রিত। একটু

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এরা রাতদিন এই দুধলতার পাতা ও ডাঁটা কুরে কুরে খাচ্ছে, এক দণ্ডও বিশ্রাম নেই ; পাতার ধার থেকে আরম্ভ করে নীচের দিকে প্রায় আধ ইঞ্চি স্থান লম্বালম্বিভাবে অতি সূক্ষ্ম অংশে কেটে খায়। খাবার সময় দেখা যায় যেন মুখটাকে কেবল বারবার উপর থেকে নীচের দিকে নামাচ্ছে। এদের চেহারা দেখতে ভীষণ হলেও অন্যান্য সাধারণ শোঁয়াপোকার মত এরা বিষাক্ত নয়। অন্যান্য সাধারণ শোঁয়াপোকা মানুষের গায়ে লাগলেই চামড়ার মধ্যে শোঁয়াগুলি গেঁথে যায় এবং সে স্থানে প্রদাহ—এমন কি, সময়ে সময়ে ক্ষতেরও সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই শোঁয়পোকার গায়ে মোটেই শোঁয়া নেই। এরাই দুধলতা প্রজাপতির বাচ্চা বা কীড়া। এই কীড়া বা শোঁয়াপোকাই কালক্রমে অমন সুন্দর প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ এই দুধলতা প্রজাপতিই যেখানে-সেখানে বেশীর ভাগ নজরে পড়ে। দিনের বেলায় উড়ে বেড়াবার সময় এদের যৌন সম্মিলন ঘটে। এই সম্মিলনের কিছুকাল পরেই স্ত্রী-প্রজাপতি দুধলতার পাতার গায়ে এখানে-সেখানে একটা একটা করে কতকগুলি করে ডিম পেড়ে চলে যায়। দিন দশ-পনেরো পরে ডিম ফুটে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শোঁয়াপোকা বেরিয়ে আসে। তখন তাদের গায়ের রং থাকে কতকটা ছাইয়ের রঙের মত। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবার কিছুক্ষণ বাদেই খেতে শুরু করে দেয়। কিন্তু তখন পাতার সমস্ত অংশটাই খেতে পারে না, কেবল সবুজ অংশটুকুই কুরে কুরে খায়। আর একটু বড় হলেই পাতা বা ডাঁটার সমস্ত অংশ কেটে কেটে খেতে আরম্ভ করে। প্রা দশ-পনেরো দিন এরূপ খেতে খেতে বড় হয়ে হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে শক্ত একটা ডাঁটা নির্বাচন করে শরীরের পশ্চাদ্ভাগ থেকে এক প্রকার আঠালো পদার্থ বের করে ঐ ডাঁটার গায়ে মাখাতে থাকে। ঘুরে ঘুরে মাখানো মাত্রই ঐ রস জমে সূতার আকার ধারণ করে এবং বোঁটার মত ঐ সূতার সঙ্গে শোঁয়াপোকাটার মাথা নীচের দিকে ঝুলে পড়ে। ঝোলবার সময় কেন্নোর মত মাথার দিক ঈষৎ বক্রভাবে থাকে। কয়েক ঘণ্টা এরূপ নিস্পন্দভাবে ঝুলে থাকবার পর হঠাৎ দেখা যায়—শোঁয়া-

পোকাটার শরীর যেন থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। ক্রমশঃ কাঁপুনি বাড়তে বাড়তে ঝাঁকুনিতে পরিণত হয়। এই সময়ে দেখা যায়, শোঁয়াপোকাটার মাথার দিকে পিঠের উপর খানিকটা স্থান হঠাৎ একটু স্ফীত হয়ে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গেই চামড়াটা ফেটে গেল এবং ভিতর থেকে উপরের দিক সরু এবং নীচের দিক মোটা এক অপূর্ব সবুজাভ পিণ্ডাকার পদার্থ বেরিয়ে আসতে লাগলো। তখনও শরীরের ঝাঁকুনি পূর্বমত চলছে। প্রায় দশ-পনেরো সেকেণ্ডের মধ্যেই দেখতে দেখতে উপরের চামড়াটা সম্পূর্ণ রূপে গুটিয়ে গিয়ে কালো একটু ঝুলের মত বোঁটার কাছে লেগে রইলো। সবুজ পিণ্ডাকার পদার্থটা সেই বোঁটায় ঝুলেই শরীর সংকুচিত করে নানাভাবে মোচড় খেতে লাগলো। প্রায় পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই সবুজ রঙের পিণ্ডটার আকার পরিবর্তিত হয়ে উপরের দিক মোটা ও নীচের দিক সরু হয়ে গেল। উপরের দিকে পাশাপাশিভাবে একটু স্ফীত স্থানের উপর উজ্জ্বল সারি সারি সোনালী রঙের ফোঁটা ফুটে উঠলো। পরে শরীরের নিম্নভাগেও ঐরূপ কয়েকটি সোনালী রঙের ফোঁটা আত্মপ্রকাশ করলে পাঁচ-সাত মিনিটের ভিতরেই এমন একটা অদ্ভুত রূপান্তর ঘটে গেল যে, দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে থাকতে হয়। তারপর সেই অবস্থায় সবুজ রঙের ঠিক ছোট্ট একটা আঙুর ফলের মত লতার গায়ে ঝুলতে থাকে। রং প্রথমে হালকা সবুজ, পরে গাঢ় সবুজ হয়ে যায়। সোনালী ফোঁটাগুলিতে আলো প্রতিফলিত হয়ে জ্বলজ্বল করতে থাকে। কিন্তু পাতার সবুজ রঙের সঙ্গে এদের গায়ের রঙের এমন অপূর্ব সাদৃশ্য যে, অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে অন্বেষণ না করলে সহসা কোন মতেই নজরে পড়ে না। পনেরো থেকে বিশ দিন পর্যন্ত নিশ্চেষ্টভাবে ঠিক কানের দুলের মত ঝুলে থাকে। এগুলিই প্রজাপতির গুঁটি বা পিউপা। বিভিন্ন জাতের প্রজাপতির গুঁটি বিভিন্ন আকার ও বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। কতই না তাদের রঙের বাহার, কতই না তাদের কারুকার্য! বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে ও গঠন-পারিপাট্যে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। কবির ভাষায় এগুলিকে সত্যিকার 'পরীর কানের দুল' বলতেই ইচ্ছা হয়।

দুধ-লতা প্রজাপতির গুটি বা পিউপার রং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গাঢ় সবুজ;

কিন্তু মাঝে মাঝে কতকগুলির রং একেবারে সাদা হয়ে থাকে। সোনালী ফোঁটাগুলি কিন্তু উভয়ের একই রকমের।

পনেরো-বিশ দিন পরে গুটির রং ক্রমশঃ পরিবর্তিত হতে থাকে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফিকে হয়ে যায়। তখন উপরের আবরণটা অনেক স্বচ্ছ হয়ে পড়ে। তখন তার মধ্য দিয়ে ভিতরের প্রজাপতিটিকে আবছা দেখতে পাওয়া যায়—যেন ডানা মুড়ে রয়েছে। দেখতে দেখতে গুটির মধ্যস্থল থেকে নীচের দিকের একাংশ ফেটে যায় এবং তার ভিতর দিয়ে প্রজাপতিটি আস্তে আস্তে মুখ বের করতে থাকে। দু-এক মিনিটের মধ্যেই ডানা বাইরে আসে, তারপর একেবারে প্রজাপতির সমস্ত শরীর বহির্গত হয়। খোলস ত্যাগ করে বাইরে আসবার সময় তার ডানা অতি ক্ষুদ্র অবস্থায় থাকে। লেজের দিকও সেইরূপ অস্বাভাবিক ক্ষুদ্র কিন্তু মোটা। বাইরে এসেই ক্ষুদ্রকায় প্রজাপতিটি তার পরিত্যক্ত খোলস আঁকড়ে বসে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের পশ্চাদ্ভাগ ও ডানাগুলি তরতর করে বাড়তে থাকে। এই সময়ে ডানাগুলি থাকে কোমল ও তকতকে। প্রায় পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই স্বাভাবিক প্রজাপতির অবস্থায় পরিণত হয়। বেকায়দায় পড়ে ডানাগুলি একটু এদিক-ওদিক বেঁকে গেলে আর সোজা হবার উপায় থাকে না। স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হবার পরেও প্রায় ঘণ্টাখানেকের উপর প্রজাপতিটি ডানা মুড়ে সেই পরিত্যক্ত খোলসটার উপরেই বসে থাকে। তারপর ডানা একবার প্রসারিত করে আবার গুটিয়ে নিয়ে পরখ করে দেখে ঠিক ওড়বার উপযুক্ত হয়েছে কিনা। তার কিছুক্ষণ পরেই উড়ে গিয়ে ফুলের মধু আহরণে প্রবৃত্ত হয়।

## শোঁয়াপোকার মৃত্যু অভিযান

লেমিংস্ নামক ইঁদুরের মত এক জাতীয় প্রাণী পাহাড়-পর্বতের আশে-পাশে দলবদ্ধভাবে বাস করে! এত দ্রুতগতিতে এদের বংশবৃদ্ধি ঘটতে থাকে যে, কিছুদিনের মধ্যেই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রীষ্মকালীন প্রখর রোদের তাপে ঘাসপাতা শুকিয়ে গেলে তাদের মধ্যে দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তখন হঠাৎ একদিন দেখা যায়, তারা যেন পরামর্শ করে—শীত নেই, রোদ নেই এবং খাদ্যের অভাব নেই—এমন এক অজানা কল্পিত সুখের রাজ্যের অভিমুখে ছুটতে থাকে। পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, শহর-বন্দর অতিক্রম করে লক্ষ লক্ষ, কোটি-কোটি লেমিংস্ দলে দলে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। শত-সহস্র বাধাবিঘ্ন, প্রাকৃতিক বিপ্লব, নানাবিধ শত্রুর আক্রমণ—কিছুই এদের অগ্রগতি প্রতিরোধ করতে পারে না। জীবন থাকতে এইরূপ অজানা কোনও সুখের রাজ্যে পৌঁছুতে না পারলেও সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে হতে অবশেষে সমুদ্রে এসে উপস্থিত হয়। সমুদ্রই হোক বা যা কিছুই হোক—কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই, অগ্রসর হতেই হবে। যতক্ষণ সমুদ্রের ঢেউ তাদের অতলে নিমজ্জিত না করে অথবা সামুদ্রিক হিংস্র প্রাণীর কুক্ষিগত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সাঁত্রে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। অদ্ভুত এদের সংস্কার। এই সংস্কারের দ্বারাই হয়তো প্রকৃতি প্রাণী-জগতের ভারসাম্য রক্ষা করছে।

ক্যারিবু নামক এক জাতীয় হরিণের মধ্যেও এই ধরণের অদ্ভুত সংস্কার

দেখা যায়। তাদের চারণভূমিতে কোনও প্রাকৃতিক উৎপাত অথবা খাদ্যাভাবের আশঙ্কা দেখা দিলেই হাজার হাজার হরিণ দলবদ্ধ হয়ে কোনও এক কল্পিত নন্দনকাননে উপনীত হবার জন্যে নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত সব রকম বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করে অগ্রসর হতে থাকে। কবে যে এদের যাত্রাপথ সমাপ্ত হবে তা জানে না—বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, অভিযান চলতে থাকে —এমনই দৃঢ় একটা সংস্কার।

শ্রেষ্ঠতম প্রাণীদের মধ্যেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়! মানুষ, পশু, পাখী প্রভৃতি প্রাণীদের মধ্যেও যাযাবর বৃত্তি অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায়। এমন কি, কোনও কোনও ক্ষেত্রে নিম্নশ্রেণীর কীট-পতঙ্গের মধ্যেও। কিন্তু কাল্পনিক সুখের আশায় (একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী ছাড়া) লেমিংসের মত মহাযাত্রার এরূপ দৃষ্টান্ত বোধ হয় উন্নত বা অবনত সকল শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যেই একান্ত বিরল। কিন্তু সম্প্রতি কীট-পতঙ্গ শ্রেণীর এক জাতীয় শোঁয়াপোকার লেমিংস্-এর মত মৃত্যু-অভিযান প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ ঘটেছিল। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে আমাদের দেশীয় জবা বা কাঁঠালী চাঁপা প্রভৃতি গাছের পাতার নীচের দিকে ঈষৎ সবুজাভ শাদা রঙের এক জাতীয় শোঁয়াপোকা দেখতে পাওয়া যায়। এরা মথ-জাতীয় এক প্রকার কালো রঙের প্রজাপতির বাচ্চা। পাতার গায়ে প্রজাপতি এক সঙ্গে ২০-২৫টা ডিম পেড়ে রেখে যায়। দশ-বারো দিন পরে ডিম ফুটে ছোট ছোট শোঁয়াপোকা বেরিয়ে এসে এক সঙ্গেই অবস্থান করে। এক-একটা গাছে এরূপ পাঁচ-সাতটা বা আরও বেশী বিভিন্ন দল দেখতে পাওয়া যায়। এরা দলবদ্ধ ভাবেই গাছের পাতা খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়—কখনও দল ছাড়া হয়ে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে না। খুব ছোট অবস্থায় যখন এক ডাল থেকে অন্য ডালে যাবার প্রয়োজন হয়, তখন মাকড়সার মত মুখ থেকে সূক্ষ্ম সুতা বের করে ঝুলে পড়ে অন্যত্র যাতায়াত করে—সকলেই এক সঙ্গে সুতা ছেড়ে কতকটা জালের মত যাতায়াতের রাস্তা সৃষ্টি করে বলে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় না, সহজেই অন্যত্র গিয়ে এক সঙ্গে জড়ো হতে পারে।

গাছপালা বিবর্জিত একটা পাথরের বেদির উপর কোনও কারণে ছোট্ট

একটা গাছসহ টব রাখা হয়েছিল। একদিন সকাল বেলায় দেখা গেল—সেই সিমেণ্টের মেঝের উপর দিয়ে দূর থেকে প্রায় দশ-বারটা শাদা রঙের শোঁয়াপোকা পিঁপড়ের মত সার বেঁধে অগ্রসর হচ্ছে। আশেপাশে গাছপালা নেই—এরা কোথা থেকে এলো? আর এদিকেই বা অগ্রসর হচ্ছে কেন? সেগুলিকে লক্ষ্য করে এরূপ ভাবছি, দেখতে দেখতে তারা এসে টবটার পাশে উপস্থিত হলো। কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়াবার পর লাইনটা যেন কতকটা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো—কেউ কেউ এদিক-ওদিক একটু ঘুরে, কেউ কেউ বা মাথা উঁচিয়ে কিছু যেন অনুভব করবার চেষ্টা করতে লাগলো। বোধ হয় ওরা টবের উপরের গাছটার গন্ধই পেয়েছিল। কারণ খানিকবাদে দেখা গেল, ওরা আবার পূর্বের মত লাইন করেই টবের গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো; টবের কানার প্রায় দেড় ইঞ্চি নীচে মাটির মধ্যে গাছটি জন্মেছিল। শোঁয়া-পোকাগুলি একে একে উপরে উঠেই টবের গোলাকার কানাটার উপর দিয়ে ঘুরতে লাগলো। কারণ গোলাকার রাস্তার আর শেষ হয় না। এদিকে পাতার গন্ধেও বুঝতে পেরেছে খাদ্যবস্তু অতি নিকটে; কারণ এরা গাছের পাতা খেয়েই জীবনধারণ করে। এদিকে রাস্তাও ফুরোয় না। গোলক-ধাঁধায় পড়ে একই রাস্তায় যে বার বার ঘুরে মরছে--সেটা বোঝবার মত বুদ্ধিও এদের নেই। প্রায় সমস্ত কানাটা জুড়েই এরা চলছিল। মাঝে একটু ফাঁকও নেই, যাতে অগ্রগামী পোকা একটু এদিক-ওদিক মাথা ঘুরিয়ে অবস্থা তদারক করতে পারে—কেবল একে অন্যকে অনুসরণ করে চলছে। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই—তাতে আবার অনাহার। একদিন একরাত্রি কেটে গেল—তখনও দেখলাম, সেই গতি অব্যাহত রয়েছে। এরূপ অবস্থায় পাঁচ দিন পাঁচ রাত কেটে গেল। পঞ্চম দিন বেলাশেষে অনাহারে ও অতিরিক্ত পরিশ্রমে দলের একটি শোঁয়াপোকা যেন অসাড় ভাবেই লাইন থেকে নীচে পড়ে গেল এবং কিছুক্ষণ বাদেই তার মৃত্যুর লক্ষণ দেখা গেল। ভাবলাম একটা পোকা মরে যাওয়ায় এদের লাইনের মধ্যে বেশ খানিকটা জায়গা ফাঁকা হবে এবং অগ্রগামী পোকাটা একটু ফাঁকা দেখে এদিক-ওদিক মাথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে টবের মাটির উপর দিয়ে গাছটার উপর উঠতে পারবে; কিন্তু

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একটা শোঁয়াপোকা পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও লাইনের মধ্যে একটুও ফাঁক দেখা গেল না—পূর্বে যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনই একে অপরকে স্পর্শ করে এগিয়ে চলেছে। লক্ষ্য করে দেখলাম ব্যাপার আর কিছুই নয়, মৃত শোঁয়াপোকাটা যখন দলে ছিল তখন ঠিকমত এদের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না—এরা নিজ নিজ শরীর কতকটা সংকুচিত করে চলছিল। ষষ্ঠ দিনে দেখা গেল আরও গোটা তিনেক শোঁয়াপোকা মরে পড়ে আছে তবুও তাদের লাইনের মধ্যে বড়-একটা ফাঁক দেখা গেল না—এরা শরীরটাকে অসম্ভব লম্বা করে হেঁটে চলছে। মনে হলো যেন এক-একটা শোঁয়াপোকা দৈর্ঘ্যে অন্ততঃ দেড় গুণ লম্বা হয়ে গেছে, সপ্তম দিনে আরও কয়েকটা মারা গেল—এবার যেন এদের গতিবেগ ক্রমশঃই মন্দীভূত হয়ে পড়ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পরেই যেন জোর করেই গতিবেগ বাড়িয়ে দিচ্ছিল। অনুসন্ধান করে দেখলাম, প্রায় দেড়-শ' হাত দূরে একটা ছোট্ট চাঁপা গাছ থেকে শুষ্ক ঘাস-পাতা, কাঁকর-পাথর অতিক্রম করে কল্পিত সুখের আশায় বরাবর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হবার সময় এরা দৈবক্রমে এই টবের গাছটার কাছে উপস্থিত হয়েছিল। কারণ চাঁপা গাছটার পাতা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল এবং আশেপাশে তাদের খাবার উপযুক্ত কোনও গাছও ছিল না। কিন্তু আশেপাশে না চেয়ে এদের অগ্রগতির এই দৃঢ় সংস্কারই এদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপর এই শোঁয়াপোকা নিয়ে পরীক্ষা সুরু করি—এরূপ একটা ঘটনা কি দৈবাৎ ঘটলো, না এদের স্বভাবই এরূপ? টবের কানায় কানায় জল ভর্তি করে এই জাতীয় এক দল শোঁয়াপোকাসহ একটি জবা গাছ পুঁতে দিলাম। পাতা খেয়ে নিঃশেষ করবার পর এরাও একদিন নতুন খাদ্যপূর্ণ স্থানের উদ্দেশে অভিযান সুরু করলো। গাছটার গা বেয়ে নীচে নেমেই দেখে জল, কিন্তু তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই—একটা শুঁয়া-পোকা জলের উপর নেমে শরীরটাকে নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একটু অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার পিছনেরটাও জলে নেমে পড়লো, এই রূপে একটার পর একটা করে ক্রমে ক্রমে সবগুলিই জলে নেমে ইতস্ততঃ ভেসে ভেসে কিছুক্ষণের মধ্যেই অপর পাড়ে উঠে টবের কানার চতুর্দিকে

চক্রাকারে ঘুরতে সুরু করে দিল। যাবৎ মৃত্যু এসে তাদের না থামাবে তাবৎ অহোরাত্র এই চক্রাকার পরিভ্রমণ চলতেই থাকবে। আরও আশ্চর্যের বিষয়, এরা যখন এক ইঞ্চি থেকে প্রায় দেড় ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়, তখনই নতুন স্থানের সন্ধানে এদের এইরূপ অভিযান চালাতে দেখা যায়। পূর্ণ বয়সে এরা তিন ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয় এবং গায়ের রং কালো হয়ে যায়।

## মথ প্রজাপতি ও রেশম কীট

কীট-পতঙ্গের মধ্যে প্রজাপতির মত সুদৃশ্য পতঙ্গ কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। শরীরের অনুপাতে প্রজাপতির ডানা অসম্ভব বড় হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন জাতীয় প্রজাপতির ডানা বিভিন্ন রকমের আকৃতিবিশিষ্ট। ডানার মনোরম বর্ণবৈচিত্র্যে সহজেই এদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট-বড় বিভিন্ন জাতীয় অসংখ্য রকমারি প্রজাপতি দেখা যায়। দিবাচর ও নিশাচর হিসাবে প্রজাপতিকে মোটামুটি দু-ভাগে ভাগ করা যায়। সাধারণতঃ দিবাচর প্রজাপতিই আমাদের বেশী নজরে পড়ে। উজ্জ্বল দিবালোকে এরা ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়। দিনের আলো নিষ্প্রভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা লতাপাতা বা ঝোপঝাড়ের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। নিশাচর প্রজাপতিরা কিন্তু সারাদিন আনাচে-কানাচে চুপ করে বসে থাকবার পর রাতের অন্ধকারে আহারান্বেষণে বহির্গত হয়। এদের ডানাগুলি দিবাচর প্রজাপতির মত হাল্‌কা নয় এবং ডানার বর্ণবৈচিত্র্যও পৃথক রকমের। বিশ্রাম করবার সময় দিবাচর প্রজাপতিরা পিঠের উপর দিকে ডানা মুড়ে বসে; কিন্তু নিশাচর প্রজাপতিরা ডানা প্রসারিত করেই বিশ্রাম করে। তাছাড়া এদের মস্তকের শুঁড় দুটি কতকটা পালকের আকৃতিবিশিষ্ট; কিন্তু দিবাচর প্রজপতির শুঁড় দুটি মসৃণ এবং প্রান্তভাগ বর্তুলাকৃতির। নিশাচর প্রজাপতিরা মথ নামে পরিচিত। এদের বাচ্চাগুলিই রেশম-সূত্র প্রস্তুত করে থাকে।

যৌন-মিলনের পর স্ত্রী-প্রজাপতি গাছের পাতার উপর খানিকটা স্থান

জুড়ে পর পর ডিম পেড়ে যায়। ডিমগুলি প্রায় গোলাকার ; কোনও কোনও মথ ও প্রজাপতির ডিমের গায়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে সুদৃশ্য কারুকার্য দৃষ্টিগোচর হয়। অধিকাংশ প্রজাপতিই ঘনসন্নিবিষ্টভাবে ডিমগুলিকে সাজিয়ে রাখে। আবার কেউ কেউ পৃথক পৃথক পাতার উপর এক-একটি করে ডিম পাড়ে। অল্প কয়েকদিন পরেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে আসে। অধিকাংশ প্রজাপতির বাচ্চার গায়েই বিষাক্ত শোঁয়া থাকে। আবার অনেকের শরীর মসৃণ। এই বাচ্চাগুলিই ক্যাটারপিলার বা শোঁয়াপোকা নামে পরিচিত। ডিম থেকে বাইরে এসেই বাচ্চাগুলি পাতার সবুজাংশ কুরে কুরে খেতে সুরু করে। খাওয়া হলো বাচ্চাগুলির প্রধান কাজ। তিন-চারদিন অনবরত আহারকার্য চালাবার পর কিছুকাল নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থেকেই প্রথমবার খোলস পরিত্যাগ করে। তার কিছুকাল বাদে আবার খাওয়া সুরু করে। এইরূপে সাধারণতঃ চারবার খোলস বদলাবার পর পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়। পরিণত অবস্থায় শোঁয়াপোকা আড়াই ইঞ্চি, তিন ইঞ্চি বা ততোধিক লম্বা হয়ে থাকে। এই অবস্থায় উপনীত হলেই শোঁয়াপোকা খাওয়া বন্ধ করে লতাপাতার কোনও সুবিধাজনক স্থান নির্বাচন করে সুতার সাহায্যে একটি শক্ত বোঁটা প্রস্তুত করে এবং সেই বোঁটা থেকে শরীরটাকে বঁড়শীর মত বাঁকা করে ঝুলতে থাকে। নিশ্চলভাবে এই অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা ঝুলে থাকবার পর তার পিঠের দিকের চামড়া লম্বালম্বিভাবে খানিকটা ফেটে যায়। ভিতর থেকে লাল্‌চে আভাযুক্ত একটা লম্বাটে পদার্থ তখন মোচড় খেতে খেতে বেরিয়ে আসে। সর্বশেষে উপরের চামড়াটা একটুক্রা কালো ঝুলের মত খসে নীচে পড়ে যায়। লাল্‌চে আভাযুক্ত পদার্থটা তখন বোঁটার সঙ্গে ঝুলতে থাকে। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই লাল্‌চে পদার্থটা ধীরে ধীরে একটা আস্ত চীনাবাদামের আকৃতি পরিগ্রহ করে। অল্প সময়ের মধ্যেই সেই পদার্থটা ক্রমশঃ শক্ত হয়ে উজ্জ্বল কাচখণ্ডের মত ঝকমক করতে থাকে। এই হলো প্রজাপতির গুটি বা পুত্তলী অবস্থা। বিভিন্ন জাতীয় প্রজাপতির গুটি—সোনালী, রূপালী, লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের উজ্জ্বল কাচখণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এক-একটি গাছে হীরা-মাণিকের দুলের মত এরূপ অনেক পুত্তলী

ঝুলতে দেখা যায়। দশ-পনেরো দিন পরে এই গুটির পিঠ চিরে ভিতর থেকে প্রজাপতি বেরিয়ে আসে। পুত্তলী থেকে বের হবার পর এদের ডানাগুলি থাকে খুবই ছোট এবং পাত্‌লা চামড়ার মত তকতকে। কিন্তু দেখতে দেখতে ডানাগুলি তরতর করে বেড়ে যায় এবং বর্ণবৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর ডানাগুলি শক্ত ও হাল্‌কা হলে প্রজাপতি আকাশে উড়ে যায়। এই হলো মোটামুটি দিবাচর প্রজাপতির জন্মের ইতিহাস।

মথ জাতীয় নিশাচর প্রজাপতির জন্মের ইতিহাস অনেকাংশে এক রকম হলেও কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। যৌন-মিলনের পর মথও এক স্থানে অনেকগুলি করে ডিম পাড়ে। এদেরও শোঁয়াযুক্ত ও শোঁয়াবিহীন দুই রকমেরই কাটারপিলার দেখতে পাওয়া যায়। প্রজাপতির ক্যাটার-পিলারগুলি' গুটি বাঁধবার সময় বোঁটা প্রস্তুত করতে অতি সামান্য সূতা বোনে, কিন্তু মথের বাচ্চাগুলি গুটি বাঁধবার সময় মুখ থেকে অজস্র রেশম-সূত্র বের করে ডিম্বাকার আবরণ প্রস্তুত করে। যাদের গায়ে শোঁয়া আছে, তারা আবার শোঁয়াগুলি ছিঁড়ে সূতার সঙ্গে মিশিয়ে তারই সাহায্যে বহিরা-বরণ প্রস্তুত করে। সূত্রনির্মিত আবরণীর অভ্যন্তরে কিছুকাল নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করবার পর ক্যাটারপিলার পূর্বোক্ত উপায়ে দেহের চামড়াটি পরিত্যাগ করে জলপাইয়ের আঁঠির মত আকৃতি ধারণ করে। এই অবস্থায় কেউ এক মাস, কেউ দুই মাস, কেউ কেউ বা নয়-দশ মাস কাটাবার পর মথের আকৃতি পরিগ্রহ করে গুটি কেটে বের হয়ে আসে। অনেক জাতীয় স্ত্রী-মথ গুটি কেটে বের হবার পর সেই স্থানেই অবস্থান করে। ডানা থাকলেও তারা উড়তে অক্ষম। গুটি থেকে বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই পুং-মথ তার নিকট উড়ে আসে। সময় সময় পাঁচ-সাতটি পুং-মথকে স্ত্রী-মথের নিকটে অবস্থান করতে দেখা যায়। যৌন-মিলনের কিছুকাল বাদেই স্ত্রী-মথ এক সঙ্গে অনেকগুলি ডিম পেড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মথ জাতীয় প্রজাপতির গুটির আবরণীর সূত্র থেকেই বিবিধ প্রকারের রেশমী বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়ে থাকে।

প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ কেবল বন্য জন্তুজানোয়ারকে বশীভূত করেই ক্ষান্ত থাকে নি, তারা কীট-পতঙ্গের মধ্য থেকে মধুর জন্যে মৌমাছি এবং রেশমের জন্যে রেশম-কীট বা মথ-জাতীয় প্রজাপতির বাচ্চাগুলিকে পোষা প্রাণীতে পরিণত করেছে। প্রতি বছর এই রেশম-কীট থেকে কি বিপুল পরিমাণ রেশন উৎপাদিত হয়ে থাকে, তার সঠিক হিসেব নির্ণয় করা দুষ্কর। যতদূর হিসেব পাওয়া যায়, তাতে একমাত্র চীন দেশের অভ্যন্তর ভাগ থেকেই বছরে ১১২৫০০০ মণেরও বেশী রেশম উৎপাদিত হয়ে থাকে। আমাদের দেশে বহুকাল থেকেই রেশম-কীট প্রতিপালনের রীতি প্রচলিত আছে। এই কীট প্রতিপালনের দেশীয় পদ্ধতির বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করছি।

বিভিন্ন জাতীয় রেশম-কীটের গুটি বা কোয়া থেকে সূতা সংগ্রহ করে আমাদের দেশে গরদ, তসর, এণ্ডি, বাফ্‌তা প্রভৃতি কয়েক জাতীয় বস্ত্র প্রস্তুত হয়। যে জাতীয় রেশম-কীট থেকে গরদের কাপড় প্রস্তুতহয়, তারা পলু পোকা বা তুঁতপোকা নামে পরিচিত। এরা বিভিন্ন জাতীয় মথ নামক প্রজাপতির বাচ্চা বা ক্যাটারপিলার। আমাদের দেশে বড়-পলু, ছোট-পলু, নিস্তারী পলু ও চীনা পলু নামক কয়েক জাতীয় তুঁতপোকা প্রতিপালিত হয়ে থাকে। এদের মধ্যে বড়-পলু ও বিলিতী-পলুই সর্বোৎকৃষ্ট। এদের কোয়াগুলি খুব বড় হয় এবং শুভ্র বর্ণের প্রচুর পরিমাণ রেশম উৎপাদন করে। আমাদের দেশে বিলিতী-পলু প্রতিপালিত হলেও তার পরিমাণ যথেষ্ট নয়। বড়-পলু ও বিলিতী-পলু প্রতিপালনের প্রধান অসুবিধা এই যে, এদের ডিম থেকে বাচ্চা বের হতে প্রায় দশ মাস সময় লাগে। বড়-পলু ও বিলিতী-পলু খুব সম্ভব একই জাতীয় পোকা ; কিন্তু এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। হয়তো বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে বংশানুক্রমে এই পার্থক্য আত্মপ্রকাশ করেছে। যাহোক, বড়-পলুর ডিম মাস দশেক হাঁড়ির ভিতর রাখবার পর মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর দিনে হাঁড়ির ঢাকনা খুলে দেওয়া হয় এবং কয়েক দিনের মধ্যেই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। এই দশ মাস ডিম সমেত হাঁড়িটাকে ঠাণ্ডা অন্ধকার ঘরে শিকেয় ঝুলিয়ে রাখা হয়। আলোকিত বা উষ্ণস্থানে রাখলে ডিম ভাল করে ফোটে না। খুব ঠাণ্ডা জায়গায় না রাখলে বিলিতী-

পলুর ডিম মোটেই ফোটে না। বিলিতী-পলুর ডিম বরফের মত ঠাণ্ডা স্থানে রাখতে হয়। ফোটবার পূর্বে দু-তিন সপ্তাহ ৩২ থেকে ৩৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট উত্তাপে রাখা দরকার। তারপর উত্তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করলে বাচ্চা বের হতে থাকে। ৭৪ বা ৭৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট উত্তাপে এই পলু-পোকা পুষতে হয়।

ছোট-পলু, নিস্তারী-পলু ও চীনা-পলুর ডিম গ্রীষ্মকালে আট-দশ দিনে, বর্ষাকালে দশ-পনেরো দিনে এবং শীতকালে পঁচিশ-ত্রিশ দিনে ফুটে থাকে। ডিম থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেঁায়াপোকা বা ক্যাটারপিলার বের হয়েই তুঁত পাতা খেতে আরম্ভ করে। ডালা বা কাগজের উপর পোকাগুলি রেখে তার উপর কচি কচি তুঁত পাতা কুচি কুচি করে ছড়িয়ে দিলেই পোকাগুলি উপরে উঠে পাতা খেতে থাকে। ভুক্তাবশিষ্ট পাতা ও নাদি পরিষ্কার করবার জন্যে তুঁত-পোকাগুলির উপর এক খণ্ড সরু জাল বিছিয়ে তার উপর নতুন পাতা কুচিয়ে দিতে হয়। জালের ফাঁক দিয়ে নীচের পোকাগুলি উপরের পাতায় উঠে আসে, তখন জাল সমেত পোকাগুলিকে আর একখানি ডালায় রেখে পূর্বের ডালাটি পরিষ্কার করে ফেলতে পারা যায়। এই উপায়ে সর্বদাই পোকাগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। প্রথম অবস্থায় পোকাগুলিকে প্রত্যহ পাঁচ-ছয় বার তাজা পাতা দিতে হয়। চার-পাঁচ দিন পরেই পোকাগুলি নিশ্চলভাবে অবস্থান করে এবং কিছুকাল বাদেই প্রথমবার খোলস পরিত্যাগ করে। এই সময়ে ওরা কিছু খায় না। এই সময় অন্ততঃ একদিন পাতা দেওয়া বন্ধ রাখতে হয়। পোকাগুলি নড়াচড়া আরম্ভ করলেই পুনরায় পাতা দেওয়া দরকার। এইরূপে এরা প্রায় চারবার খোলস ছাড়ে এবং তাদের দেহের আকার ক্রমশঃ বেড়ে যায়। এরা গ্রীষ্মকালে তিন-চারদিন অন্তর এবং শীতকালে পাঁচ-ছয় দিন অন্তর খোলস পরিত্যাগ করে। তৃতীয় বার খোলস ছাড়বার পর পাতা আর কুচিয়ে দিতে হয় না—গোটা পাতা দিলেই চলে। চতুর্থ বার খোলস ছাড়বার পর পোকাগুলি শন্ শন্ শব্দে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পাতা খেয়ে শেষ করে। তৃতীয়বার খোলস পরিত্যাগের পরই পাতার পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া উচিত। কারণ এই সময়

বেশী খেলে প্রায়ই তারা ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। চতুর্থবার খোলস ছাড়বার পর পোকাগুলি গ্রীষ্মকালে ছয়-সাত দিন ও শীতকালে দশ-বার দিন আহার করবার পর খাওয়া বন্ধ করে গুটি বা কোয়া প্রস্তুত করে। কোয়া প্রস্তুত করবার সময় হলেই পোকাগুলি ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায় এবং মুখ থেকে অল্প অল্প রেশম বের করতে থাকে। এরূপ অবস্থা দেখলেই সেগুলিকে বেছে নিয়ে শুষ্ক ডালপালা বা বাঁশের চেটাইয়ের দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার সচ্ছিদ্র পাত্রের মধ্যে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে দু-দিনের মধ্যেই গুটি বা কোয়া প্রস্তুত করে ফেলে।

পলু পোকাগুলি যাতে ঘনসন্নিবিষ্ট ভাবে না থাকে, তার জন্যে বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। প্রথম অবস্থায় ডালার উপর পলুগুলিকে পাত্‌লা ভাবে রাখতে হয়। বড় হলে একটু ঘন ভাবে রাখলেও তত ক্ষতি হয় না। প্রথমাবধি অযত্ন করলে অথবা অপরিচ্ছন্নভাবে রাখলে বড় হলেই তারা ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পলু যে ঘরে রক্ষিত হয়, তার হাওয়া খুব গরম বা ঠাণ্ডা হওয়া খুবই মারাত্মক। ঘরে হাওয়া প্রবেশ করবার ব্যবস্থা করে যাতে নাতিশীতোষ্ণ অবস্থায় থাকতে পারে তাই করা উচিত। কিন্তু দেখতে হবে—যেন পলুর গায়ে টানা হাওয়া লাগতে না পারে। কারণ টানা বাতাসে পলু রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। গুমোট হলে পাখার হাওয়া করে ঘর ঠাণ্ডা রাখতে হয়, নচেৎ সল্‌ফা বা হাঁসা নামক রোগে আক্রান্ত হয়ে পলু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রোগাক্রান্ত মথের ডিমে মাতৃরোগ সংক্রামিত হয়ে থাকে। তার ফলে যত্ন করলেও পলু মরে যায়। এজন্যে ডিম পাড়বার পর প্রত্যেকটি স্ত্রী-মথের শরীর থেকে এক ফোঁটা রস বের করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলে যদি কারও রসে দানার মত কোনও পদার্থ দেখা যায়, তবে সেই মথের ডিম নষ্ট করে ফেলাই বিধেয়। তাছাড়া তুঁতের জলে ঘর, ডালা ও অন্যান্য উপকরণ ভাল করে ধুয়ে নিয়ে তাতে সুস্থ পলু-পোকা প্রতিপালন করা উচিত। তুঁতের জলে ধোবার পরও ঘরের ভিতর গন্ধক পুড়িয়ে স্থানটিকে যতদূর সম্ভব দূষিত বীজাণুমুক্ত করে লওয়া কর্তব্য। কেউ কেউ কাগজের উপর ডিম পাড়িয়ে ডিম সমেত কাগজখানিকে তুঁতের

জলে ডুবিয়ে পরে ঠাণ্ডা জায়গায় ঝুলিয়ে শুকিয়ে নেয়। এতে ডিমগুলি বীজাণুমুক্ত হতে পারে। এতদ্ব্যতীত এক রকম বড় বড় মাছি পলুর গন্ধ পেলেই তাদের পিঠের উপর ডিম পেড়ে যায়। এই ডিম ফুটে কৃমি বের হয়। তারা পলুর শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে রস-রক্ত চুষে খেয়ে সেগুলিকে মেরে ফেলে। পলু-পোকা প্রতিপালন করতে হলে এই মাছি সম্বন্ধে সর্বদাই সতর্ক থাকা প্রয়োজন, নচেৎ পলুর মড়ক নিবারণ অসম্ভব।

পলু-পোকার খাদ্য হিসেবে বঙ্গ দেশে তুঁত গাছের চাষ করা হয়ে থাকে। এই তুঁত গাছ সাধারণতঃ পেয়ারা গাছের মত বড় হয়। সে জন্য জমিতে তুঁতের কলম লাগাবার পর গাছগুলি বড় হলেই ছোট করে কেটে দেওয়া হয়। বছরে এরূপ তিন-চারবার কেটে দিলে গাছগুলি বেশী বড় হতে পারে না। উৎকৃষ্ট পাতা জন্মাবার জন্যে তুঁত চাষে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, অন্যথায় যে কোনও রকম তুঁত পাতা খেয়েই পলু উৎকৃষ্ট কোয়া প্রস্তুত করতে পারে না।

তসর-কীটেরা কিন্তু রেশম-কীটের মত তুঁত পাতা খায় না। এরা শাল, অর্জুন, মহুয়া, বাদাম প্রভৃতি গাছের পাতা খেয়ে গাছের উপরেই কোয়া প্রস্তুত করে। রেশম-কীটের মত তসর-কীটকে আগাগোড়া ঘরেব মধ্যে পালন করা যায় না। তসর-মথেরা ঘরের মধ্যেই ডিম পাড়ে, কিন্তু ডিম ফোটবার পুর্বেই ছোট ছোট ঠোঙার মধ্যে রেখে সেগুলিকে গাছের স্থানে স্থানে ঝুলিয়ে দিতে হয়। কীট বের হবার পর ইচ্ছামত গাছের পাতা খেয়ে বড় হয় এবং গ্রীষ্মকালে এক মাস এবং শীতকালে দুই মাস বা আড়াই মাস পরে গাছের ডালেই কোয়া প্রস্তুত করে। বর্ষাকালই তসর-কীট প্রতিপালনের প্রশস্ত সময়। গ্রীষ্ম বা শীতকালে হঠাৎ কোনও দিন বেশী বৃষ্টি হলেই অনেক পোকা 'রসা' হয়ে মরে যায়। এণ্ডি-কীট পালন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য, স্যাঁতসেঁতে বা আর্দ্র স্থানে এই কীট পালন করা দরকার। আসাম প্রদেশে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হয় বলে সব ঋতুতেই সেখানে এণ্ডি পালন করা চলে। এণ্ডি-কীটেরা ভেরেণ্ডা পাতা খেয়ে বড় হয়ে থাকে এবং

রেশম-কীটের মতই সেগুলিকে প্রতিপালন করতে হয়। আট-দশ দিনের মধ্যেই ডিম ফুটে এণ্ডি-পোকা বহির্গত হয়।

কোয়া প্রস্তুত হয়ে গেলে সেগুলি সংগ্রহ করে গরম জলের ভাপে ভিতরের পুত্তলীগুলিকে মেরে ফেলতে হয়। পরে ক্ষারের জলে সিদ্ধ করে সূতা বের করে নিতে হয়। রেশমের কোয়ায় ভাপ দেবার পর জলে সিদ্ধ করে যেরূপ সহজে সূতা বের করতে পারা যায়, তসরের সূতা বের করা তত সহজ নয়। সোডা, পটাশ, সাজিমাটি, কলাগাছের ছাই প্রভৃতির সঙ্গে তসর-কোয়া সিদ্ধ করবার পর তার সূতা বের হয়। জলের সঙ্গে পেঁপের রস মিশিয়ে তাতে তসরের কোয়া চব্বিশ ঘণ্টা কাল ভিজিয়ে রাখলেও সহজে সূতা বের হতে পারে। সেদ্ধ করবার পর কোয়াগুলি পরিষ্কার করে ঈষৎ ভিজা থাকতেই লাটাইয়ে জড়িয়ে সূতা বের করতে হয়। এণ্ডি কোয়া থেকে এক খাই সূতা বের করা যায় না। এণ্ডি প্রজাপতিগুলি কোয়া কেটে বের হয়ে গেলে সেই কাঁতত কোয়া থেকে কার্পাস সূতার মত টাকু বা চরখার সাহায্যে সূতা কাটতে হয়। এই জন্যেই এণ্ডির কাপড় অন্যান্য রেশমী কাপড়ের চেয়ে অধিকতর স্থায়ী।

## নিশাচর প্রজাপতি

শিশুসুলভ খেয়ালের বশে কিছু দিন মাটির খুরি চাপা দিয়ে রাখবার পর একটা শোঁয়াপোকা ফড়িং হয়ে গেছে, সমবয়সীর এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা শুনে বিস্ময় বোধ করলেও ঘটনাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি নি। অলক্ষ্যে দৈবাৎ একটা ফড়িং ঢাকনার নীচে চাপা পড়া আশ্চর্য নয় এবং কোনও গতিকে হয়তো শোঁয়াপোকাটা বের হয়ে গিয়েছিল। কোনও ঘটনা বোধগম্য না হলে এরূপ সিদ্ধান্ত করা স্বাভাবিক। তথাপি প্রত্যক্ষদর্শীর দৃঢ় উক্তিও একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। কিন্তু কেমন করে এরূপ একটা ঘটনা সম্ভব হতে পারে? কারণ ফড়িঙের সঙ্গে শোঁয়াপোকার কোনও সাদৃশ্য বা সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না। পরীক্ষার সাহায্যে সত্য-মিথ্যা নিরূপণ করা ব্যতীত এ সম্বন্ধে কৌতূহল নিবৃত্তির অন্য কোনও উপায় ছিল না, অথচ শোঁয়াপোকা সম্বন্ধে একটা ভয়মিশ্রিত ঘৃণা এই সাধারণ পরীক্ষা সম্পাদন করবার পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। একবার গাছে চড়তে গিয়ে হাতের নীচে কি যেন নরম নরম বোধ হল। চেয়ে দেখি—ভীষণ দৃশ্য। প্রায় দু-তিন ইঞ্চি লম্বা অসংখ্য শোঁয়াপোকা গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি করে গাছের গুঁড়ির খানিকটা অংশ ঘিরে রয়েছে। গায়ের রং ঠিক গাছের বাকলের রঙের মত—চট করে কিছুই বোঝবার উপায় নেই। হাত লাগা মাত্রই সাপের মত ফণা তুলে এক প্রকার অস্ফুট শব্দ করতে লাগলো। এই বিষাক্ত প্রাণীগুলি পূর্ব বঙ্গে 'ছেঙ্গা-বিছা' নামে পরিচিত।

এদের শোঁয়াগুলি হাতে বিঁধে কয়েক দিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। এই ঘটনা থেকেই শোঁয়াপোকা সম্বন্ধে একটা বিজাতীয় ঘৃণা ও ভয় যেন বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। কাজেই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ পরীক্ষা করাও হয়ে ওঠে নি। অবশেষে দৈবাৎ একদিন প্রায় আড়াই ইঞ্চি লম্বা কালো রঙের একটা শোঁয়াপোকা নজরে পড়লো। সেটাকে ছোট একটা বাটি চাপা দিয়ে রেখে দিলাম। দিন তিনেক পরে বাটি তুলে দেখি—যেমন শোঁয়াপোকা তেমনই রয়েছে। পাত্রটার একপাশে সে গুটিসুটি হয়ে বসেছিল। ফড়িং হবার কাহিনী সম্বন্ধে অবিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে উঠল। আরও পাঁচ-সাত দিন কাটবার পর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম। প্রায় মাস খানেক পর হঠাৎ একদিন বাটিটা নজরে পড়ায় তুলে দেখি—অবাক কাণ্ড! শোঁয়াপোকার চিহ্নও নেই। ডানার উপর লাল ও হলদে রঙের ডোরাকাটা প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা ধূসর বর্ণের প্রজাপতির মত একটা পতঙ্গ চুপ করে বসে আছে। ধরবার চেষ্টা করতেই উড়ে গেল। বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। এমন একটা বিদঘুটে শোঁয়াপোকা কেমন করে একটা পতঙ্গে রূপান্তরিত হলো কিছুই স্থির করতে পারলাম না, তবে এটুকু বোঝলাম যে, শোঁয়াপোকার এরূপ রূপান্তর পরিগ্রহণ অসম্ভব নয়। তবে শোঁয়াপোকা ফড়িং হয় না, প্রজাপতির মত পতঙ্গের আকৃতি ধারণ করে!

এ ঘটনার অনেক দিন পরে মালদহ জেলার একটি গ্রামের ভিতর দিয়ে যাবার সময় একটা গাছের পাতার গায়ে আমড়ার আঁঠির মত একট্টা গুটি দেখতে পেয়ে সেটাকে একটা বোতলে ভরে রেখেছিলাম। সকালে উঠে দেখি, ডানায় বিচিত্র ডোরাকাটা প্রকাণ্ড একটা প্রজাপতি বোতলটার মধ্যে ঝটপট করছে। আমরা সাধারণতঃ যেরূপ প্রজাপতি দেখতে পাই, এর চেহারা মোটেই সেরূপ নয়। ডানাগুলি অপেক্ষাকৃত মোটা ও ভারী। ডানার একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা। বোতলের অপ্রশস্ত স্থানের মধ্যে ডানা দুটি মুড়ে জড়িয়ে গিয়েছিল। আকৃতি বড়ই হোক কি ছোটই হোক, তাতে বিস্মিত হবার তেমন কিছু নেই; কিন্তু

প্রকার শ্বেত বর্ণের প্রজাপতি ঠিক পাখীর বিষ্ঠার অনুকরণ করে থাকে। এই প্রজাপতিদের আকৃতি-প্রকৃতি অতি অদ্ভুত—দেখতে ঠিক পাতলা টিস্যু কাগজের মত। ডানার পৃষ্ঠদেশে দুই প্রান্তে দুটি কালো ফোঁটা আছে। মনে হয় যেন দুটি চোখ। এরা ডানা মেলে পাতার গায়ের সঙ্গে এমনভাবে লেগে থাকে যে, সুনির্দিষ্ট আকৃতি সত্ত্বেও বিশেষ মনোযোগ দিয়ে না দেখলে, পাতার উপর চুণের দাগের মত মনে ময়। ক্রমবিবর্তনের ফলেই হয়তো প্রজাপতির এই প্রকার অদ্ভুত আকৃতি-প্রকৃতি অভিব্যক্ত হয়েছে। হয়তো বললাম এজন্যে যে, পর্যবেক্ষণের ফলে দেখেছি—কোন কোন জাতের মাকড়সারা পিপীলিকার হুবহু অনুকরণ করেও শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না। আশেপাশে বিভিন্ন জাতের মাকড়সা থাকা সত্ত্বেও কোনও কোনও কুমুরে-পোকা, বেছে বেছে ঠিক একই রকমের বহুসংখ্যক পিঁপড়ে-মাকড়সা শিকার করে তাদের গর্তের মধ্যে রেখে দেয়। এথেকেই সন্দেহ জন্মে, প্রজাপতির অনুকরণপ্রিয়তাও সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষামূলক কিনা।

পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাণীর মধ্যেই নির্বিঘ্নে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করবার জন্যে এবং সেই সময়ে আত্মরক্ষার নিমিত্ত বিবিধ প্রকারের সুরক্ষিত বাসস্থান নির্মাণ করে তাতে আত্মগোপন করবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দেখা যায়। যে সকল প্রাণী বাসস্থান নির্মাণ করে না, তারাও নির্বিঘ্নে বিশ্রাম উপভোগ করবার জন্যে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে থাকে। আমাদের আশেপাশে অহরহ যে সকল প্রজাপতি দেখতে পাই, তারা কেউ বাসা বাঁধে না; কিন্তু নিরুপদ্রবে অবসর কাল কাটাবার জন্যে আত্মগোপনোপোযোগী বিশ্রামস্থল বেছে নেয়। এর ফলে অপেক্ষাকৃত অনাবৃত স্থানে থেকে এরা মানুষ বা অন্যান্য শত্রুর দৃষ্টি এড়াতে সক্ষম হয়। এস্থলে আমাদের দেশের কয়েক প্রকার সাধারণ প্রজাপতির বিশ্রামকালীন আত্মগোপন কৌশলের বিষয় আলোচনা করছি।

আমাদের দেশে সচরাচর এক প্রকার সাদা প্রজাপতি দেখতে পাওয়া যায়। এদের ডানা প্রসারিত করলে একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত

পাশাপাশিভাবে দুই ইঞ্চিরও কিছু বেশী লম্বা হয়। ডানার উপরিভাগ দুধের মত সাদা; কিন্তু উভয় ডানার সংযোগস্থল থেকে কতকটা অংশ ঈষৎ হল্‌দে। ডানার নিম্নভাগ নীলাভ ফিকে সবুজ। উড়বার সময় সাদা দিকটাই স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। উড়তে উড়তে কখনও অল্প সময়ের জন্য বিশ্রামের প্রয়োজন হলে এরা সাধারণতঃ যমজপত্রসমন্বিত গাছের পাতার উপর আধাআধি ডানা মেলে বসে। পাতার রঙের সঙ্গে এদের গায়ের রং ও আকৃতি এমনভাবে মিলে যায় যে, অতি নিকটে থেকেও তাদের গাছের পাতা বলে ভুল হয়। কিন্তু ভয় পেলে অথবা রাত্রিবাস করবার সময় উড়ে গিয়ে গাছের উঁচু ডালের পাতার উপর ডানা মুড়ে বসে। তখন পাতার রঙের সঙ্গে এমনভাবে মিলে থাকে যে, খুঁজে বের করা যায় না।

ডানার একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত পাশাপাশিভাবে প্রায় তিন ইঞ্চি, সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা ফিকে হল্‌দে রঙের এক প্রকার প্রজাপতিকে সর্বদাই ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াতে দেখা যায়। এদের ডানার উপর ও নীচে বড় বড় কতকগুলি্ কালো ফোঁটা আছে। ডানার এই বর্ণবৈচিত্র্যে বহুদূর থেকে এদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বিশ্রাম করবার সময় এরা পত্রবিরল লতার ঝোপের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। ডানা গুটিয়ে এই জাতীয় লতার মধ্যে অবস্থান কালে লতার আঁকাবাঁকা ডাঁটাগুলির সঙ্গে মিলে গিয়ে প্রজাপতির গায়ের রেখাগুলি এমন একটা দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টি করে যে, তার মধ্যে যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা থাক্য সত্ত্বেও প্রজাপতি লুকিয়ে আছে বলে বুঝতে পারা যায় না।

এদেশে বনে-জঙ্গলে 'লৌ-ফোঁট' বা রক্ত-তিলক নামে ঘোর কালো রঙের একপ্রকার বড় বড় প্রজাপতি দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রজাপতির নিম্ন ডানার প্রান্তভাগে অর্ধচন্দ্রাকার কতকগুলি রক্ত বর্ণের ফোঁটা সারবন্দী-ভাবে অঙ্কিত থাকে, নিম্নভাগের ডানার মধ্যস্থলে পাশাপাশিভাবে কয়েকটি সাদা দাগ আছে। দিনের বেলায় ক্ষণিক বিশ্রাম করবার সময় এবং রাত্রি-কালে এই প্রজাপতিরা অন্ধকার ঝোপের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ঝোপের

দেখতে দেখতে সেই পুত্তলী পরিবর্তিত হয়ে একটি সুনির্দিষ্ট আকৃতি ধারণ করে এবং উপরের আবরণে উজ্জ্বল বর্ণ আত্মপ্রকাশ করে। পুত্তলীটি সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টভাবে দুলের মত ঝুলে থাকে। দশ-বারো দিন পরে হঠাৎ পুত্তলীর পিঠের দিক চিড় খেয়ে ফেটে যায় এবং ধীরে ধীরে সেই খোলস থেকে দু-তিন মিনিট সময়ের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি বেরিয়ে আসে। বাইরে আসবার সময় প্রজাপতিটা তার স্বাভাবিক অবস্থা থেকে আকারে অনেক ছোট থাকে। ডানাগুলিও থাকে খুবই ছোট ছোট, কিন্তু দেখতে দেখতে প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই তরতর করে ডানা বেড়ে ওঠে এবং শরীরের আকৃতি বদলে যায়। প্রায় এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি উড়ে বেড়াতে সুরু করে। আমরা অহরহ যে সকল বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি দেখতে পাই, তাদের জন্মবৃত্তান্ত মোটামুটি এইরূপ। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন জাতীয় অগণিত প্রজাপতির জন্মবৃত্তান্তের বৈচিত্র্যও কম নয়।

আমরা সাধারণতঃ দিবাচর প্রজাপতিই দেখতে পাই। বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত হাল্‌কা ডানাওয়ালা ছোট-বড় বিভিন্ন আকৃতির দিবাচর প্রজাপতি সারাদিন ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায় এবং সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার বহু পূর্বেই পত্রপল্লবের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে ডানা মুড়ে বিশ্রাম গ্রহণ করে। কিন্তু নিশাচর প্রজাপতিরা সারাদিন কোনও নির্জন অন্ধকার স্থানে ডানা প্রসারিত করে বিশ্রাম করে এবং গভীর অন্ধকারে আহারান্বেষণে বহির্গত হয়। এরা সাধারণতঃ মথ নামে পরিচিত। মথ বা নিশাচর প্রজাপতি সর্বদাই ডানা প্রসারিত করে বসে, কিন্তু দিবাচর প্রজাপতি ডানা মুড়ে বসেই বিশ্রাম করে। অবশ্য সময়ে সময়ে তারা ডানা মেলে বসে রোদ পোহায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দিবাচর প্রজাপতির বাচ্চার গায়ে শোঁয়া থাকে না; কিন্তু লোমশ শোঁয়াপোকা থেকে সাধারণতঃ মথ জাতীয় প্রজাপতিই আত্মপ্রকাশ করে। অবশ্য লেজওয়ালা, লোমশূন্য বিচিত্র বর্ণের বড় বড় শূককীট থেকেও নিশাচর প্রজাপতি উৎপন্ন হয়ে থাকে। দিবাচর প্রজাপতি পুত্তলী অবস্থায় কোনও কিছুতে ঝুলে বা আটকে থাকবার জন্যে মাত্র সামান্য সুতা বোনে এবং বিভিন্ন জাতীয় পুত্তলী বিভিন্ন বর্ণের উজ্জ্বল কাচ খণ্ডের মত

আকার পরিগ্রহণ করে, কিন্তু নিশাচর প্রজাপতির বাচ্চা পুত্তলী অবস্থায় রূপান্তরিত হবার পূর্বে মুখ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ লালা নিঃসরণ করে সুতো বোনে এবং সেই সুতোয় গুটি তৈরী করে তার অভ্যন্তরে পুত্তলী রূপ ধারণ করে নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে। বিভিন্ন জাতীয় নিশাচর প্রজাপতির গুটি থেকেই আমরা রেশম পেয়ে থাকি। নিশাচর প্রজাপতির ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলেই তারা গাছের পাতা বা ছাল খেয়ে ক্রমশঃ বড় হতে হতে বার বার খোলস পরিত্যাগ করতে থাকে। বার বার খোলস বদল করে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় উপনীত হলে দল বেঁধে কোনও স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং কিছুদিন পরে সুবিধামত স্থান নির্বাচন করে মুখ থেকে সুতো বের করে শরীরের চতুর্দিকে একটি ডিম্বাকার আবরণ গড়ে তোলে। আবরণটি বেশ পুরু হলে শরীরের লোমগুলি তুলে নিয়ে একটি আস্তরণ দিয়ে দেয়। তারপর চুপ করে অবস্থান করে। কিছু দিন পরে উপরের ছালটা ফেলে দিয়ে জলপাইয়ের বীজের মত পুত্তলীর আকার ধারণ করে আবার কিছুদিন নিশ্চেষ্টভাবে পড়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এক মাস বা দুই মাস আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় বৎসরাবধি এরূপ নিশ্চলভাবে অবস্থান করবার পর প্রজাপতির রূপ ধারণ করে গুটি কেটে বেরিয়ে আসে। এদের মধ্যে কয়েক জাতীয় পতঙ্গ দেখা যায়, যাদের স্ত্রী-পতঙ্গদের নামমাত্র ডানা থাকে। শরীরটা তাদের অসম্ভব মোটা—একটুও নড়তে চড়তে পারে না। বৎসরাধিক কাল গুটির অভ্যন্তরে কাটিয়ে বাইরে আসামাত্রই পুরুষ-পতঙ্গেরা উড়ে এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হবার পর দুই-তিন দিনের মধ্যেই স্ত্রী পতঙ্গগুলি অসংখ্য ডিম প্রসব করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই হলো তাদের প্রজাপতি-জীবন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মথ সাধারণ প্রজাপতির মতই জীবনযাত্রা নির্বাহ করে থাকে।

কয়েক জাতীয় প্রজাপতি দেখা যায়, যারা আকৃতি-প্রকৃতিতে মথের মত, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেগুলিকে দিবাচর প্রজাপতির পর্যায়ভুক্ত বলা যেতে পারে। এরা সর্বদাই অল্প অন্ধকার অথবা ছায়ার মধ্যেই অবস্থান করে। দক্ষিণ আমেরিকার পেঁচক-প্রজাপতিই বোধ হয় এই জাতীয় প্রজাপতিদের

বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে, কেমন করে একটা শুঁয়াপোকা বা গুটি থেকে বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি বেরিয়ে আসে।

কলকাতার সন্নিহিত কোনও এক পল্লী অঞ্চলে দুপুর বেলায় এক স্থানে বসে ছিপে মাছ ধরা দেখছি। প্রায় দু'শ গজ দূরে ঝোপের মধ্যে একটা উজ্জ্বল পদার্থের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। নিকটে গিয়ে দেখি, ছোট্ট একটা নীলকণ্ঠ ফুলের গাছের পাতার নীচের দিক থেকে একটা অদ্ভুত পদার্থ ঝুলে রয়েছে। জিনিষটা প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা, দেখতে কতকটা চীনাবাদামের মত; কিন্তু বর্ণ উজ্জ্বল নীল। পড়ন্ত সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে সেটা একটা বেলোয়ারি কাচের দুলের মত ঝিকমিক করছিল। এর গঠন-পারিপাট্য ও রঙের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম! জিনিষটা কি বুঝতে না পেরেও কেবল সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েই সেটাকে এনে একটা শিশিতে পুরে রাখলাম। দুই দিন একই ভাবে ছিল। তৃতীয় দিন ভোরে উঠে দেখলাম—সে অপূর্ব বস্তুটার খোলস পড়ে রয়েছে, কিন্তু তার সেই ঔজ্জ্বল্য নেই। পাশেই বিচিত্র বর্ণের একটা প্রজাপতি বাইরে আসবার জন্যে ছটফট করছে।

পর পর এই কয়টি ঘটনা থেকে প্রজাপতির জন্মের একটা মোটামুটি আভাস পেলাম বটে, কিন্তু জন্মের ধারাবাহিক ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই অনুমান করতে পারলাম না। এই ঘটনার কিছুদিন পরে শিবপুরের কোনও একটি বাড়ীর রান্নাঘরের অন্ধকারাচ্ছন্ন দেয়ালের গায়ে প্রায় নয় ইঞ্চি লম্বা একটা অদ্ভুত প্রজাপতি দেখতে পেলাম। দুই দিকের ডানার উপর পেঁচার চোখের মত গোলাকার উজ্জ্বল নীলবর্ণের দুটি ছাপ, হঠাৎ মনে হয় যেন অন্ধকারের মধ্যে একটা পেঁচা তার গোলাকার চোখ মেলে চেয়ে রয়েছে। অনেক কৌশলে সেটাকে জীবিত অবস্থায় ধরতে পেরেছিলাম। একটা জালের খাঁচায় সেটাকে রেখে দিলাম। কি খায় জানি না; কাজেই খাবার কিছু দেওয়া সম্ভব হয় নি। দুই দিন পর্যন্ত প্রজাপতিটাকে জালের উপর একভাবে ডানা মেলে বসে থাকতেই দেখলাম। তৃতীয় দিনে দেখা গেল জালের গায়ে পাশাপাশি ভাবে অসংখ্য ডিম পেড়ে রেখেছে। ডিম পাড়বার

দুই দিন পরে প্রজাপতিটা মরে গেল। ডিমগুলিকে সেভাবেই রেখে দিলাম। প্রায় মাস দেড়েক পরে সেই ডিম ফুটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য শোঁয়াপোকা বেরিয়ে এলো। তখন আর বুঝতে বাকী রইলো না যে, শোঁয়াপোকারা প্রজাপতিরই বাচ্চা। এখন কি উপায়ে শোঁয়াপোকা প্রজাপতির রূপ ধারণ করে—সেটাই অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে উঠলো। অনেক চেষ্টা করেও কিছুই নির্ণয় করতে পারা গেল না। অবশেষে বিভিন্ন জাতীয় শোঁয়াপোকা কাচের নলের ভিতর পুরে সঙ্গে নিয়েই চলাফেরা করতে লাগলাম। লক্ষ্য করলাম যে কাচের নলে রাখবার পর শোঁয়াপোকাটা প্রথমে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করে অকৃতকার্য হলে শরীরটাকে গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকে। চুপ করে বসবার পর সাধারণতঃ তিন ঘণ্টা থেকে ছয় ঘণ্টার মধ্যে যে-কোন এক সময়ে মাত্র পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে দেহের আকৃতি বেমালুম পরিবর্তন করে পুত্তলীর আকার ধারণ করে। কাজেই এই পাঁচ-সাত মিনিট সময় পর্যবেক্ষণ করতে পারলেই তাদের আকৃতি-পরিবর্তনের কৌশলটা দেখা যেতে পারে। কাচের নলে শোঁয়াপোকা পুরে যখন তখন লক্ষ্য করে দেখলাম—হয় শোঁয়াপোকাই রয়ে গেছে, নয়তো কোন্ ফাঁকে যে দৃষ্টি এড়িয়ে পুত্তলী হয়ে বসে আছে, তা বুঝতে পারি নি। কোনও কোনও জাতের শোঁয়াপোকা রাতের শেষভাগেই সাধারণতঃ পুত্তলীর আকার ধারণ করে থাকে। অনেক চেষ্টার পর একদিন শেষ রাত্রিতে লক্ষ্য করলাম—নিশ্চল শোঁয়াপোকাটা যেন একটু একটু নড়ে উঠছে। ক্রমশঃ নড়াচড়া বৃদ্ধি পেতে লাগলো। প্রায় দু-তিন মিনিট পরে শোঁয়াপোকাটার ঘাড়ের কাছের খানিকটা অংশ চিড় খেয়ে ফেটে গেল। সেই ফাটা স্থানের ভিতর থেকে ঈষৎ লাল আভাযুক্ত একটা শাদা পিণ্ডাকার পদার্থ ক্রমশঃ ঠেলে বেরিয়ে আসছিল। আরও তিন-চার মিনিট অতিক্রান্ত হতেই নারিকেলী কুলের আঁঠির মত সূচালো মুখবিশিষ্ট একটা অদ্ভুত প্রাণী মোচড় খেতে খেতে ঠেলে বেরিয়ে এলো। শোঁয়াপোকার সেই বিশ্রী ছালটা একপাশে পড়ে রইলো। খোলসটা পরিত্যাগ করবার পূর্বেই সে দেহের প্রান্তদেশ থেকে একটু সুতা বের করে তাতে আটকে ঝুলে থাকে।

মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ আকৃতির হয়ে থাকে। দিবাচর প্রজাপতিদের মধ্যেও এদের চেয়ে বৃহত্তর প্রজাপতি বিরল। এদের নীচের ডানা দুটির নিম্নতলে পেঁচার চোখের মত বড় বড় দুইটি গোল দাগ থাকে। সন্ধ্যার সময় যখন এরা উড়তে থাকে, তখন তাদের বৃহৎ ডানা ও গোলাকার চোখ দুটির জন্যে একটা অদ্ভুত প্রাণী বলে মনে হয়। আমাদের দেশেও দুই-তিন ইঞ্চি পরিমাণ এই জাতীয় প্রজাপতির অভাব নেই। শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডেনে এরা বড় বড় গাছের শিকড়ের আড়ালে অন্ধকারের মধ্যে অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে, অসংখ্য ধূসর ও কালো রঙের অদ্ভুত আকৃতির প্রজাপতি বসে আছে।

দিবাচর প্রজাপতির মধ্যে সাধারণতঃ আধ ইঞ্চি থেকে পাঁচ-ছয় ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের ( প্রসারিত ডানার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মাপ ) প্রজাপতির সংখ্যাই বেশী। তাদের শুঁয়াপোকাগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুদৃশ্য এবং মাঝারি আকৃতির হয়ে থাকে। কিন্তু নিশাচর প্রজাপতিদের মধ্যে ডানার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় এক ফুট লম্বা প্রজাপতিও অনেক দেখা যায় এবং চার-পাঁচ মিলিমিটার থেকে পাঁচ-ছয় ইঞ্চি ডানাবিশিষ্ট প্রজাপতির সংখ্যা অগণিত। এই ধরনের বড় বড় প্রজাপতির বাচ্চাগুলি প্রায়ই বিরাটাকৃতির হয়ে থাকে। মথ জাতীয় দুটি বড় প্রজাপতির বাচ্চাকে নিশাচর প্রজাপতির মধ্যে 'সেক্রোপিয়া,' 'অ্যাটলাস্', 'ইম্পিরিয়ালিস' প্রভৃতি প্রজাপতির বিরাট আকার বিস্ময়ের উদ্রেক করে। 'লুনা-মথে'র সুদৃশ্য আকৃতি এবং ডানার স্নিগ্ধ রং বড়ই মনোরম। এতদ্ব্যতীত 'জবুলা', 'পলিফেমাস', 'প্রমেথিয়া', 'ফিলোসামিয়া সিন্থিয়া' প্রভৃতি মাঝারি আকৃতির সুদৃশ্য নিশাচর প্রজাপতিরা উৎকৃষ্ট রেশম উৎপাদন করে বলে সর্বত্র পরিচিত।

## প্রজাপতির লুকোচুরি

পাখীরাই সাধারণতঃ কীট-পতঙ্গের প্রধান শত্রু। পাখী এবং অন্যান্য শত্রুদের আক্রমণ এড়াবার জন্যে কীট-পতঙ্গজাতীয় প্রাণীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীর প্রাণী অপেক্ষা বহুল পরিমাণে অনুকরণপ্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পাখী সাধারণতঃ ফড়িং বা প্রজাপতিকে আক্রমণ করে না। বাদ্‌লাপোকা আকাশে ওড়া মাত্রই যেমন বিভিন্ন জাতীয় পাখী সেগুলিকে ধরে খাবার জন্যে আকাশ ছেয়ে ফেলে, ফড়িং ও প্রজাপতির বেলায় তার বিপরীত ঘটনাই পরিলক্ষিত হয়। ফড়িং ও প্রজাপতিরা পাখীদের আশে-পাশে নির্ভয়ে উড়ে বেড়ায়। ফড়িংদের পরস্পরের মধ্যে অবশ্য শত্রুতা যথেষ্ট ; সুযোগ পেলে সবল দুর্বলকে আক্রমণ করে খেয়ে ফেলে। কিন্তু প্রজাপতিদের মধ্যে সেরূপ কোনও শত্রুতা নেই। কোনও কোনও জাতের প্রজাপতির মধ্যে অদ্ভুত অনুকরণপ্রিয়তা দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য প্রজাপতির স্বাভাবিক শত্রু যে একেবারেই নেই, তা নয়। টিকটিকি, গিরগিটি, কোনও কোনও জাতের মাকড়সা ও পিপীলিকা সুযোগ পেলে এগুলিকে ধরে খেয়ে ফেলে। এতদ্ব্যতীত এদের অপরূপ সৌন্দর্য ও বর্ণবৈচিত্র্যে আকৃষ্ট হয়ে মানুষেরাও এদের যথেষ্ট শত্রুতা করে থাকে। বোধ হয় এই স্বাভাবিক শত্রুদের কবল থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্ত কোন কোন জাতের প্রজাপতি ডানা মুড়ে গাছের পাতার অণুকরণ করে থাকে। কেউ কেউ বা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে শত্রুকে পশ্চাদ্ধাবন থেকে নিবৃত্ত করে। আমাদের দেশীয় মথ জাতীয় এক

মধ্যে গাঢ় সবুজ রঙের পাতার উপর রাত বসে কাটায়। সাধারণতঃ প্রজাপতির ডানার নিম্নভাগের রং ফিকে এবং নিষ্প্রভ হয়ে থাকে এবং বসবার সময় ডানা ভাঁজ করে রাখে ; কাজেই সহসা কারও দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। কিন্তু এই রক্ত তিলক প্রজাপতির ডানার নীচের দিক উপ রর দিক অপেক্ষা উজ্জ্বলতর। যে কারণেই হোক, এরা ডানা ভাঁজ করে বসে না ; মথ প্রজাপতিদের মত এরা ডানা মেলে বিশ্রাম করে। কাজেই পৃষ্ঠ-দেশের অনুজ্জ্বল অংশই বাইরের দিকে থাকে। অন্ধকার স্থানে গাঢ় রঙের পাতার উপর বিশ্রাম করবার ফলে এরা অনায়াসে শত্রুর চোখে ধূলি নিক্ষেপ করতে পারে।

আর এক প্রকার কালো রঙের প্রজাপতির ক্ষুদ্রতর ডানা দুটির প্রান্তভাগে সারবন্দীভাবে কতকগুলি সাদা ফোঁটা থাকে। এই প্রজাপতির পৃষ্ঠদেশের রং নিম্নভাগের রং অপেক্ষা অনেক হালকা ও অনুজ্জ্বল। গাছের যে সব পাতা শুকিয়ে কালো হয়ে ঝুলে থাকে, এই প্রজাপতিরা সেই সব পাতার গায়ে বসে অতি সহজেই আত্মগোপন করে থাকে।

এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি লম্বা হল্‌দে রঙের এক প্রকার প্রজাপতিকে দলে দলে উড়ে বেড়াতে দেখা যায়। এরা বিশ্রাম সময়ে এক প্রকার ফিকে হল্‌দে রঙের পাতাওয়ালা ছোট ছোট গাছের ডালে ডানা মুড়ে বসে থাকে। হঠাৎ এগুলোকে দেখে সেই গাছের পাতা বলেই মনে হয়।

দেড় ইঞ্চি দুই ইঞ্চি লম্বা মথ জাতীয় এক প্রকার প্রজাপতিকে গাছের পাতার উপর বসে থাকতে দেখা যায়। অধিকাংশ সময়েই এরা বসে কাটায় এবং মাঝে মাঝে ধীরে ধীরে ডানা নেড়ে থাকে। প্রায়ই এগুলোকে আম গাছের উপর দেখতে পাওয়া যায়। এদের গুটির রং আম পাতার মত গাঢ় সবুজ এবং শরীর ত্রিকোণাকার, গুটিগুলি আমপাতার গায়েই ঝুলে থাকে। পাতা ও গুটির রং এক হবারফলে কদাচিৎ নজরে পড়ে থাকে। এই প্রজাপতির পৃষ্ঠদেশের রং ধূসর কিন্তু তলদেশ হালকা ধূসর বা গোলাপী রঙের। এই প্রজাপতিরা যখন পাতার উপর বসে বিশ্রাম করে, তখন পৃষ্ঠদেশই নজরে পড়ে এবং পাতার রঙের সঙ্গে গায়ের রঙের বিশেষ কোনও

পার্থক্য বুঝতে পারা যায় না। ঝোপের মধ্যে অন্ধকারে পাতার উপর বসে থাকলে এরা মোটেই নজরে পড়ে না।

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ডানাওয়ালা মথ জাতীয় পতঙ্গদের গায়ের রং সাধারণতঃ অনেক ক্ষেত্রেই ধূসর বা অনুজ্জ্বল বাদামী হয়ে থাকে। এরা ছোট ছোট গাছের শুষ্কপত্রের উপর নিশ্চলভাবে বসে থাকে। তখন শুষ্ক পত্রের রং ও মথের রং এমনভাবে মিলে থাকে যে সহজে এগুলিকে চিনতে পারা যায় না; মনে হয় যেন শুষ্ক পত্রেরই একটা ছিন্ন অংশ আটকে রয়েছে। সময়ে সময়ে এই জাতীয় বিভিন্ন শ্রেণীর পতঙ্গের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে রং মিলিয়ে নির্বিঘ্নে অবস্থান করবার কৌশল দেখে বিস্মিত হতে হয়।

# মাকড়সা

## গর্তবাসী মাকড়সা

নিজেদের অস্তিত্ব এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার জন্যে জীব-জগতের সর্বত্র প্রতিকূল পারিপার্শিক অবস্থার সঙ্গে একটা দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। দ্বন্দ্বটা প্রধানতঃ প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রাকৃতিক অবস্থার সামঞ্জস্য বিধান করেই জীব-জগৎ অভিব্যক্তির বিভিন্ন স্তরে উন্নীত হয়েছে। এই কারণেই জীব-জগতে অসংখ্য বৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে এই কারণেই বহু জাতি এবং ততোধিক উপজাতীয় প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়। উন্নত পর্যায়ের প্রাণী থেকে আরম্ভ করে নিম্নতম পর্যায়ভুক্ত প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। কোনও কোনও শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে জাতিবৈচিত্র্য এত অধিক যে, মনে হয় যেন এরা পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করবার সম্ভাব্য কোনও পথেই অগ্রসর হতে কসুর করে নি। অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরের প্রাণীদের কথা বাদ দিয়ে নিম্ন স্তরের কীট-পতঙ্গের মধ্যে একমাত্র মাকড়সার কথা আলোচনা করলেই দেখা যাবে—এরা এত অধিক সংখ্যক বিভিন্ন জাতি এবং উপজাতিতে বিভক্ত যে, তার প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা দুষ্কর। আনাচে-কানাচে, বনে-জঙ্গলে মাকড়সার জাল প্রায়ই আমাদের চোখে পড়ে। বিভিন্ন জাতীয় মাকড়সা বিভিন্ন পদ্ধতিতে জাল বুনে থাকে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে—একমাত্র আমাদের দেশেই কত রকমারি জাল-বোনা মাকড়সা রয়েছে। জাল বোনে না অথচ বিচিত্র ধরণের বাসা নির্মাণ করে বসবাস

করে, বিভিন্ন জাতের এরূপ মাকড়সার সংখ্যাও অগণিত। জলাভূমিতে অথবা জলের উপরিভাগে বিচরণকারী মাকড়সার সংখ্যাও কম নয়। কেউ কেউ আবার জলের নীচেই তাদের বিশ্রামস্থল নির্মাণ করে থাকে। আমাদের দেশেও কয়েক প্রকার ডুবুরী ও মেছোমাকড়সা দেখা যায়। কয়েক জাতের মাকড়সা দেয়ালের ফাটলে বা বৃক্ষকোটরে বাস করতেই অভ্যস্থ। মাকড়সারা যে কেবল জলে, স্থলে ও বৃক্ষ-লতাদিতেই বিচরণ করে থাকে তা নয়, বিভিন্ন জাতের মাকড়সা আকাশপথে বিচরণ করবার জন্যেও অদ্ভুত কৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছে। এতদ্ব্যতীত কয়েক জাতীয় মাকড়সা আবার সুড়ঙ্গ এবং মৃত্তিকাভ্যন্তরে গর্ত নির্মাণ করে বসবাস করে। দৈহিক গঠন এবং অঙ্গ-সংস্থানের গুরুতর পার্থক্য বিদ্যমান থাকায় মাকড়সা সাধারণ কীট-পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত নয়। তাছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হলেও প্রত্যেক মাকড়সাই কম হোক, কি বেশী হোক—কিছু-না-কিছু সূতা বুনতে পারে। গর্তবাসী মাকড়সারাও এসব বৈশিষ্ট্য বর্জিত নয়। তথাপি এদের জীবনযাত্রা প্রণালী অনেকটা সাধারণ কীট-পতঙ্গের মত। পিপীলিকা ও মৌমাছির ন্যায় অল্প সংখ্যক কয়েক জাতীয় সামাজিক মাকড়সা ব্যতীত বাকী সকলেই অসামাজিক প্রাণী। জালেই হোক কি গর্তেই হোক, এক স্থানে বহু মাকড়সা দেখা গেলেও তারা নিজ নিজ আশ্রয়স্থলে, একক ভাবেই বিচরণ করে থাকে। একই জমিতে পাশাপাশি বিভিন্ন গর্তে বহুসংখ্যক মাকড়সা বাস করলেও তাদের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব দূরে থাক দেখা-সাক্ষাৎই হয় না। পরস্পরের মধ্যে দৈবাৎ সাক্ষাৎ হলে উভয়েই উভয়কে পাশ কাটিয়ে সরে পড়ে, নচেৎ সংঘর্ষ অনিবার্য। স্ত্রী-মাকড়সারাই সাধারণতঃ জাল বা গর্ত নির্মাণ করে থাকে। পুরুষেরা আশ্রয়স্থল নির্মাণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন বললেও অত্যুক্তি হয় না। তারা স্ত্রী-মাকড়সার পরিত্যক্ত আশ্রয়স্থলে অথবা যেখানে-সেখানে কোনও রকমে মাথা গুঁজে অবসর সময়টা কাটিয়ে দেয়। গর্তবাসী মাকড়সার পুরুষদের সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। অবশ্য এই শ্রেণীর কোন কোনও পুরুষ-মাকড়সাকে কদাচিৎ গর্ত নির্মাণ করতেও দেখা যায়।

আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতীয় অন্ততঃ চার-পাঁচ রকমের সুড়ঙ্গ এবং

গর্ত নির্মাণকারী মাকড়সা লক্ষ্য করেছি। এরা সকলেই সর্বতোভাবে না হোক, অন্ততঃ কতক বিষয়ে বিভিন্ন জাতের পিঁপড়ের অনুকরণ করে থাকে। এরা সকলেই নতুন আবিষ্কৃত বলে বৈজ্ঞানিক নামকরণ করেছি। ডেঁয়ো-পিঁপড়ের অনুকরণকারী কালো রঙের এক জাতীয় মাকড়সা গাছের ফাটলে অথবা গাছের গুঁড়ি-সংলগ্ন ভূমিতে সামান্য গর্ত খুঁড়ে বসবাস করে। এরা প্রধানতঃ ডেঁয়ো-পিঁপড়ে উদরসাৎ করে জীবন-ধারণ করে। গর্তের মুখে পাত্‌লা জাল বুনে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে রাখে। মাকড়সা গর্তের ভিতরে অবস্থান করলেও শরীরের পশ্চাদ্ভাগ থেকে নির্গত একখণ্ড সূক্ষ্ম সুতা গর্তের বাইরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলির সঙ্গে সংলগ্ন থাকে। ডেঁয়ো-পিঁপড়ে-গুলিকে অনেক সময় তাদের বাসার আশেপাশে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ছুটাছুটি করতে দেখা যায়। ছুটাছুটি করবার সময় অসতর্কভাবে একবার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মাকড়সার সুতার উপর পা দিলেই বিপদ। পায়ের সঙ্গে সুতা আঠার মত লেগে যায়। ছাড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে আরও জড়িয়ে পড়ে। পা আটকাবার সঙ্গে সঙ্গেই জালের মৃদু কম্পনে গর্তের মধ্য থেকে মাকড়সা শিকারের আগমন-বার্তা বুঝতে পেরে তার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। ফাঁদ থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টায় শিকার সম্পূর্ণরূপে জড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত মাকড়সা ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করে এবং সুযোগ বুঝলেই জালসমেত শিকারটাকে গর্তের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। শিকার ধরবার জন্যেই হোক বা অন্য কোনও প্রয়োজনেই হোক বা যে কোনও কারণেই হোক এদের গর্তের বাইরে আসতে দেখা যায় না।

কলকাতার আশেপাশে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় আধ ইঞ্চি লম্বা, হাল্‌কা খয়েরী রঙের এক জাতীয় মাকড়সার সন্ধান পাওয়া যায়। এরা পুরাতন দেয়াল অথবা ভগ্ন ইষ্টকস্তূপের ধারে ছোট ছোট গর্ত নির্মাণ করে বাস করে। পাত্‌লা জাল বুনে গর্তের মুখে চাঁদোয়ার মত ঝুলিয়ে রাখে। শিকার ধরবার আশায় সন্ধ্যার পূর্বে গর্তের ধারে চাঁদোয়ার আড়ালে ওৎ পেতে বসে থাকে। ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ দেখতে পেলেই ছুটে গিয়ে আক্রমণ করে এবং বাসায় নিয়ে এসে ধীরে ধীরে তার রসরক্ত চুষে খায়।

ঘাসপাতা সমাকীর্ণ ছায়াযুক্ত স্থানে দেয়ালের গায়ে পুরাতন বৃক্ষের গুঁড়িতে সিকি ইঞ্চি পরিমিত গাঢ় খয়েরী রঙের এক প্রকার মাকড়সা দেখতে পাওয়া যায়। হঠাৎ দেখলে মাকড়সাগুলিকে অনেকটা মাঝারি গোছের ডেঁয়ো-পিঁপড়ের মত বলেই মনে হয়। এরা সূতা, মাটি এবং অন্যান্য পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার সাহায্যে ধনুক অথবা কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইউ-টিউবের আকারে সুড়ঙ্গ নির্মাণ করে বসবাস করে। কলক্যতার ভিতরে এবং বাইরে বিভিন্ন স্থানে এই জাতীয় মাকড়সার সুড়ঙ্গ দৃষ্টগোচর হয়। স্তিমিত আলোকে অথবা ছায়ার আড়ালে শিকার ধরবার জন্যে বের হলেও সুড়ঙ্গ ছেড়ে সাধারণতঃ এরা উজ্জ্বল আলোকে বের হতে চায় না। জোর করে বাসা থেকে বের করে দিলে অতি দ্রুতগতিতে ছুটে কোনও কিছুর আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু বেশীক্ষণ ছুটতে পারে না। ক্লান্ত হলেই মৃতের ন্যায় ভান করে। ডেঁয়ো পিঁপড়ের সঙ্গে আকৃতিগত নিখুঁৎ সাদৃশ্য না থাকলেও দ্রুতগতিভঙ্গী দেখেই সেগুলিকে পিঁপড়ে বলে ভুল করাই স্বাভাবিক। সুড়ঙ্গ নির্মাণ করবার প্রারম্ভে এই মাকড়সা ধনুকের মত আকারে বাঁকানো সুতার কাঠামো নির্মাণ করবার পর আশেপাশের বিভিন্ন স্থান থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাটির টুক্‌রা, শ্যাওলা এবং অন্যান্য পদার্থ বয়ে নিয়ে আসে এবং সেগুলিকে সুতার কাঠামোর উপর বসিয়ে দেয়। সুতার আঠায় লেগে সেগুলি দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হয়ে থাকে। উপরের আবরণ নির্মাণ শেষ হলে ভিতরে পুনরায় পুরু করে আস্তরণ দিয়ে দেয়। 'ইউ-টিউবের' মত দুটি বাহুসমন্বিত সুড়ঙ্গ নির্মাণের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম না হলেও আত্মরক্ষা জন্য যে দুটি কুঠ্‌রির সুবিধা পাওয়া যায়— তাতে কোনই সন্দেহ নেই। সুড়ঙ্গটা লম্বালম্বি নির্মিত হলে এরূপ সুবিধা হতো না। সবচেয়ে বড় সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ্য দেড় ইঞ্চি থেকে পৌনে দু-ইঞ্চির বেশী হয় না। সুড়ঙ্গের দুটি মুখই খোলা থাকে। শত্রু এক মুখ দিয়ে আক্রমণ করলে অপর মুখ দিয়ে তার অগোচরেই পলায়ন করা যায়। তাছাড়া শত্রুর দৃষ্টি এড়াবার জন্যে বাসাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই এমনভাবে শ্যাওলা ও অন্যান্য পদার্থের টুক্‌রার দ্বারা আবৃত করে রাখে যে, গর্তের মুখের দুটি

ছিদ্র ছাড়া আর কোনও অংশই সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। এই জাতীয় পুরুষ মাকড়সাগুলিকে মাঝে মাঝে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন সুড়ঙ্গ নির্মাণ করতে দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ মাকড়সা স্ত্রী-মাকড়সার পরিত্যক্ত জীর্ণ বাসগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। স্ত্রী-মাকড়সা অপেক্ষা পুরুষ-মাকড়সা কিয়ৎপরিমাণে খর্বকায়। জাল-বোনা মাকড়সাদের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষেরা অসম্ভব রকম ক্ষুদ্রায়তনের হয়ে থাকে; কিন্তু জলচারী, নেকড়ে, মৎস্যশিকারী এবং বাসা-নির্মাণকারী অধিকাংশ মাকড়সার স্ত্রী ও পুরুষের শরীরের দৈর্ঘ্য প্রায় সমান। প্রকৃত পিঁপড়ে অনুকরণকারী মাকড়সার পুরুষেরা স্ত্রী-মাকড়সা অপেক্ষা অনেক বড় হয়ে থাকে। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এপর্যন্ত সাঁইত্রিশ রকমের বিভিন্ন জাতীয় পিঁপড়ে-মাকড়সার সন্ধান পাওয়া গেছে। এরা বিভিন্ন পিপীলিকার আকৃতি, প্রকৃতি—এমন কি, দেহবর্ণ পর্যন্ত নিঁখুৎভাবে অনুকরণ করে থাকে। এদের প্রত্যেকেরই পরিণত বয়স্ক পুরুষের দেহাকৃতি স্ত্রী-মাকড়সার চেয়ে বড়। অবশ্য পরিণত অবস্থায় রূপান্তরিত হবার পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রী-মাকড়সার সঙ্গে আকৃতি ও দৈর্ঘ্যে পুরুষ-মাকড়সার বাহ্যিক কোনও পার্থক্যই দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদের দেশের ডেঁয়ো এবং বিষ-পিঁপড়ের অনুকরণকারী প্রায় ছয়-সাত রকমের মাকড়সা দেখতে পাওয়া যায়। এরা সকলেই কম-বেশী ভূগর্ভের অধিবাসী। কিন্তু এদের বাসা নির্মাণ প্রণালী কিঞ্চিৎ ভিন্ন ধরণের বলে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করবো না। যাহোক্, পূর্বেই বলেছি, 'উই-টিউবে'র মাকড়সা উজ্জ্বল আলোকে বাইরে আসতে চায় না। কিন্তু নিতান্ত দায়ে পড়লে অথবা প্রয়োজনের তাগিদে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায়। একবার এরূপ একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ হয়েছিল।

অনেক আগে শান্তিনিকেতনের মালঞ্চের পরিবষ্টনীর মধ্যে একটি টিলার মত উঁচু জায়গায় একটা বটগাছের গোড়ার দিকে এরূপ কয়েকটা মাকড়সার সুড়ঙ্গ দেখতে পেয়েছিলাম। গোটা তিনেক সুড়ঙ্গ ছিল খুব কাছাকাছি। একটা ছিল—অনেকটা দূরে। ভিতরে মাকড়সা আছে কিনা দেখবার জন্যে সুড়ঙ্গটার উপর একটু চাপ দিতেই কালো রঙের একটা ক্ষুদ্রকায় মাকড়সা

বাইরে ছিট্‌কে পড়ে বিদ্যুৎগতিতে মৃত্তিকাভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে গেল। বোঝা গেল প্রত্যেকটি বাসাতেই মাকড়সা থাকবার সম্ভাবনা। অপর বাসাগুলির মধ্যে একটি অর্ধচ্ছিন্ন বাসাই সর্বাপেক্ষা বড় ছিল। ছিন্ন বাসাটার পাশেই প্রায় একইঞ্চি ব্যবধানে ছিল আর একটা নতুন বাসা। বটপাতার মধ্য থেকে শ্যামাপোকার মত ধূসর বর্ণের একটা পোকা ধরে বটের আঠায় তাকে লম্বা একটা ঘাসের ডগায় আট্‌কে দিলাম। ঘাসের লম্বা ডগার সাহায্যে পোকাটাকে একবার এ-বাসার মুখে আবার ও-বাসার মুখে স্পর্শ করাতেই পোকাটা পা দিয়ে বাসা আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছিল। দু-একবার এরূপ করতেই উভয় সুড়ঙ্গের মাকড়সা দুটিই বোধ হয় শিকারের উপস্থিতি অনুভব করে যুগপৎ বাইরে মুখ বাড়িয়ে দিল। ইতিমধ্যে ঘাসের ডগা সংলগ্ন পোকাটাকে উভয় বাসার মধ্যস্থলে রেখে ধীরে ধীরে নাড়তে লাগলাম। উভয়েই বাসা থেকে বের হয়ে অতি সন্তর্পণে শিকারের দিকে অগ্রসর হলো। দুটিই স্ত্রী-মাকড়সা; সম্মুখের পায়ের প্রান্তভাগ থেকে পিছনের পায়ের প্রান্তভাগ পর্যন্ত আধ ইঞ্চির বেশী হবে না। ছিন্ন বাসার মাকড়সাটা শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার উপক্রম করতেই পোকাটাকে সরিয়ে দিলাম। মুখোমুখি অবস্থায় উভয়েই থমকে দাঁড়ালো! পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান তখন আধ ইঞ্চির বেশী নয়। প্রায় মিনিটখানেক স্থিরভাবে অবস্থান করবার পর ছিন্ন বাসার মাকড়সা সম্মুখের পা দুটি উঁচু করে অপরটার দিকে অগ্রসর হলো। অপর মাকড়সাটাও ইতিমধ্যে সম্মুখের পা দুটি উঁচু করে আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। তারপর চললো—ঠিক যেন রায়বেশে কায়দায় পাঁয়তারা কষা। পরস্পর মুখোমুখি থেকেই উভয়ে একবার এ-পাশে আবার ও-পাশে সরতে লাগলো। মনে হলো যেন উভয়ে উভয়কে পাশের দিক থেকে আক্রমণ করতে চেষ্টা করছে, কিন্তু এ-পাশে বা ও-পাশে সরে গিয়ে কেউ কাউকে সেই সুযোগ দিচ্ছে না। মিনিট পাঁচেক পর্যন্ত এভাবে পাঁয়তারা কষবার পর ছিন্ন বাসার মাকড়সাটা অকস্মাৎ বিদ্যুদ্বেগে অপর মাকড়সাটার উপর লাফিয়ে পড়লো। তারপর শুরু হলো কামড়া-কামড়ি। কিন্তু দু-চার সেকেণ্ড মাত্র। তারপরেই উভয়ে উভয়কে ছেড়ে দূরে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ

বাদেই আবার হাতাহাতি লড়াই সুরু হয়ে গেল। মিনিটখানেকের মধ্যেই ছিন্ন বাসার মাকড়সাটা অপর মাকড়সাটাকে কাবু করে ফেললো এবং পরাজিত অর্ধমৃত মাকড়সাটাকে নিয়ে তারই গর্তে ঢুকে পড়লো।

আমাদের দেশীয় সুড়ঙ্গ নির্মাণকারী মাকড়সাদের আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। পূর্বেই বলেছি, এদের পুরুষ-মাকড়সারা নিজেদের বসবাসের জন্যে কদাচিৎ সুড়ঙ্গ নির্মাণ করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা স্ত্রী-মাকড়সার পরিত্যক্ত জরাজীর্ণ সুড়ঙ্গেই আশ্রয় গ্রহণ করে। যৌন-মিলনের সময় হলেই পুরুষেরা স্ত্রী-মাকড়সার দরজায় গিয়ে তাদের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে চেষ্টা করে। বাসার দু-দিকের দুটি মুখ সর্বদা উন্মুক্ত থাকলেও প্রথমে সে কিছুতেই অন্দরে প্রবেশ করবে না। মাকড়সার এরূপ শিষ্টাচারের কথা শুনে অনেকে বিস্মিত হতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারও সাক্ষাৎপ্রার্থী হলে আমরা যেমন তার বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে দরজার কড়া নাড়ি, পুরুষ মাকড়সাও সেরূপ স্ত্রী-মাকড়সার সুড়ঙ্গের দরজার কাছে উপস্থিত হয়ে সম্মুখের দুটি পায়ের সাহায্যে অতি অদ্ভুত ভঙ্গীতে গর্তের মুখটাকে দু-তিন বার কাঁপিয়ে দেয়। ভিতর থেকে সাড়া না পাওয়া পর্যন্ত দরজার পাশে ধৈর্য ধরে চুপ করে বসে থাকে। প্রথম সঙ্কেতে গৃহকর্ত্রীর সাড়া না মিললে কিছুক্ষণ বাদে পুনরায় সুড়ঙ্গের মুখটাকে অতি সন্তর্পণে কাঁপিয়ে দেয়। অনেক স্থলেই দেখা যায়, প্রথম বারের সঙ্কেতেই গৃহকর্ত্রী দরজার কাছে হাজির হয়েছে। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে দু-তিনবার সঙ্কেতের পরেও আগন্তুক সম্বন্ধে গৃহকর্ত্রী কোনই উৎসাহ প্রদর্শন করে না। আগন্তুক তখন ঘুরে গিয়ে সুড়ঙ্গের অপর দরজায় উপস্থিত হয় এবং পূর্বোক্ত উপায়ে সঙ্কেত চালিয়ে গৃহকর্ত্রীকে তার আগমন-বার্তা জ্ঞাপন করবার চেষ্টা করে। তাতে বিফলমনোরথ হলে বাধ্য হয়ে অপর কোনও গৃহকর্ত্রীর দরজায় ধর্ণা দিতে যায়। পূর্বেই বলেছি, এরা সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে সূতার আস্তরণ বুনে দেয়। সুড়ঙ্গের ভিতরে অবস্থান করলেও বাইরে থেকে উৎপন্ন এই সূতার আস্তরণের সামান্য কম্পন থেকেই এরা কোনও কিছুর আগমনবার্তা টের পায়। সাক্ষাৎপ্রার্থী আগন্তুকের মৃদু

কম্পন, শিকার অথবা আততায়ীর গতিভঙ্গীর পার্থক্যজনিত বিবিধ কম্পনের তারতম্য বোধ এদের অসাধারণ। যাহোক, আগন্তুকের সাড়া পেলেই গৃহকর্ত্রী সুড়ঙ্গের মুখে এসে উপস্থিত হয়, শরীরের অর্ধাংশ সুড়ঙ্গের মধ্যে থেকেই সম্মুখের দুটি পা উঁচু করে আগন্তুককে অভিবাদন জ্ঞাপন করে। আগন্তুকও ঠিক সেভাবে সম্মুখের দুটি পা উঁচু করে অতি মৃদুভাবে স্ত্রী-মাকড়সার পাদস্পর্শ করে প্রত্যভিবাদন জ্ঞাপন করে। এই অভিবাদনের ভঙ্গী থেকে পুরুষ-মাকড়সার তো কথাই নেই—দর্শকদের পর্যন্ত বুঝতে কষ্ট হয় না যে, স্ত্রী-মাকড়সাটা এখন কি 'মুডে' রয়েছে। খারাপ 'মুডে' থাকলে অভিবাদনের ভঙ্গীটাই যেন সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণাত্মক হয়ে দাঁড়ায় এবং তৎক্ষণাৎ আগন্তুককে তাড়া করে যায়। পুরুষ-মাকড়সাও তখন প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায়; কিন্তু বিপরীত অবস্থায় অর্থাৎ ভাল 'মুডে' থাকলে অভিবাদনপর্ব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রী-মাকড়সা নিমেষের মধ্যে ছুটে গিয়ে সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং অপর দরজার কাছে মুখ বের করে থাকে। পুরুষটিও তখন বাইরের দিক দিয়ে ছুটে গিয়ে সেই দরজায় উপস্থিত হয় এবং উভয়ে উভয়ের পাদস্পর্শ করে সন্তোষ জ্ঞাপন করে। কিন্তু এক-আধ সেকেণ্ড মাত্র এরূপ সন্তোষ জ্ঞাপন করে স্ত্রী-মাকড়সা সুড়ঙ্গ পথে ছুটে গিয়ে পুনরায় অপর দরজায় উপস্থিত হয়। পুরুষটিও তৎক্ষণাৎ সেই দরজায় ছুটে যায় এবং পা কাঁপিয়ে প্রীতি সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে। অনেকক্ষণ এরূপ লুকোচুরি খেলা চলবার পর পুরুষ-মাকড়সা এক একবার একটু একটু করে স্ত্রী-মাকড়সার পিছনে পিছনে তার সুড়ঙ্গের ভিতরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করে। অবশেষে এক সময়ে সুযোগ বুঝে গৃহকর্ত্রীর পিছনে পিছনে ভিতরে ঢুকে পড়ে। প্রায় আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা পর্যন্ত সুড়ঙ্গের মধ্যে অবস্থান করবার পর অকস্মাৎ তাকে যেন ছিট্‌কে বাইরে আসতে দেখা যায়। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—যৌন-মিলনের পর গৃহকর্ত্রী তাকে উদরসাৎ করবার উপক্রম করবার ফলেই পুরুষ মাকড়সা প্রাণভয়ে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়।

মাটির নীচে গর্ত খুঁড়ে বাস করে আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এরূপ

কয়েক জাতের মাকড়সার কথা শোনা যায়। তাদের মধ্যে গর্তের মুখে কপাট নির্মাণকারী এক জাতের মাকড়সাই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরা সাধারণতঃ 'ট্র্যাপ-ডোর' মাকড়সা নামে পরিচিত। আমাদের দেশীয় গর্ত বা সুড়ঙ্গ নির্মাণকারী মাকড়সার সুড়ঙ্গের মুখে কোনও দরজার বন্দোবস্ত নেই। একমাত্র 'ট্র্যাপ-ডোর' মাকড়সাই সুড়ঙ্গের মুখে ঢাকনি নির্মাণ করে। বলা বাহুল্য, এদের গর্তের একটিমাত্র মুখ থাকে। 'ট্র্যাপ-ডোর'-মাকড়সা মাটির নীচে প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা ও এক ইঞ্চি থেকে দেড় ইঞ্চি চওড়া গর্ত খুঁড়ে বাসা তৈরী করে। শ্যাওলা ও ঘাসপাতায় আবৃত নরম মাটির মধ্যেই প্রচুর সংখ্যক 'ট্র্যাপ-ডোর' মাকড়সার গর্ত দেখতে পাওয়া যায়। একই স্থানে বিভিন্ন গর্তে বহুসংখ্যক 'ট্র্যাপ-ডোর' মাকড়সার আবাসস্থল নির্মিত হলেও এদের মধ্যে প্রতিবেশীর প্রতি হৃদ্যতা বা সহানুভূতির কোনই লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না। একই মাতার গর্ভজাত মাকড়সাদের মধ্যে কোন কারণে দুজনের সাক্ষাৎ ঘটে গেলে নেহাৎ অকারণেই লড়াই বেধে যায় এবং একপক্ষ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটে না। বাসা নির্মাণের প্রারম্ভে 'ট্র্যাপ-ডোর' মাকড়সার মুখের সম্মুখভাগে অবস্থিত হাতের মত দুটি উপাঙ্গের সাহায্যে ডেলা-ডেলা মাটি তুলে নিয়ে কিছু দূরে ফেলে আসে। গর্ত তিন-চার ইঞ্চি গভীর হলেই মাটি তোলবার জন্যে অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করে। গর্তের নীচে ডেলা-ডেলা মাটি আল্‌গা করে এলোমেলোভাবে বোনা কতকগুলি সুতার সঙ্গে সেগুলিকে আট্‌কে দেয়। সুতার সঙ্গে অনেকগুলি ডেলা সংলগ্ন হলে উপর থেকে সুতার গোছা টেনে বের করে। গর্ত নির্মাণ শেষ হবার পর যাতে দেয়ালের আলগা মাটি ঝরে গর্ত বুজে না যায় সেজন্যে শক্ত চোয়ালের সাহায্যে দেয়ালের মাটি আগাগোড়া চেপে বসিয়ে দেয়। সেই কারণে গর্তের অভ্যন্তর ভাগ এবড়ো-খেবড়ো হলেও মাটি ধ্বসে পড়বার আশঙ্কা থাকে না। গর্তের দেয়াল সুদৃঢ় করবার পর চতুর্দিকে বারংবার সুতা বুনে ভেলভেটের মত কোমল আস্তরণ দিয়ে দেয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাটির ডেলা, শ্যাওলা প্রভৃতি একত্রিত করে গর্তের উপরিভাগে একপাশে একটি গোলাকার ঢাক্‌না নির্মাণ করে। ঢাক্‌নার যে দিকটা

গর্তের ভিতরে থাকবে সে দিকটায় এবং তার চারধার ঘিরে খুব পরু করে সূতা বুনে দেয়। গর্তের আস্তরণ ও ঢাকনার সূতার আস্তরণের সঙ্গে একদিকে সূতা বুনে কব্জার মত জুড়ে দেবার ফলে ঢাক্‌নাটি স্থানচ্যুত না হয়ে অনায়াসে ওঠা-নামা করতে পারে। চতুর্দিকে সূতার আস্তরণ দেওয়া শেষ হলে ঢাকনিটাকে ভিতর দিক থেকে টেনে ধরে গর্তের মুখে চেপে বসায়। চতুর্দিকে সূতার আস্তরণ অনেকটা আল্‌গাভাবে থাকবার ফলে ঢাকনার পরিধি গর্তের মুখের চেয়ে কিঞ্চিৎ বড় হয়ে থাকে। কিন্তু বার বার সেটাকে গর্তের মুখে চেপে বসাবার ফলে ক্রমশঃ বেশ এঁটে যায়। তারপর চোয়ালের সাহায্যে ঢাকনার নীচের দিকে দুটি ফুটা করে দেয়। এই ছিদ্র দুটির সাহায্যে মাকড়সা ভিতর থেকে ঢাকনিটাকে ধরে খুলতে বা বন্ধ করতে পারে। বাসা-নির্মাণ শেষ করতে ষোল থেকে বিশ ঘণ্টা সময় লেগে থাকে। ঢাকনির উপরিভাগে শ্যাওলা ও লতাপাতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ জুড়ে দেয়। এর ফলে ঢাকনি বন্ধ থাকলে সে স্থানটা আশেপাশের ঘাসপাতার সঙ্গে বেমালুম মিশে থাকে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেও কোথায় মাকড়সার গর্ত আছে সহজে তা বুঝা যায় না। বাইরে থেকে কেউ গর্তের ঢাকনি খুলতে চেষ্টা করলে মাকড়সা ভিতর থেকে তাকে টেনে ধরে রাখে। এই টানের জোরও বড় কম নয়। জোর করে ঢাকনি খুলে নিলে মাকড়সাটা সেটাকে কামড়ে ধরেই থাকে। কিন্তু গর্তের অন্ধকার থেকে আলোয় আসা মাত্রই বিপদ বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ ঝুপ করে গর্তের মধ্যে পড়ে যায়। প্রধানতঃ এরা রাত্রিকালেই শিকার অন্বেষণে বের হয়। গর্ত ছেড়ে দূরে গেলেই গর্তের ডালা খুলে রেখে আসে, নচেৎ ডালা বন্ধ হলে বাইরে থেকে আর খোলবার উপায় থাকে না। সাধারণতঃ এরা গর্তের মুখে শরীরের অর্ধাংশ বের করে শিকারের প্রতীক্ষা করে। গর্তের নিকট দিয়ে কোনও কীট-পতঙ্গ যাতায়াত করলেই তাকে আক্রমণ করে গর্তের ভিতরে টেনে নেয়। দরজাটাও সঙ্গে সঙ্গে আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যায়, তখন নিশ্চিন্ত মনে আহারে প্রবৃত্ত হয়। দিনের বেলায়ও অবশ্য সময়ে সময়ে এদের গর্তের ডালা অর্ধোন্মুক্ত করে শিকারের জন্যে ওৎ পেতে বসে থাকতে দেখা যায়।

তাছাড়া শিকারের লোভ দেখিয়ে দিনের বেলায় এদের গর্তের বাইরে আনাও অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রথমতঃ দু-একবার এরূপ প্রলোভিত হলেও প্রতারণা বুঝতে এদের বেশী সময় লাগে না, তখন শত চেষ্টায়ও আর গর্ত থেকে বের করা যায় না। ট্র্যাপ-ডোর মাকড়সারা অত্যন্ত কলহপ্রিয়। সহজে পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে না। কোনও ক্রমে দুটিতে সামনাসামনি হয়ে পড়লেই লড়াই অনিবার্য। সময় সময় অল্প ব্যবধানে পাশাপাশি গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে একের গর্তের সঙ্গে অপরের গর্ত নীচের দিকে গিয়ে মিলিত হয়ে যায়। তখন গর্ত খোঁড়া বন্ধ রেখে উভয়ে উভয়কে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে। একটি প্রাণত্যাগ না করা পর্যন্ত লড়াই থামে না। এদের মধ্যে পুরুষ মাকড়সার সংখ্যা খুবই কম। তারাও কদাচিৎ ছোট ছোট গর্ত নির্মাণ করে। স্ত্রী-মাকড়সা গর্তের মধ্যেই আলাদা থলি বুনে তাতে ডিম পাড়ে। কুমারী অবস্থায় ডিম পাড়লে তা থেকে বাচ্চা উৎপন্ন হবে না বুঝেই বোধ হয় সেই ডিমগুলিকে নিজেই খেয়ে ফেলে। নিষিক্ত ডিম পাড়বার পর বাচ্চা বের না হওয়া পর্যন্ত সর্বদা তা আগলে বসে থাকে। বাচ্চাগুলি দুই মাস পরে খোলস বদলাতে সুরু করে এবং ছয়-সাত বার খোলস বদলাবার পর যৌবনে পদার্পণ করে।

দিনের বেলায় এদের গর্তের বাইরে না আসবার একটা প্রধান কারণ এই যে, এক জাতীয় কুমোরে-পোকা এদের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। ট্র্যাপ-ডোর-মাকড়সাকে দিনের বেলায় গর্তের বাইরে দেখতে পেলেই এই কুমোরে-পোকা তাকে আক্রমণ করে এবং উভয়ে জড়াজড়ি করতে করতে গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কুমোরে-পোকার সঙ্গে মাকড়সা এঁটে উঠতে পারে না। বারংবার হুল ফুটিয়ে তাকে অসাড় করে ফেলে এবং তার শরীরে একটি ডিম পেড়ে চলে যায়। এই ডিম থেকে যথাসময়ে কীড়া ফুটে মাকড়সার দেহ উদরসাৎ করতে থাকে এবং যথাসময়ে পূর্ণাঙ্গ কুমোরে-পোকা রূপে মাকড়সার গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। মাকড়সা বাসা ছেড়ে বাইরে না এলে কিন্তু কুমোরে-পোকা তাকে আক্রমণ করে না; কারণ অর্ধোন্মুক্ত দরজার ফাঁকে আক্রমণ করলে গর্তের ডালা বন্ধ হয়ে কুমোরে-পোকার আর বেরোবার উপায় থাকে না।

## তাঁতী-বৌ মাকড়সা

গল্পে আছে—পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গেরা একবার সকলে মিলে সৃষ্টিকর্তার কাছে মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল। সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণকালে একমাত্র মাকড়সাই নাকি বলেছিল যে, মানুষের মত এমন নিরীহ প্রাণী আর নেই, আমি এত বড় জাল পেতে রাখি, কই কখনও তো একটা মানুষকে আমার জালে পড়তে দেখি নি!

গল্পে যাই থাকুক, দু-এক জাতের বিষাক্ত মাকড়সা ছাড়া সাধারণতঃ এরা মানুষের অপকার তো করেই না, বরং মশা, মাছি প্রভৃতি অনিষ্টককারী কীট-পতঙ্গ শিকার করে মানুষের উপকারই করে থাকে। তাছাড়া মাকড়সা সম্বন্ধে এমন অনেক কাহিনী শোনা যায়, যাতে স্বভাবতঃই এই প্রাণীদের প্রতি একটা সহৃদয় মনোভাব জাগ্রত হওয়াই উচিত।

শোনা যায়, সিপাহী-বিদ্রোহের সময় নাকি কানপুরে কয়েকজন পলাতক ইংরেজ সিপাহীদের ভয়ে অতি কষ্টে পাচিল টপকে একটা পরিত্যক্ত শস্যাগারে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। শস্যাগারটি অনেকদিন অব্যবহার্য অবস্থায় ছিল বলে কপাট শক্তভাবে এঁটে গিয়েছিল। অতিকষ্টে তারা একখানা মাত্র কপাট অল্প একটু ফাঁক করে তার মধ্যে ঢুকে আত্মগোপন করেছিল। ভুলেই হোক বা অসামর্থ্যের দরুণই হোক দরজাটা আর বন্ধ করা সম্ভব হয় নি। কপাটটা আধ খোলা অবস্থায়ই ছিল। উন্মত্ত সিপাহীরা পলাতকদের সন্ধানে সেই স্থানে এসে একখানা তক্তার সাহায্যে পাচিলের উপর উঠে দেখলো, শস্যাগারের দরজা

আধ খোলা রয়েছে। এতে তাদের দৃঢ় ধারণা হলো যে, পলাতকেরা নিশ্চয়ই ওখানে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু সেখানে অবতরণ করা সহজ নয় বলে সিপাইরা নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলো। এমন সময় একজন সিপাহীর নজরে পড়লো—সেই অর্ধোন্মুক্ত কপাটের ফাঁকে একটা মাকড়সার জাল বিস্তৃত রয়েছে। কপাটের ফাঁকে মাকড়সার অক্ষত জাল দেখে তাদের ধারণা হলো যে, দু-এক দিনের মধ্যে এখানে কোনও লোক প্রবেশ করে নি। কাজেই তারা আর অগ্রসর না হয়ে ফিরে গেল। মাকড়সার জালই সেই যাত্রায় এতগুলি বিপন্ন লোকের প্রাণ রক্ষা করেছিল।

শোনা যায়, হজরত মোহাম্মদ যখন মদিনায় এক গুহার মধ্যে লুক্কায়িতভাবে অবস্থান করছিলেন, তখন আততায়ীরা তাঁর সন্ধানে সেই গুহাদ্বারে উপস্থিত হয়ে দেখতে পায়, গুহার প্রবেশ পথে মাকড়সার জাল বিস্তৃত রয়েছে। দু-এক দিনের মধ্যে কেউ এই গুহায় প্রবেশ করে থাকলে মাকড়সার জাল থাকতে পারতো না—একথা ভেবে আততায়ীরা তখন তাঁর সন্ধানে অন্য দিকে চলে গেল। মাকড়সার জালই সেই যাত্রায় মহাপুরুষের প্রাণ রক্ষার কারণ হয়েছিল।

পিপীলিকার মত পরিশ্রমী ও মৌমাছির মত সঞ্চয়ী হওয়ার উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে মাকড়সার মত অধ্যবসায়ী হবার উপদেশও অহরহই শুনতে পাওয়া যায়। অধ্যবসায় সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই রবার্ট ব্রুস ও মাকড়সার অধ্যবসায়ের গল্পটি মনে পড়ে। স্কটল্যাণ্ডের অধিপতি রবার্ট ব্রুস শত্রুর হস্তে বার বার পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। এই সময় ক্ষুদ্র একটা মাকড়সার অধ্যবসায় দৃষ্টে অনুপ্রাণিত হয়ে সর্বশেষে শত্রুর কবল থেকে দেশকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এসব কথা বাদ দিলেও জীবতত্ত্ব ও ব্যবহারিক জীবনের কোনও কোনও দিক থেকে মাকড়সার জীবন আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

আমাদের দেশে শত শত বিভিন্ন জাতীয় মাকড়সা দেখতে পাওয়া যায়। তাদের দৈহিক গঠন ও জীবনযাত্রা প্রণালী বৈচিত্র্যময়। এদের মধ্যে

অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের কয়েক জাতের মাকড়সা মাত্র আমাদের নজরে পড়ে, বাকী অধিকসংখ্যক মাকড়সাকেই যত্ন করে খুঁজে বার করতে হয়। এস্থলে সাধারণের পরিচিত তাঁতী-বৌ নামে এ-দেশীয় একপ্রকার বিচিত্র বর্ণের মাকড়সার কথা আলোচনা করছি।

আমাদের দেশে বনে-জঙ্গলে ঝোপ-ঝাড়ের আশেপাশে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় মাটি থেকে প্রায় দু-দিন হাত উঁচুতে একপ্রকার বড় বড় মাকড়সার জাল দেখা যায়। জালের মধ্যস্থলে খুব মোটা সাদা সুতায় বোনা X চিহ্নের মত প্রায় দুই ইঞ্চি আড়াই ইঞ্চি লম্বা একটা স্থান থাকে। প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা একপ্রকার মাকড়সাকে দুটি দুটি পা জোড়া করে সেই X-চিহ্নিত স্থানের উপর নীচের দিকে মুখ করে বসে থাকতে দেখা যায়। মাকড়সাটি কালো হলেও তার পিঠের উপরের পাশাপাশি মোটা হলদে রঙের দাগ দুটির দরুণ এর্কে খুবই সুন্দর দেখায়। দিনের বেলায় প্রায় অধিকাংশ সময়েই এরা জলের মধ্যস্থলে ঐরূপ নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকে। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই এদের কর্মব্যস্ততা সুরু হয়! রাত্রিচর কীটপতঙ্গই বেশীর ভাগ এদের জালে আট্‌কে পড়ে থাকে, অবশ্য দিনের বেলায়ও ফড়িং, প্রজাপতি প্রভৃতি যে দুই-একটা জালে না-পড়ে, এমন নয়। স্ত্রী-মাকড়সা দেখেই এই মাকড়সার জাতি নির্ণীত হয়ে থাকে। কারণ এদের পুং-মাকড়সা অতি ক্ষুদ্রকায় হইয়া থাকে এবং প্রায়ই নজরে পড়ে না। এদের স্ত্রী-মাকড়সাই সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে। জালই এদের খাদ্যসংগ্রহের প্রধান উপায়। কীটপতঙ্গের রস চুষে খেয়েই এরা জীবনধারণ করে। কিন্তু মৃত প্রাণীর দেহ এরা স্পর্শও করে না। কীট-পতঙ্গ ধরবার জন্যে এরা উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে এমন অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে জাল বোনে যে, দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এদের জাল বোনার কৌশল দেখেই হয়তো কেউ কেউ এই জাতীয় মাকড়সাকে তাঁতী-বৌ মাকড়সা নাম দিয়েছে! আমরাও একে এই নামেই অভিহিত করবো।

তাঁতী-বৌ ঝোপ-ঝাড় বা বড় গাছের নীচে শিকার ধরবার উপযোগী কোনও নির্জন ফাঁকা জায়গা পেলেই গাছের পাতায় এসে শরীরের

পশ্চাদ্দেশ পাতার গায়ে ঠেকিয়ে আঠালো সূতা আট্‌কে দেয় এবং মাথা নীচু করে হাত-পা ছড়িয়ে ক্রমশঃ সূতা ছেড়ে নীচে নামতে থাকে। নীচে নামবার সময় পিছনের এক পা দিয়ে সূতাটিকে ধরে থাকে এবং প্রয়োজনমত যে কোনও স্থানে ঝুলে থাকতে পারে। পায়ের ডগায় আঁকসির মত সূক্ষ্ম বাঁকানো নখ আছে—এই নখের সাহায্যেই হাতের আঙুলের মত সূতা ধরে ওঠা-নামা করতে পারে।

মাকড়সাটা নীচু গাছের উপর থাকলে কোনও ডাল বা পাতার প্রান্তভাগে এসে শরীরের পশ্চাদ্ভাগ উঁচু করে হাওয়ার মধ্যে সূতা ছাড়তে থাকে। অতি মৃদু বাতাসের মধ্যেই সূতার মুক্ত প্রান্ত ইতস্ততঃ উড়তে উড়তে উপরের বা আশেপাশের কোনও লতাপাতার গায়ে ঠেকে আট্‌কে যায়। তখন মাকড়সা পিছনের পা দিয়ে সূতাটাকে টেনে দেখে—কিছুতে আট্‌কেছে কি না। ঢিলা থাকলে মধ্যের দুই পা দিয়ে সূতা গুটাতে গুটাতে তাকে টান করে শরীরের পশ্চাদ্ভাগের সাহায্যে পাতা বা অন্যান্য কিছুর সঙ্গে এঁটে দেয় এবং সেই সূতার উপর অতি দ্রুত গতিতে হেঁটে উপরে উঠে যায় এবং সেই প্রান্তের বাঁধন শক্ত করে দিয়ে আবার সেই সূতা ধরেই নীচে নামতে থাকে। এবার সূতার মাঝামাঝি গিয়েই থেমে যায় এবং শরীরের পশ্চাদ্ভাগ উঁচু করে পুনরায় সূতা ছাড়তে থাকে। খুব কাছাকাছি কোনও অবলম্বন না থাকলে কখনও কখনও দশ-বারো হাত বা তারও বেশী লম্বা সূতা বের করে দেয়। সূতার মুক্ত প্রান্ত বাতাসে উড়তে উড়তে যে-কোনও একটা গাছপালার সঙ্গে আট্‌কে যায়। এইরূপে ঘুরে ফিরে চতুর্দিকেই সূতা চালাতে থাকে। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই ছাতার শলার মত চতুর্দিকে টানা দিয়ে জালের একটা মোটামুটি কাঠামো তৈরী হয়ে যায়। উঁচু গাছে থাকলে নীচের গাছের সঙ্গে টানা দেবার প্রয়োজন। মাকড়সার জাল বোনবার কৌশল প্রত্যক্ষ করবার পূর্বে মোটেই ধারণা করতে পারি নি যে, দশ-বারো হাত ব্যবধানে অবস্থিত দুটি গাছের সঙ্গে প্রথমে এরা কি উপায়ে সূতা জুড়ে দেয়। অনেক চেষ্টার ফলে পরে বুঝা গেল—উঁচু গাছে অবস্থিত মাকড়সাটি পাতার প্রান্তভাগে এসে প্রথমে

দেহের পশ্চাদ্ভাগ পাতায় ঠেকিয়ে দিতেই সূতার মুখটি তার সঙ্গে সিমেণ্টের মত এঁটে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সে হাত-পা প্রসারিত করে সূতা ছাড়তে ছাড়তে ধীরে ধীরে নীচে নামতে থাকে। নীচে নামবার সময় পিছনের একটা পায়ের নখ দিয়ে বরাবরই সূতাটাকে আলতোভাবে ধরে থাকে। নামতে নামতে আর বেশী দূর অগ্রসর হওয়া উচিত কিনা, বোধ হয় তা ভেবে দেখবার জন্যে মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্যে থেমে থাকে। অবশেষে যে কোনও একটা লতাপাতায় উপরে অবতরণ করে সূতার প্রান্তভাগ তাতে জুড়ে দেয়। কিছুক্ষণ পরেই আবার সেই সূতা ধরে মাঝামাঝি স্থানে উঠে যায় এবং বাতাসের মধ্যে চতুর্দিকে সূতা ছেড়ে জালের কাঠামো তৈরী করে। যদি কোনও টানা অসমতল অবস্থায় থাকে, তাহলে সেটাকে কেটে দেয়। তবে সাধারণতঃ এরূপ বড়-একটা ঘটে না। টানাগুলি সামান্য অসমতল হলে পড়েনের টানে পরে ঠিক হয়ে যায়। চতুর্দিকের টানাগুলি ঠিক হয়ে গেলে, মাকড়সা যে কোনও একটি টানা বেয়ে উপরে উঠে যায় এবং সেই টানার প্রান্তদেশে নতুন সূতা আট্‌কে পিছনের পা দিয়ে সেটা উঁচু করে ধরে জালের কেন্দ্রস্থলে নেমে আসে। তারপর নিকটবর্তী আর একটি টানা বেয়ে উপরে ওঠে এবং পায়ের সাহায্যে পূর্বোক্ত সূতাটিকে এই টানার প্রান্তভাগে এঁটে দেয়। এইরূপে পর পর প্রতেকটি টানার প্রান্তভাগে বৃত্তাকারে সূতা জুড়ে কেন্দ্রাভিমুখে বৃত্তের পরিধি ক্রমশঃ ছোট করতে থাকে। বাইরের দিকের সবচেয়ে বড় বৃত্তটি বুনতে একটু অসুবিধা ভোগ করতে হয়; সেই সূত্র অবলম্বন করে ক্রমশঃ জিলিপীর প্যাঁচের মত ভিতরের দিকে সূতা বুনতে আর কোনই অসুবিধা হয় না। যাঁরা পাড়াগাঁয়ের তাঁতীদের কাপড় বোনা দেখেছেন, জানেন, তাঁত বোনবার পূর্বে সূতা পাট করবার সময় চার কোণে চারটি খুঁটি পুঁতে তাঁতী-বৌয়েরা বাঁ-হাতের একটা বড় চরকী থেকে ডান হাতে একটা লম্বা লাঠির সাহায্যে কিরূপ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সূতা জড়িয়ে দেয়। টানার উপর দিয়ে জাল বোনবার সময় মাকড়সারা পিছনের একটি পায়ের সাহায্যে ঠিক তাঁতী-বৌদের মতই ক্ষিপ্রগতিতে সূতা জড়াতে থাকে। জাল বোনবার সময়

তার বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী প্রত্যক্ষ করবার বিষয়। জাল বোনা হয়ে গেলে, প্রত্যেক কোণের দুটি পাশাপাশি টানাকে একত্রিত করে জালের মধ্যেস্থলে ফিতার মত চওড়া সূতার সাহায্যে করাতের দাঁতের মত আঁকাবাঁকা ভাবে জুড়ে দেয়। মোটা সূতায় বোনা জালের মধ্যস্থিত এই চওড়া স্থানটিকে প্রায় আড়াই বা তিন ইঞ্চি লম্বা একটা X চিহ্নের মত দেখায়। মাকড়সা পা জোড়া জোড়া করে উক্ত চিহ্নের সঙ্গে দেহের আকারের তারতম্য অনুসারে ঐ স্থানেই নীচের দিকে মুখ করে শিকারের জন্যে সর্বদা ওৎ পেতে বসে থাকে। একখানি জাল বুনে শেষ করতে আধ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। এরা ইচ্ছামত মোটা, সাদা বা আঠালো সূতা বের করতে পারে। জাল বুনতে সাধারণতঃ এই তিন প্রকারের সূতারই প্রয়োজন হয়। টানাগুলি ও বাইরের কয়েকটি বৃত্তের সূতা সাদা, তাতে আঠালো পদার্থ থাকে না। তার পর থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সব সূতাই আঠালো। বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, সূতার গায়ে বিন্দু বিন্দু অসংখ্য আঠালো পদার্থ রয়েছে, কীটপতঙ্গ তাতে পড়লেই আট্‌কে যায়। মধ্যস্থলে আসন তৈরী করবার জন্যে একসঙ্গে অনেকগুলি সূতা পাশাপাশি ভাবে বের করে ফিতার মত। সেগুলি ওদের মোটা সূতা, ভয়ানক চট্‌চটে। শিকার জালে পড়লে প্রথমে এই মোটা সূতার সাহায্যেই জড়িয়ে থাকে।

ফড়িং বা অন্য কোনও বৃহদাকৃতির পতঙ্গ জালে পড়বামাত্রই আট্‌কে যায় এবং মুক্ত হবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে। ফলে জালটা ভয়ানক আন্দোলিত হতে থাকে। সেই আন্দোলনের তীব্রতায় মাকড়সা বুঝতে পারে—শিকার দুর্বল কি সবল। দুর্বল ও ক্ষুদ্র শিকার জালে পড়বামাত্রই সে ছুটে গিয়ে তাকে সূতা জড়িয়ে পুটলি করে মুখে করে নিয়ে এসে জালের মধ্যস্থলে বসে তৎক্ষণাৎ খেতে আরম্ভ করে দেয়। শিকার বড় হলে—মাকড়সা অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে পর্যবেক্ষণ করে অথবা সময় সময় জালের মধ্যস্থিত আসন ছেড়ে জালের এক কোণে গিয়ে গুটিসুটি হয়ে বসে থাকে। কিছুক্ষণ আস্ফালনের পর শিকার হয়রান হয়ে একটু চুপ করবামাত্রই সে এক-পা দু-পা করে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হয়ে হঠাৎ

তার উপর লাফিয়ে পড়ে। পিছনের দুই পায়ের সাহায্যে চওড়া সূতার ফালিগুলি যেন ছুড়ে ছুড়ে মারতে থাকে। দেখতে দেখতে শিকারের চতুর্দিক সাদা সূতায় জড়িয়ে যায়, তখন তার আর বেশী আস্ফালন করবার সামর্থ্য থাকে না। তখন মধ্যের দু-পা ও পিছনের দু-পায়ের সাহায্যে শিকারটাকে চাকির মত ঘোরাতে ঘোরাতে ফিতার মত চওড়া সূতায় আগাগোড়া ঠিক পুঁটুলির মত মুড়ে ফেলে। শিকার তখনও সূতার পুঁটুলির মধ্যে কাঁপতে থাকে; কাজেই তাকে জালের সেইস্থানেই ঝুলিয়ে রেখে একটি সূতার লাইন গেঁথে সে নিজ স্থানে এসে এমন অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করতে থাকে যে, সমগ্র জালখানি সামনে ও পিছনে কিছুক্ষণ পর্যন্ত ভয়ানকভাবে দুলতে থাকে। আট পায়ের উপর শরীরটাকে উঁচু করে তৎক্ষণাৎ আবার নামিয়ে নেয়। পাঁচ-সাত বার এরূপ করবার পর চুপ করে বসে থাকে। ব্যাপারটা যেন জয়ের উল্লাস বলেই মনে হয়। পনেরো-বিশ মিনিট পরে পুঁটুলিটি জালের মধ্যস্থলে নামিয়ে এনে সূত্রাবরণের ভিতর দিয়ে তীক্ষ্ণ দাঁত ফুটিয়ে রস চুষে খেতে থাকে। শরীরের রস নিঃশেষিত হলে খোলসটাকে জাল থেকে নীচে ফেলে দেয় এবং চুপ করে বিশ্রাম করে। আবার সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে জালের ছিন্ন অংশ মেরামত করে নতুন শিকারের আশায় ওৎ পেতে বসে থাকে। আশ্চর্যের বিষয়—মৃত কীটপতঙ্গ জালে ফেলে দিলে তা খাওয়া দূরে থাকুক, মোটেই গ্রাহ্য করে না। কিছুক্ষণ পরে এসে মৃত পতঙ্গটাকে জাল থেকে নীচে ফেলে দেয়। সময়ে সময়ে ছোট ছোট টিকটিকি, গিরগিটি এদের জালে আট্‌কা পড়ে যায় এবং মাকড়সা তাদের রস চুষে খেয়ে থাকে।

মাকড়সারা অনেকদিন পর্যন্ত অনাহারে কাটিয়ে দিতে পারে। রোজই যে এদের জালে শিকার পড়ে, তা নয়। শিকারের আশায় হয়তো একাদিক্রমে কয়েকদিন জাল পেতে বসে থাকে। একটা জাল তিন-চার দিনের বেশী শিকার ধরবার উপযুক্ত থাকে না, কারণ ধূলাবালি উড়ে এসে অথবা রোদে শুকিয়ে জালের আঠা শক্ত হয়ে যায়, তখন বাধ্য হয়েই নতুন জাল বুনতে হয়। কোনও স্থানে দু-চারদিন শিকার না জুটলে, টানাগুলি কেটে সম্পূর্ণ জালটাকে গুটিয়ে নিয়ে অন্যত্র চলে যায়। হয়তো জালের সূতাগুলিকে খেয়ে

ফেলে। সময়ে সময়ে কোনও প্রবল মাকড়সা এসে অপেক্ষাকৃত দুর্বল মাকড়সার জালে পড়ে এবং জালের মালিককে যুদ্ধে হারিয়ে তার স্থান অধিকার করে বসে। মারামারির ফলে উভয়েরই হয়তো দু-একখানা ঠ্যাং ছিঁড়ে যায় ; কিন্তু কালক্রমে সেই স্থলে আবার নতুন ঠ্যাং গজায়।

এরা জালের যে কোনও একস্থানে ছোট্ট একটি থলি গেঁথে তার মধ্যে শতাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম পেড়ে রাখে। থলির মধ্যেই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় এবং এলোমেলো ভাবে একসঙ্গে তাদের দেহ নিঃসৃত সূক্ষ্ম সুতার সঙ্গে ঝুলতে থাকে। দু-তিন দিনের মধ্যেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, নানা স্থানে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, বাচ্চাগুলি যে কোনও একটু উঁচু স্থানে উঠে শরীরের পশ্চাদ্ভাগ বাতাসের দিকে উঁচু করে সুতা ছাড়তে থাকে। অনেক সময় বাতাসের টানে সে সুতা অনেক দূরে চলে যায়। সেই সুতায় ভর করে তারা বহু দূরে উড়ে গিয়ে নতুন নতুন জালের পত্তন করে। শরীর একটু পুষ্ট হলেই খোলস পরিত্যাগ করে। এরূপ ছয়-সাতবার খোলস বদল করে এরা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। পূর্ণ পরিণতির পর আর খোলস পরিত্যাগ করে না।

পরিণত বয়সে তাঁতী-বৌ মাকড়সা বেশ পোষ মানে এবং প্রায়ই নির্দিষ্ট স্থানে জাল পেতে অবস্থান করে। জাল ছিঁড়ে দিলেও অনেক সময় পুনরায় সেই স্থানেই জাল পেতে রাখে।

## বাংলা দেশের মৎস্য-শিকারী মাকড়সা

১৯৩১ সালের মার্চ মাসের প্রথম ভাগে কলকাতার উপকণ্ঠে একটি বদ্ধ জলাশয়ে ধূসর রঙের একটি মাকড়সার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। জলাশয়টি নানা রকম জলজ উদ্ভিদ ও একপ্রকার বড় বড় শালুক পাতায় পরিপূর্ণ ছিল, তারই একটি পাতার উপর মাকড়সাটা ভিন্ন জাতীয় আর একটা মাকড়সাকে তীক্ষ্ণ দাঁত ফুটিয়ে অসাড় করে আস্তে আস্তে তার রস চুষে খাচ্ছিল। এই অবস্থায় মাকড়সাটাকে ধরবার উপক্রম করতেই সেটা ছুটে পালিয়ে গেল। তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ ছুটাছুটির পর ক্লান্ত হয়ে মাকড়সাটা পা গুটিয়ে মৃত্যুর ভাণ করে জলের উপর চিৎ হয়ে ভাসতে লাগলো। তখন সেটাকে ধরবার জন্যে যেই হাত বাড়িয়েছি, অমনি আমার চোখের সামনে হঠাৎ কোথায় যেন সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল। এই হঠাৎ অদৃশ্য হবার কারণ অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছি যে, এই উভচর মাকড়সা সুদক্ষ ডুবুরী; জলের নীচে দশ-পনেরো মিনিট পর্যন্ত অবলীলাক্রমে ডুবে থাকতে পারে।

দিনের বেলায় অধিকাংশ সময় এরা জলের উপর কাটায়। অনেক সময় জলজ উদ্ভিদের পাতার উপর বিশ্রাম করে, আবার কখনও কখনও জলের উপর ছুটাছুটি করে বেড়ায়। দিবাবসানে সাধারণতঃ এরা জলাশয়ের পাড়ে ঘাসপাতার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। কখনও কখনও আবার পুকুর ধারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইট, কাঠ বা খোলামকুচির তলায় অথবা ছোট ছোট

গর্তে লুকিয়ে থাকে। দিনের আলো এরা খুবই ভালবাসে, কিন্তু দুপুরের প্রখর রোদের সময় ঝোপঝাড়ের অন্তরালে বা ছায়ার নীচে অবস্থান করে। পুকুরের পরিষ্কার জলের উপর দিয়ে সময় সময় দ্রুতগতিতে লাফিয়ে লাফিয়ে বহুদূর অতিক্রম করে যেতে পারে। চলবার সময় জলের উপর থেমে থাকলে শরীরের ভরে পায়ের নীচে জল একটু টোল খেয়ে যায় মাত্র ; জলের উপরের পাত্‌লা পর্দা ছিন্ন করে পা জলের ভিতর ডুবে যায় না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এদের জলের নীচে ডুবে থাকবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। কোন প্রকার ভয়ের কারণ উপস্থিত হলে অথবা শত্রুর নিকট থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্ত এরা জলের নীচে ডুব দিয়ে ঘাসপাতা আঁকড়ে ধরে থাকে। শরীরের চতুর্দিকের বাতাসের আস্তরণ ভেদ করে জল এদের গায়ে লাগতে পারে না এবং এই জন্যে জলের নীচে রূপালী রঙের মত ঝকঝকে দেখায়। ধাত্রী মাকড়সাও ভয় পেলে তার ডিম অথবা পিঠের উপর অবস্থিত বাচ্চাগুলিকে নিয়ে জলের তলায় ডুব দেয় এবং জলজ লতাপাতার গা বেয়ে এক স্থান থেকে অন্য নিরাপদ স্থানে গিয়ে অনেক সময় পর্যন্ত আত্মগোপন করে থাকে।

এরা সাধারণতঃ নানাপ্রকার ছোট ছোট পতঙ্গ এবং একপ্রকার জল-মক্ষিকা শিকার করে বেড়ায়। এই জল-মক্ষিকাগুলিকে অনেক সময় দলবদ্ধ-ভাবে জলের উপর ভেসে বেড়াতে দেখা যায়। এই মাকড়সারা প্রায়ই দুর্বল স্বজাতীয় মাকড়সাদের খেয়ে ফেলে। স্ত্রী মাকড়সারাই এই বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী, এমন কি, সুযোগ পেলেই তারা পুরুষ মাকড়সাকে ধরে উদরস্থ করে।

এই মাকড়সারা সুদক্ষ শিকারী এবং এদের কৌশলও অদ্ভুত। এরা কিরূপ ধৈর্যের সঙ্গে শিকারের উপর লাফিয়ে পড়বার সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকে এবং কিরূপ সন্তর্পণে শিকারকে অনুসরণ করে, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই ক্ষুদ্র প্রাণী কিরূপ অব্যর্থ কৌশলে নিজের শরীরের অনুপাতে বড় শিকারকে দাঁত ফুটিয়ে অনায়াসে আয়ত্ত করে ফেলে।

দমদমের নিকটবর্তী একটি জলাশয়ে এই জাতীয় অনেক ডুবুরী মাকড়সা দেখে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলাম। দেখলাম, ছোট ছোট অনেক তেচোখো মাছও পুকুরের আশেপাশে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। একটু ভয়ের কারণ বুঝলেই মাছগুলি ভাসমান শালুক পাতার নীচে গিয়ে লুকিয়ে পড়ছিল এবং একটু পরেই আবার বেরিয়ে আসছিল। এক জায়গায় দেখলাম ছোট্ট একটা শালুক পাতার চারিদিকে কয়েকটি ছোট-ছোট মাছ কি যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। আর পাতাটার উপর প্রায় মধ্যস্থলে একটা ধাড়ী মাকড়সা অনেকক্ষণ ধরে চুপটি করে বসে তাদের লক্ষ্য করছে। হঠাৎ কেউ দেখলে মাকড়সাটার দুরভিসন্ধির কোন লক্ষণই খুঁজে পেত না, নিশ্চয়ই মনে হতো যেন মাছগুলির উপর তার মোটেই লক্ষ্য নেই। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটি সম্পূর্ণ বিপরীত ; কারণ একটু অপেক্ষা করবার পরেই লক্ষ্য করলাম—মাকড়সাটা মাঝে মাঝে থেমে থেমে খুব সন্তর্পণে পা ফেলে আস্তে আস্তে পাতার ধারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। খুব কাছে এসেই হঠাৎ একটা মাছের উপর লাফিয়ে পড়ে বিষ-দাঁত ফুটিয়ে দিল। ছাড়াবার জন্যে মাছটাও আপ্রাণ চেষ্টা করেও কিছুতেই কৃতকার্য হতে পারলো না। অবশেষে মাকড়সা মাছটাকে পাতার উপর টেনে তুলে কাম্‌ড়ে ধরেই রইলো। আরও কিছুক্ষণ ছটফট করে মাছটা ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে মৃত্যু বরণ করলো। এই মাছটা প্রায় পৌনে এক ইঞ্চি লম্বা ছিল।

আরও বিশদভাব পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে একটা কাচের চৌবাচ্চার মধ্যে কিছু জলজ উদ্ভিদ ও অল্প জলের মধ্যে কয়েকটি তেচোখো মাছ রেখে কয়েকটা মাকড়সা ধরে এনে ছেড়ে দিয়েছিলাম। কাচের চৌবাচ্চাটির মসৃণ গা বেয়ে উঠে মাকড়সাগুলির পালিয়ে যাবার উপায় ছিল না। তৃতীয় দিনে দেখলাম, একটি মাছ কমে গেছে। মাছের সংখ্যা ক্রমশঃ কমতে কমতে দশ দিন পর দেখা গেল একটি মাছও অবশিষ্ট নেই। এতে পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে, মাকড়সারাই মাছগুলিকে নিঃশেষ করেছে।

স্বাভাবিক অবস্থায় এদের মাছ ধরা ও খাবার আলোকচিত্র গ্রহণ করা নানা কারণে অত্যন্ত অসুবিধাজনক এবং একরূপ অসম্ভব বলেই মনে হয়ে-

ছিল। অবশেষে নিম্নোক্ত উপায়ে উহাদের এই অবস্থার ছবি তুলতে সফল হয়েছিলাম। জলভর্তি একটা কাচের চৌবাচ্চার মধ্যে কয়েকটা মাকড়সা রেখে দিয়ে বেশ কয়েক দিন অভুক্ত অবস্থায় রেখে দিলাম। কয়েকদিন কিছু খেতে না পেয়ে ওরা অতিমাত্রায় ক্ষুধার্ত হয়ে উঠেছিল। তখন ঐ পাত্রের মধ্যে কয়েকটা তেচোখো মাছ ছেড়ে দেবার পর অল্পক্ষণের মধ্যেই দুটি মাকড়সা দুটি মাছকে বিষ-দাঁত বিদ্ধ করে পাতার উপর তুলে ফেললো। পূর্বেই ক্যামেরাটিকে সুবিধামত ভাবে কাচ পাত্রের উপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কাজেই সঙ্গে সঙ্গে ছবি তুলে নিতে আর কোন অসুবিধাই ঘটে নি।

মাছটাকে পাতার উপর টেনে তোলবার পর জোরে শব্দ করায়, মাকড়সাটা ভয় পেয়ে মাছটাকে ছেড়ে দিয়ে এক পাশে বসে রইলো।

## মাকড়সার নাচ

ময়ূর, পায়রা ও চড়ুই পাখীর নাচ দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই। বিশেষ করে কবিরা তো ময়ূরের নৃত্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু কীট-পতঙ্গ শ্রেণীর মধ্যে মাকড়সার নৃত্যভঙ্গী দেখলে বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না। আমাদের দেশে খাল, বিল, পুকুরে জলজ ঘাসপাতার উপরে, পায়ে ডোরা-কাটা, ধূসর রঙের এক প্রকার ডুবুরি মাকড়সা দেখা যায়। এই জাতের পুরুষ মাকড়সারা স্ত্রী-মাকড়সা অপেক্ষা আকারে কিছুটা ছোট। পুরুষ মাকড়সার গায়ের রং কালো। পা ছাড়া মুখের কাছে হাতের মত ছোট ছোট দুটি উপাঙ্গ আছে। তাদের অগ্রভাগ মিশমিশে কালো; কিন্তু গোড়ার দিকটা ধবধবে সাদা। স্ত্রী-মাকড়সা দেখতে পেলেই এরা ছুটাছুটি বন্ধ করে অতি সন্তর্পণে পিছন দিক থেকে তার নিকটে অগ্রসর হতে থাকে। স্ত্রী-মাকড়সার নিকট থেকে চার-পাঁচ ইঞ্চি দূরে থাকতেই শরীরটাকে একবার উঁচু ও একবার নীচু করে স্ত্রী-মাকড়সার চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচ সুরু করে দেয়। সেই অদ্ভুত ভঙ্গীর নাচ প্রত্যক্ষ না করলে লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। এইভাবে প্রায় ২।৩ ইঞ্চি দূরত্ব রক্ষা করে বার বার স্ত্রী-মাকড়সাকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। স্ত্রী-মাকড়সাটি কিন্তু একস্থানে চুপ করে বসেই এই নাচ দেখে। নৃত্য করতে করতে বৃত্তের পরিধি ক্রমশঃ কমাতে থাকে। অপেক্ষাকৃত নিকটে এলেই মুখের সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র উপাঙ্গ দুটিকে ঠিক হাত-জোড়ের মত করে উপরে তোলে এবং পরক্ষণেই দুটিকে দু-দিকে প্রসারিত

করে নীচে নামিয়ে আনে। আগেকার দিনে নবাব-বাদশাদের দরবারে যেরূপ কুর্ণিশ করবার প্রথা ছিল, যেন হুবহু সেই কুর্ণিশের কায়দায় পুরুষ-মাকড়সা, মাকড়সা-রাণীর তোয়াজ করে। এইরূপ কুর্ণিশ করতে করতে মাঝে মাঝে নৃত্যভঙ্গী বদল করে পাগুলি কাঁপাতে কাঁপাতে একটু একটু করে তার কাছে ঘেঁষতে থাকে।

## চোর মাকড়সা

নেকড়ে মাকড়সা

আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই ঘরের দেয়াল, মেঝে বা বেড়ার গায়ে আধ ইঞ্চি লম্বা, পিঠের উভয় পার্শ্ব কালো ডোরাওয়ালা নেকড়ে মাকড়সা নামে ছোট ছোট একপ্রকার মাকড়সা দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ এরা দিনের বেলায় মাছি শিকার করেই জীবনধারণ করে। সন্ধ্যার পূর্বেই এরা নিজ নিজ বাসায় প্রত্যাবর্তন করে অথবা কোনও নিরাপদ স্থানে চুপ করে বসে বিশ্রাম করে। এদের শিকার ধরবার কৌশল অতি অদ্ভুত। মেঝেতে মাছি বসতে দেখলেই মাকড়সা এক-পা দু-পা করে অতি সন্তর্পণে তার দিকে অগ্রসর হয়। কাছে এলে মাছির নজর এড়াবার জন্যে ঘুরে গিয়ে তার পিছন দিকে উপস্থিত হয় এবং সেখান থেকে শিকারের ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে। এই মাকড়সা প্রায় পনেরো-ষোলটি ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবার পর সেগুলি কয়েক দিন বাসার মধ্যেই অবস্থান করে। বাসা থেকে বেরিয়ে গেলে এদের পরস্পরের মধ্যে আর কোনও সম্বন্ধ থাকে না। অধিকাংশ বাচ্চারই প্রয়োজনানুরূপ শিকার ধরবার সুযোগ হয় না; কাজেই অনেকে অল্পাহারে বা অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই অবস্থায় বাধ্য হয়েই এরা চুরি করতে প্রবৃত্ত হয়।

আমাদের দেশে সর্বত্রই হলুদে রঙের একপ্রকার ক্ষুদে পিঁপড়ে দেখা যায়। তারা দলে দলে সার বেঁধে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে। প্রায়ই দেখা যায় হাজার হাজার পিঁপড়ে সার বেঁধে খাদ্য-কণা অথবা

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম মুখে করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করছে। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই পিঁপড়ের সারের আশেপাশে পূর্বোক্ত বাচ্চা মাকড়সার দু-একটা অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পিঁপড়েদের যাওয়া-আসা পর্যবেক্ষণ করছে অথবা কোন সুযোগের অপেক্ষায় এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছে। কোন একটি পিঁপড়ে যেই ডিম অথবা খাদ্য-কণা মুখে নিয়ে তাদের কারোর কাছ দিয়ে চলে যায়, অমনি মাকড়সাটা চক্ষের নিমেষে ছুটে গিয়ে তার মুখের জিনিষটি কেড়ে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে চম্পট দেয়। পিঁপড়ের সারের মধ্যে তখন হুলস্থূল পড়ে যায়। ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে তারা অপহরণকারীর পিছে তাড়া করে, কিন্তু মাকড়সার মত দ্রুতবেগে ছুটতে পারে না বলেই কোনও লাভ হয় না। ইতিমধ্যে মাকড়সা ক্ষিপ্রগতিতে অপহৃত বস্তু নিয়ে সরে পড়ে এবং সেটা উদরস্থ করে কিছুক্ষণ পরে আবার এসে খাবার ছিনিয়ে নেবার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে।

## মাকড়সার লড়াই

ঘরো মাকড়সা

আমাদের দেশে ঘরের দেয়ালে অথবা পরিত্যক্ত নির্জন স্থানে ধূসর রঙের বড় বড় একপ্রকার মাকড়সা দেখতে পাওয়া যায়। দিনের বেলায় এরা প্রায়ই একস্থানে পা ছড়িয়ে চুপ করে বসে থাকে। এরা রাত্রিচর প্রাণী ; রাতের অন্ধকারে আরশোলা, উইচিংড়ি প্রভৃতি শিকার করে বেড়ায়। অনেক সময় দেখা যায়—স্ত্রী-মাকড়সা গোল বিস্কুটের মত সাদা সাদা একটা ডিমের থলে বুকে আঁকড়ে ধরে এক জায়গায় চুপ করে বসে আছে। বুকে আটকানো বিস্কুটের মত গোলাকার জিনিষটা ডিম রাখবার থলে। এই থলের মধ্যে ১৫০ থেকে ২০০ হল্দে রঙের ডিম থাকে। ডিম থেকে বাচ্চা বের না হওয়া পর্যন্ত এরা থলে বুকে করে ঘোরাফেরা করে। কিছুদিন আগে একটা অপরিষ্কার ঘরের মধ্যে ঢুকে দেয়ালের দিকে তাকাতেই দেখা গেল, দুটা মাকড়সা প্রায় ৬।৭ ইঞ্চি ব্যবধানে অবস্থান করে মুখোমুখি চেয়ে আছে। দুটার বুকেই ডিম আট্কানো ছিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দুজনে একইভাবে আছে, কেউই নড়ছে না। তারপর হঠাৎ একটা মাকড়সা সামনের পা দুটা উঁচু করে অপরটার দিকে অগ্রসর হতেই সেটা একটু এদিক-ওদিক ঘুরে যেন পালাবার উদ্যোগই করছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পালালো না। সেস্থানে থেকেই সম্মুখের পা দুটাকে উঁচু করে অপেক্ষা করতে লাগলো। সেই অবস্থায় উভয়েই আরো কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল। তারপর প্রথম অগ্রগামী মাকড়সাটা হঠাৎ ছুটে এসে অপর মাকড়সাটার উপর পড়লো। প্রায় তিন-

চার সেকেণ্ড ধরে উভয়ের মধ্যে খুব কামড়া-কামড়ি চললো। তারপর আবার দুজনেই সরে দাঁড়ালো। দু-তিন মিনিট যেতে না যেতেই দুজনের মধ্যে আবার ভীষণ লড়াই বেধে গেল। ডিম কিন্তু কেউ ছাড়ে না। মুখের সম্মুখস্থ হুকের মত দুটি উপাঙ্গের সাহায্যে ডিম আঁক্‌ড়ে আছে। নীচে দেয়ালের গা ঘেঁষে একটা বড় এনামেলের গামলা ছিল। এই অবস্থায় উভয়ে জড়াজড়ি করে নীচের সেই গামলাটার মধ্যে পড়ে গেল। গামলার মধ্যে পড়েও জড়াজড়ি অবস্থায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত কামড়া-কামড়ি চললো। কামড়া-কামড়ির ফলে একটা মাকড়সার একটা ঠ্যাং ছিঁড়ে গেল, তবুও কিন্তু কোন পক্ষের পরাজয় স্বীকারের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে উভয়কে ছেড়ে দিয়ে পুনরায় নতুনভাবে আক্রমণ করবার জন্যে একটু দূরে গিয়ে মুখোমুখি ভাবে অপেক্ষা করতে লাগলো। প্রায় সাত-আট মিনিট এভাবে কাটবার পর আবার লড়াই সুরু হলো। ছিন্নপদ মাকড়সাটা বড়ই কাবু হয়ে পড়েছিল। অপর মাকড়সাটা সেটাকে চিৎ করে ফেলে বুকের কাছে দাঁত ফুটিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাম্‌ড়ে রইলো। পরাজিত মাকড়সাটার পাগুলি থরথর করে কাঁপছিল। কতক্ষণ পরে পাগুলিকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সংকুচিত ও প্রসারিত করতে লাগলো। তখনও কিন্তু ডিমটি তার বুকের উপরই চেপে ধরা ছিল। কিছুক্ষণ পর বিজেতা, পরাজিত মাকড়সাটার বুক থেকে ডিমটি কেড়ে নিয়ে পিছনের একটা ঠ্যাং দিয়ে আঁকড়ে ধরে পলায়নের উপক্রম করতে লাগলো; কিন্তু এনামেলের গামলার খাড়া পাড় বেয়ে উঠতে না পারায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাকে সেখানেই বন্দী হয়ে থাকতে হয়েছিল।

## প্যারাসুটিস্ট মাকড়সা

আগুন লাগলে উঁচু জায়গা থেকে লাফিয়ে নিরাপদে নিচে অবতরণ করবার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম প্যারাসুট ব্যবহৃত হয় ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে। অবশেষে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে বেলুন থেকে নিরাপদে লাফিয়ে পড়বার জন্যে প্যারাসুট ব্যবহারের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আকাশে উড়তে এবং এরোপ্লেন থেকে আরোহীদের ভূতলে অবতরণ করাবার জন্যে প্যারাসুটের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে। প্রকৃতি মানুষকে উড্ডয়নক্ষম করে গঠন করে নি। বুদ্ধিকৌশলে তারা আকাশে আধিপত্য বিস্তার করেছে তাদের প্রয়োজনের তাগিদে। কিন্তু বংশবিস্তার ও পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হবার জন্যে একটা দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জীবজগতে সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেকটি উদ্ভিদ, প্রত্যেকটি প্রাণী এই সহজাত সংস্কারবশে পরিচালিত হয়ে থাকে। এটাই জীবজগতের একটা সাধারণ নিয়ম। ওই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে প্রকৃতি বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীকে বিভিন্ন কৌশলের অধিকারী করেছে। ওড়বার ক্ষমতা তার মধ্যে অন্যতম। প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্যে মানুষের উদ্ভাবিত কৌশলসমূহ বুদ্ধিবৃত্তির অপূর্ব উৎকর্ষতার পরিচায়ক সন্দেহ নেই ; কিন্তু পক্ষবিহীন হয়েও প্রকৃতিদত্ত অদ্ভুত কৌশলে কোনও কোনও উদ্ভিদ-বীজ ও প্রাণী বাতাসে ভর করে যেভাবে দূরদূরান্তে আধিপত্য বিস্তার করে, তা যেমন বিস্ময়কর তেমনই কৌতুহলোদ্দীপক। আকন্দ, সোনালী, তুলা প্রভৃতির মত অনেক উদ্ভিদ-বীজের নাম করা যেতে পারে,

যারা প্রকৃতিদত্ত অপূর্ব কৌশলে বাতাসে ভর করে দূরদূরান্তরে বংশবিস্তার করে থাকে। কীটপতঙ্গের মধ্যে মাকড়সাদের এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা দেখা যায়। যারা মাকড়সার জীবনযাত্রাপ্রণালীর সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত নন, তারা একথা শুনে নিশ্চয়ই বিস্মিত হবেন যে, ডানাশূন্য প্রাণী হয়েও মাকড়সা আকাশে ভেসে বেড়াতে পারে। গ্লাইডারের সাহায্যে মানুষ যেমন বাতাসে ভেসে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে, বিমান ছত্রিকার সাহায্যে প্যারাসুটিস্ট যেমন বাতাসে ভর করে ধীরে ধীরে ভূতলে অবতরণ করে, পক্ষবিহীন হলেও মাকড়সা সেরূপ তার সূত্র অবলম্বনে হাওয়ায় ভেসে ইচ্ছামত যে কোনও দূরবর্তী স্থানে গিয়ে বসতি স্থাপন করে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ক্ষুদ্রকায় এবং বাচ্চা মাকড়সারাই কেবল এরূপ উড্ডয়নক্ষমতার অধিকারী। সাধারণ পরিণত বয়স্ক মাকড়সারা কিন্তু বাচ্চাদের মত এরূপ হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে পারে না। অবশ্য পরিণত বয়স্ক মাকড়সারা ইচ্ছা করলেই অল্প সময়ের মধ্যে সূত্রের সাহায্যে দূরতর স্থানে চলে যেতে কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ করে না।

মাকড়সা এক অদ্ভুত জীব। সাধারণ কীট-পতঙ্গের সঙ্গে এদের আকৃতি বা প্রকৃতিগত কোনই সামঞ্জস্য নেই। সাধারণ কীট-পতঙ্গের শরীর যেমন মাথা বুক ও পেট—এই তিন ভাগে বিভক্ত, মাকড়সার শারীরিক গঠন কিন্তু সেরূপ নয়। মাথা ও পেটই এদের শরীরের প্রধান অংশ। আটটি পা, আবার চোখও আটটি। পুং-জননেন্দ্রিয় দুটি; তাও আবার মস্তকের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। সর্বোপরি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—শরীরের পশ্চাদ্দেশ থেকে সূতা বের করে শিকার ধরবার উপযোগী সুদৃশ্য জাল বোনবার ক্ষমতা এবং সূতার সাহায্যে দ্রুতগতিতে স্থানান্তরে গমনাগমন করবার অপূর্ব ক্ষমতা।

'বুড়ীর-সূতা' হয়তো অনেকেই দেখেছেন, ইংরেজীতে যাকে বলে—Gossamer। অনেক সময় দেখা যায়—অতি সূক্ষ্ম লম্বা একফালি সূতা অথবা এলোমেলোভাবে একসঙ্গে জড়িত কতকগুলি সূতার ফালি হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। গল্পে আছে—চাঁদের মা বুড়ী বসে বসে রাত-দিন চরকায় সূতা কাটে। সেই সূতার বিচ্ছিন্ন বা কর্তিত অংশ হাওয়ায় উড়ে আসে।

এগুলিই হলো বুড়ীর-সূতা। প্রকৃত প্রস্তাবে এই বুড়ীর সূতাই বাচ্চা মাকড়সার প্যারাসুট। এই প্যারাসুট অবলম্বন করে বাচ্চা মাকড়সারা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

শ্রবণেন্দ্রিয় সম্পর্কিত গবেষণার ব্যাপারে মাকড়সা পোষবার প্রয়োজন হয়েছিল। জাল বুনে যাতে স্বচ্ছন্দ মনে বাস করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে পরীক্ষাগারে কতকগুলি ঝুলনো ফ্রেমের ব্যবস্থা করে তাদের প্রত্যেকটিতে এক-একটি মাকড়সা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এক রাত্রি পার হতেই দেখি—জাল বোনা তো দূরের কথা, প্রত্যেকটি ফ্রেম থেকেই মাকড়সাগুলি অদৃশ্য হয়ে গেছে। অনুসন্ধানের পর পরীক্ষাগারের দেয়ালের এক কোণে তাদের দুটির মাত্র সন্ধান পাওয়া গেল। বাকিগুলির কোনই সন্ধান মিললো না। একমাত্র ঝুলানো তার বেয়ে উপরে উঠে যাওয়া ছাড়া মাকড়সাগুলির পলায়ন করবার অন্য কোন রাস্তাই ছিল না। কাজেই পুনরায় পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ঝুলনো তারের সঙ্গে এমন একটা বৈদ্যুতিক কৌশল সংযোগ করে দিলাম, যাতে তার বেয়ে উপরে উঠতে গেলেই বৈদ্যুতিক 'শক' লেগে মাকড়সা নীচে অবতরণ করতে বাধ্য হয়। এইভাবে ফ্রেম থেকে পলায়নের পথ বন্ধ করে পুনরায় এক-একটি মাকড়সা ফ্রেমে ছেড়ে দিলাম। ভেবেছিলাম, ফ্রেম থেকে পলায়ন করবার উপায় না দেখলে এক দিনেই হোক বা দু-দিনেই হোক, পেটের দায়ে অবশেষে জাল বুনতে বাধ্য হবে। কিন্তু পরদিন পরীক্ষাগারে প্রবেশ করেই অবাক হয়ে গেলাম। এবারেও প্রত্যেকটি ফ্রেম খালি। কোথাও একটি মাকড়সা পাওয়া গেল না। ফ্রেম থেকে বের হবার কোন রাস্তা না থাকা সত্ত্বেও এরা উধাও হলো কেমন করে? কৌতূহল বেড়ে উঠলো। আবার নতুন মাকড়সা ধরে এনে ফ্রেমে বসিয়ে দিলাম। এবারেও ঠিক পূর্বের মত অবস্থা ঘটলো। কিন্তু এবার এক দিকের দেয়ালের কোণে মস্ত একটা জাল বুনছে দেখতে পেলাম। ফ্রেম থেকে পলায়ন করে মাকড়সাটা শিকার ধরবার আশায় জাল বুনেছিল। আমার নির্দেশিত স্থানে না হোক, একটা মাকড়সাও অন্ততঃ ল্যাবরেটরির মধ্যেই জাল পেতেছে—আপাততঃ এতেই কিঞ্চিৎ স্বস্তি অনুভব করলাম এবং তার সাহায্যেই পরীক্ষা

চালাতে উদ্যোগী হলাম। কিন্তু মনের মধ্যে সর্বদাই এই কথাটা উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলো যে, বাইরের কোনও কিছুর সঙ্গে যোগাযোগ না থাকা সত্ত্বেও ফ্রেম থেকে মাকড়সা অদৃশ্য হলো কেমন করে? তবে কি সূতার সাহায্যে নীচে ঝুলে পড়ে? কিন্তু তাও সম্ভব মনে হলো না, কারণ অস্বাভাবিক অবস্থায় পড়লে কীটপতঙ্গেরা সাধারণতঃ ঊর্ধ্বগামী ছাড়া যেমন নিম্নগামী হতে চায় না, এদের স্বভাবও সেরূপ। তথাপি কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে পুনরায় পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হলাম। এবারে ঝুলানো ফ্রেমগুলির ঠিক নীচে, মেঝের উপর উঁচু কানাওয়ালা বড় বড় কতকগুলি মসৃণ জলপাত্র রেখে দিলাম। উদ্দেশ্য, বৈদ্যুতিক 'শকে'র ভয়ে মাকড়সা উপরের দিকে তো উঠতেই পারবে না, আবার নীচে নামতে গেলেও জলে ডুবতে হবে। কারণ-সাঁতার কেটে কোনক্রমে কিনারায় যেতে পারলে খাড়া কানার মসৃণ গা বেয়ে উপরে ওঠবার উপায় থাকবে না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ব্যবস্থায়ও মাকড়সাগুলিকে ফ্রেমে বন্দী রাখতে পারা গেল না। জলের পরিবর্তে নীচে তাড়িতিক জাল পেতে রাখা হলো, যেন সেখানে অবতরণ করবামাত্রই তড়িতাহত হয়ে তার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। এরূপ অবস্থা অবলম্বনের পরেও দেখা গেল, মাকড়সারা ফ্রেম থেকে বেরিয়ে দেয়াল বা ছাতের কড়িবরগার গায়ে দিব্যি সুস্থ শরীরে অবস্থান করছে। একমাত্র ওড়বার ক্ষমতা থাকলে এরূপ ঘটনা সম্ভব হতে পারতো কিন্তু সেরূপ ক্ষমতা তো মাকড়সার নেই! ব্যাপারটা হতবুদ্ধিকর হলেও কোনক্রমেই তাদের আয়ত্তে আনতে না পেরে অবশেষে চতুষ্কোণ ট্যাঙ্কের মত বড় বড় কতকগুলি কাচের জারে মাকড়সা রেখে তারের জালে তাদের মুখ বন্ধ করে দিলাম। পূর্বাপেক্ষা অধিকতর অস্বাভাবিক অবস্থার দরুণই হোক অথবা বদ্ধ পাত্রের তাপাধিক্যের ফলেই হোক, দু-তিন দিন পর্যন্ত তাদের জাল পাতবার কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। তারা কাচপাত্রের এক কোণে গুটিসুটি হয়ে বসে রইলো। খাবার লোভ দেখিয়ে জাল পাতবার জন্যে উৎসাহিত করবার অভিপ্রায়ে প্রত্যেক পাত্রের অভ্যন্তরে এক-একটি জীবন্ত ফড়িং ছেড়ে দিলাম। কিন্তু মাকড়সারা সেটা গ্রাহ্যের

মধ্যেই আনলো না। আশঙ্কা হচ্ছিল, খেতে না পেলে মাকড়সাগুলি শীঘ্রই মরে যাবে। কারণ জাল বুনতে না পারলে শিকার মুখের কাছে ধরলেও তারা তাকে স্পর্শ করে না। পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম যে, এরা অনেক দিন পর্যন্ত না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। চার-পাঁচ দিন পরে দেখা গেল, একটা মাকড়সা কাচপাত্রের অভ্যন্তরে আড়াআড়িভাবে দু-চারটি সূতার টানা দিয়েছে। মনে হলো এবার নিশ্চয়ই জাল বুনবে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। জাল আর বুনলো না—ঐ সূতার টানার নীচের দিকে ঝুলে রইলো। আরও দু-তিন দিন কেটে গেল। একদিন দেখলাম, ঐ সূতার সঙ্গে একটা থলি বুনে মাকড়সাটা তাতে ডিম পেড়েছে। ডিম পাড়বার পর চার দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। মাকড়সা সমেত কাচ পাত্রটিকে টেবিলের উপর রেখে যন্ত্র সহযোগে ডিমের থলিটির বয়নকৌশল পরীক্ষা করেছিলাম। পাত্রের ঢাকনাটি খোলাই ছিল। কিছু দূরে টেবিল-ফ্যান চলছিল। প্রথমে মাকড়সাটা এক কোণে হাত-পা গুটিয়ে বসেছিল। খানিক বাদেই সে যেন চাঙ্গা হয়ে উঠলো। পাগুলি কিঞ্চিৎ প্রসারিত করে দু-এক বার এদিক-ওদিক ঘুরে কাটালো। আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর কাচের গা বেয়ে মাকড়সাটা ধীরে ধীরে উপরে উঠে এসে পাত্রের কানার উপর বসবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু অতবড় লম্বা পা নিয়ে অপ্রশস্ত জায়গায় বসবার সুবিধা হচ্ছিল না বলে দু-তিন বার পিছ্‌লে পড়েও অবশেষে টাল সাম্‌লে শরীরের পশ্চাদ্ভাগ হাওয়ার মধ্যে উঁচু করে তুললো। পাখাটা মাঝামাঝি বেগে চলছিল। আমার চোখেমুখে সূক্ষ্ম আঁশের মত কিছু জড়িয়ে যাচ্ছে অনুভব করলাম। যতই মুছে ফেলি ততই যেন আরও বেশী বেশী করে জড়ায়। লক্ষ্য করে দেখলাম মাকড়সাটা শরীরের পশ্চাদ্দেশ উঁচু করে বাতাসে সূতা ছাড়ছে—প্রথম দিকের সূতাটা এত সূক্ষ্ম যে মোটেই নজরে পড়ে নি। পরে ক্রমশঃ মোটা সূতা বের করছিল। তখন একপাশে সরে গেলাম। ক্রমশঃ দ্রুতবেগে লম্বা হতে হতে সূতার প্রান্তভাগ দেয়ালে ঠেকে আট্‌কে গেল। সূতাটা কিছুতে আটকেছে কিনা বোঝবার জন্য মাকড়সা তার পিছনের পা দিয়ে কয়েকবার

টেনে দেখলো। যেমন করেই হোক সে বুঝলো যে, সূতাটা কিছুতে আট্কে থাকলেও ঢিলাভাবে রয়েছে। তখন সে পিছনের দুই পায়ের সাহায্যে ধীরে ধীরে সূতাটাকে গুটাতে লাগলো। কিছুক্ষণ গুটাবার পর সূতাটা বেশ টান হতেই সেই কাচ-পাত্রের গায়ে জুড়ে দিয়ে সেই সূতা বেয়ে নীচের দিকে ঝুলতে ঝুলতে দেয়ালে গিয়ে উপস্থিত হলো। ফ্রেম থেকে মাকড়সাগুলি কেমন করে পালিয়ে যেত, এ ব্যাপার দেখে তা পরিষ্কার হয়ে গেল। পর্যবেক্ষণের ফলে আরও বুঝতে পারলাম যে, সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত এরা প্রায়ই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বসে থাকে। অবশ্য জালে শিকার পড়লে আলাদা কথা। কিন্তু শিকার বেশীর ভাগ রাত্রিতেই জালে পড়ে। কদাচিৎ কোনও গতিকে দু-একটা শিকার বেলায় জালে আট্কাতে দেখা যায়। এই জন্যেই পূর্বোক্ত পরীক্ষায় এগুলিকে সূতার সাহায্যে পালাতে দেখি নি। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করবার পর মাকড়সাগুলিকে দিয়ে ইচ্ছানুযায়ী ফ্রেমে জাল পাতবার ব্যবস্থা করতে আর কোনই অসুবিধা ঘটেনি।

যাহোক, এই ঘটনার প্রায় দিন দশেক পর কাচ পাত্রটার মধ্যেই মাকড়সার ডিমগুলি ফুটে বাচ্চা বের হলো। সংখ্যায় তারা এক শতেরও বেশী হবে। কতকগুলি বাচ্চা ডিমের থলিটার উপর, কতকগুলি কাচের গায়ে বসেছিল এবং কতকগুলি আবার সূক্ষ্ম সূতা থেকে ঝুলছিল।

এতগুলি বাচ্চাকে কি খাইয়ে কেমন করে বাঁচিয়ে রাখবো, কিছুই স্থির করতে পারছিলাম না। ভাবলাম—দেখা যাক, যদি দু-একটা বাচ্চাকে অনাহারে মরতে দেখা যায়, তখন ছেড়ে দিলেই হবে। তারপর অন্যান্য মাকড়সাগুলিকে নিয়ে পরীক্ষাকার্যে ব্যাপৃত হওয়ায় বাচ্চাগুলির কথা এক রকম ভুলেই গিয়েছিলাম। দিন-পাঁচেক পর হঠাৎ মনে পড়তেই দেখলাম—বাচ্চাগুলি অনাহারে মরা দূরে থাক কাচের জারের মধ্যে অজস্র সূতা বুনে অনেকগুলি পাতলা সাদা কাগজের ফালির মত পদার্থে সেটিকে ভর্তি করে ফেলেছে। কাচের পাত্রটা এখন অর্ধস্বচ্ছ বা অস্বচ্ছই বোধ হচ্ছিল। হাওয়ার মধ্যে সূতা ছাড়বার পূর্বোক্ত স্বভাবের কথা স্মরণ করে বাচ্চাগুলির

সম্বন্ধেও কৌতূহল জাগ্রত হলো। পাত্রটাকে তখন টেবিল-ফ্যানের বিপরীত দিকে বসিয়ে জালের ঢাকনা খুলে দিলাম। আশ্চর্য ব্যাপার! বায়ুস্রোতের সন্ধান পেয়েই বাচ্চাগুলি একে একে উঠে এসে পাত্রের কানার উপর জমায়েৎ হবার চেষ্টা করতে লাগলো, কিন্তু হাওরার জোরে স্থির থাকতে পারছিল না। পাখার ঘূর্ণনবেগ যথাসম্ভব কমিয়ে দিতেই দেখি—বাচ্চাগুলি কানার উপর উঠে শরীরের পশ্চাদ্ভাগ উঁচু করে পূর্বোক্ত উপায়ে বাতাসে সূতা ছাড়তে আরম্ভ করলো। সূতা এত সূক্ষ্ম যে সহজে তা নজরেই পড়ে না। এরপর যা ঘটলো তা দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। শরীরের পশ্চাদ্ভাগ উঁচু করবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাচ্চাগুলি যেন হাওয়ায় উড়ে পাখার বিপরীত দিকের দেয়ালে বসতে লাগলো। বড় মাকড়সাটা যেমন সূতা বেয়ে দেয়ালে গিয়েছিল,এ গুলিকে সেরূপ কিছুই করতে দেখা গেল না। প্রায় ১০।১৫ মিনিটের মধ্যেই সবগুলি বাচ্চা দেয়ালের খানিকটা স্থান অধিকার করে ফেললো। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করবার পর বাচ্চাগুলির এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতের কৌশল সম্যক অবগত হবার জন্যে বিবিধ পরীক্ষার ফলে তাদের সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হতে পেরেছিলাম।

মোটের উপর বাচ্চা মাকড়সাগুলিকেই প্যারাসুটিস্ট আখ্যা দেওয়া যায়। কারণ এরা নিজ নিজ দেহ-নিঃসৃত সূতায় ভর করে অনুকূল বায়ুস্রোতে দূর-দূরান্তরে ভেসে যেতে পারে। কয়েক জাতীয় ক্ষুদ্রকায় মাকড়সা ছাড়া পরিণত বয়স্ক মাকড়সারা মোটেই হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে পারে না। খোলা জায়গায় একটু বাতাস বইতে থাকলেই বাচ্চা মাকড়সাগুলি লতাপাতা বেয়ে উপরে উঠে উন্মুক্ত স্থানে উপস্থিত হয় এবং বায়ুস্রোতের দিকে মুখ করে পাগুলিকে প্রায় একত্রিতভাবে উঁচু করে তোলে। তারপর শরীরের পশ্চাদ্ভাগ উঁচু করে সূতা ছাড়তে থাকে। বাতাসের টানে সূতাটা কিছু দূর প্রসারিত হলেই যখন ঝুলতে পারে সূতায় যথেষ্ট বাতাস আটকাচ্ছে, তখন অবলম্বন ছেড়ে দিয়ে সূতার সঙ্গে বাতাসে উড়ে যায়। অনুকূল বায়ুভরে সূতায় ভর করে বাচ্চাগুলি বহু দূরে চলে যেতে পারে। এরূপভাবে সূত্র অবলম্বনে মাকড়সাকে উপকূল ভাগ থেকে প্রায় দুই শত মাইল দূরে জাহাজের উপর

অবতরণ করতেও দেখা গেছে। উড়তে উড়তে এরা ইচ্ছামত যে কোন স্থানে অবতরণ করতে পারে। এই কৌশলটি আরও অদ্ভুত। কোনও স্থানে নামতে ইচ্ছা হলেই পায়ের সাহায্যে অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সুতাটাকে গুটাতে থাকে। সুতার দৈর্ঘ্য কমে গেলেই তাতে আর বেশী বাতাস আটকাতে পারে না, তখন প্যারাসুটিস্টের মত ধীরে ধীরে নির্বিঘ্নে নিম্নে অবতরণ করে। অবশ্য প্রতিকূল আবহাওয়ার ফলে অথবা স্থান নির্বাচনের ভুলে অনেকে বেঘোরে প্রাণ হারাতে বাধ্য হয়; কিন্তু সেটা ভিন্ন কথা। উপর থেকে নীচে নামবার কালে তাদের মোটেই বিপদগ্রস্ত হতে হয় না। নতুন স্থানে উপস্থিত হয়ে তারা অতি ক্ষুদ্রাকৃতি অথচ নিখুঁৎ জাল বুনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ শিকার করবার আশায় বসে থাকে। শিকারের প্রাচুর্যের সঙ্গে সঙ্গেই এদের শরীর দ্রুত বর্ধিত হতে থাকে এবং শরীর বৃদ্ধি পেলে এরা খোলস বদলায়। তখন দেহের ওজন বৃদ্ধির দরুণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা আর গগন-পর্যটনে সক্ষম হয় না। কাজেই তখন দূরবর্তী স্থানে সুতা আট্‌কে গমনাগমন করে থাকে। কিন্তু বাতাসে চলাচল করতে পারে না। এরূপ আবদ্ধ কুঠুরি বা পাত্রের মধ্যে থাকলে বাচ্চা মাকড়সারা একই স্থানে জড়াজড়ি করে অবস্থান করে এবং যদৃচ্ছ সুতা বের করে এলোমেলো ভাবে পাত্‌লা চাদরের মত আশ্রয় স্থল গড়ে তোলে। কারণ, বাতাসের সাহায্য ব্যতিরেকে বড়ই হোক বা ছোটই হোক, কোনও মাকড়সাই জালের প্রাথমিক কাঠামো তৈরী করতে পারে না। বায়ুস্রোত রহিত কোনও স্থানে আবদ্ধ থাকলে বাচ্চাগুলি জন্মগত সংস্কারবশে জাল বুনতে চেষ্টা করলেও সেগুলি জাল না হয়ে কতকগুলি এলোমেলো সুতার স্তূপে পরিণত হয়। আমাদের দেশীয় এপিরা, নেফিলা ও বিভিন্ন গণভুক্ত বহু জাতীয় মাকড়সার বাচ্চা নিয়ে পরীক্ষার ফলে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এরূপ অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি। বদ্ধ পাত্র থেকে উন্মুক্ত স্থানে ছেড়ে দিলে একটু বায়ুপ্রবাহ অনুভব করলেই তৎক্ষণাৎ সুতা ছেড়ে আকাশে উঠে যায়। কখনও কখনও আবার বিভিন্ন সুতা একসঙ্গে জড়াজড়ি করে কয়েকটি একত্রে বাতাসে ভেসে বেড়ায়। ডিম থেকে বের হবার পর বাচ্চাগুলিকে প্রায়ই দলবদ্ধভাবে সুতা থেকে

ঝুলতে দেখা যায়। চার-পাঁচ দিন পর ক্রমশঃ সূতার সাহায্যে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বাচ্চাদের পক্ষে বিভিন্ন স্থানে আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্ন গৌণ হতে পারে; কিন্তু আত্মরক্ষার জন্যে ছড়িয়ে পড়ার একান্ত প্রয়োজন। কারণ মাকড়সারা সুবিধা পেলেই একে অন্যকে ধরে খেয়ে ফেলে। এক মাতৃগর্ভসম্ভূত বাচ্চাদের মধ্যেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এমন কি, সুবিধা পেলে মাও সন্তানদের রেহাই দেয় না। তাছাড়া অন্যান্য শত্রুরও অভাব নেই। কাজেই আত্মরক্ষা ও বংশবিস্তারের জন্যে এই প্রাণীদের বহুবিধ কৌশল অবলম্বন করতে হয়। তার মধ্যে উড্ডয়ন কৌশল ও অনুকরণ-ক্ষমতাই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বলে মনে হয়।

## পিঁপড়ে-মাকড়সা

প্রাণী-জগতে নিম্নশ্রেণীর কীটপতঙ্গের মধ্যেই অত্যধিক পরিমাণে অনুকরণপ্রিয়তা পরিলক্ষিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই তারা এমন নিখুঁৎ অনুকরণ-শক্তির পরিচয় দেয় যে, বিশেষভাবে লক্ষ্য করেও তাদের স্বরূপ উপলব্ধি করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বিভিন্ন জাতের ফড়িং, প্রজাপতি, টিকটিকি, ব্যাং ও অন্যান্য বিচিত্র কীটপতঙ্গ, পোকামাকড় নানাভাবে অবস্থান করে অথবা পারিপার্শ্বিক বর্ণাবলীর সঙ্গে দেহবর্ণের সামঞ্জস্য সাধন করে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সর্বদাই শত্রুকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে থাকে। আবার কোনও কোনও প্রাণী যেন জন্মগত সংস্কারবশেই অনুকরণপ্রিয় হয়ে থাকে; যদিও তাদের অনুকরণপ্রণালী অনেকটা নিকৃষ্ট ধরণের।

দিনরাত শত্রুর ভয়ে উদ্বিগ্ন থেকে এবং শত্রুর হাতে নানা ভাবে লাঞ্ছিত হয়ে কোন কোন কীটপতঙ্গ এমন অদ্ভুত অনুকরণ-শক্তি আয়ত্ত করেছে যে, তাদের শারীরিক গঠন ও গতিবিধি লক্ষ্য করলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাকড়সাদের কথা বলি। মাকড়সার পদে পদে শত্রু। ঘরের দেয়ালে, কার্নিসে অথবা কপাটের আড়ালে, বোলতার মত আকৃতিবিশিষ্ট নানা জাতের বিচিত্র পোকাকে নরম মাটি দিয়ে বাসা তৈরী করতে দেখতে পাওয়া যায়। এরা সাধারণতঃ কুমোরে-পোকা নামে পরিচিত। হাজার হাজার বিভিন্ন শ্রেণীর বিচিত্র মাকড়সার মত বিভিন্ন জাতের কুমোরে-পোকারও অভাব নেই। মাকড়সার প্রধান শত্রু এই কুমোরে-পোকা। এরা

সর্বদাই মাকড়সার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় এবং হঠাৎ মাকড়সাকে একবার দেখতে পেলেই তৎক্ষণাৎ উড়ে গিয়ে তাড়া করে, ধরতে পারলে কামড়ে ধরে মাকড়সার শরীরে একপ্রকার বিষ ফুটিয়ে দেয়। বিষের প্রভাবে মাকড়সাটা মরে যায় না বটে, কিন্তু একেবারে অসাড় ও নিস্পন্দ হয়ে পড়ে। কুমোরে-পোকা তখন তাকে টেনে অথবা মুখে করে বাসায় নিয়ে যায়। এরূপে পাঁচ-সাতটা মাকড়সা সংগ্রহ করে এক-একটা কুঠুরিতে রেখে প্রত্যেক কুঠুরিতে এক-একটা ডিম পাড়ে এবং কুঠুরির মুখ মাটি দিয়ে বন্ধ করে চলে যায়। ডিম ফুটে বাচ্চা ( কীড়া ) বের হলে তারা সেই নিস্পন্দ মাকড়সাগুলিকে খেয়ে বড় হতে থাকে। খাদ্য নিঃশেষ হলে কীড়া মুখ থেকে সুতা বের করে গুটি প্রস্তুত করে এবং তার মধ্যে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করে। কিছুদিন এভাবে থাকবার পর গুটির মধ্যেই কীড়া পুত্তলিতে পরিণত হয় এবং অবশেষে পূর্ণাঙ্গ কুমোরেপোকায় রূপান্তরিত হয়ে কুঠুরির মুখে ছিদ্র করে বাইরে উড়ে পালায়। যে মাকড়সা জাল বা ফাঁদ পেতে অবস্থান করে তাদের চেয়ে যারা শিকারান্বেষণে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায় তাদেরই কুমোরে-পোকার আক্রমণের ভয় বেশী। এই ভ্রমণশীল মাকড়সারাও বহু সংখ্যক বিভিন্ন শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত। হয়তো শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্ত এই জাতের মাকড়সার মধ্যে অনেকেই ক্রমবিকাশের ফলে বিভিন্ন জাতের পিঁপড়ে দৈহিক গঠন অতি নিপুণভাবে অনুকরণ করেছে। এদের অনুকরণশক্তি এতই নিখুঁৎ যে, গায়ের রং দৈহিক গঠন এবং চাল-চলন দেখে সহজে পিঁপড়ে ছাড়া মাকড়সা বলে চিনবার উপায় নেই।

বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এপর্যন্ত বিভিন্ন জাতের ত্রিশটির অধিক পিঁপড়ে-মাকড়সার সন্ধান পেয়েছি। কলকাতা এবং তার আশেপাশের বহু স্থানে বিভিন্ন ধরণের পিঁপড়ে-মাকড়সার অভাব নেই। মনে হয়, যত রকম বিভিন্ন জাতের পিঁপড়ে দেখা যায়, প্রায় তত রকমেরই পিঁপড়ে-মাকড়সার অস্তিত্ব রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, দুই বা আরও বেশী বিভিন্ন জাতের মাকড়সা একই জাতের পিঁপড়ের শারীরিক গঠন, গায়ের রং এবং চালচলনের ভঙ্গী অনুকরণ করেছে। আত্মরক্ষামূলক অনুকরণ-

প্রিয়তার প্রসঙ্গে একথা বলা আবশ্যক যে, যদিও কোন কোন জাতের কুমোরে-পোকাকে কেবল বেছে বেছে পিঁপড়ে-মাকড়সাই সংগ্রহ করতে দেখা যায় তথাপি এই অদ্ভুত অনুকরণশক্তি তাদের নানাভাবে আত্মরক্ষায় সাহায্য করে থাকে। কারণ অনুকরণকারী পিঁপড়ে-মাকড়সারা সাধারণতঃ পিঁপড়েদের মধ্যেই চলাফেরা করে থাকে। এতে পিঁপড়েদের ভয়েও শত্রুরা তাদের সহজে আক্রমণ করতে সাহসী হয় না এবং অনেক সময়ে ভুলও করে থাকে। এদেশে লাল, কালো, হল্‌দে ও নানারকম বিচিত্র বর্ণের বহুবিধ পিঁপড়ের অনুরূপ মাকড়সার অভাব নেই। এস্থলে আমাদের দেশীয় নাল্‌সো বা লাল-পিঁপড়ে অনুকরণকারী মাকড়সার কথা আলোচনা করবো।

বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্র এবং কলকাতার আশেপাশে বিভিন্ন অঞ্চলে গাছের উপর বহু সংখ্যক লাল রঙের এক প্রকার পিঁপড়ে দেখা যায়। সাধারণতঃ এরা নাল্‌সো-পিঁপড়ে নামে পরিচিত। এদের দংশন অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। আম, জাম প্রভৃতি গাছের উঁচু ডালে অনেক সবুজ পাতা একত্রে জুড়ে গোলাকার বাসা নির্মাণ করে এবং হাজার হাজার পিঁপড়ে তার মধ্যে এক পরিবারভুক্ত হয়ে বাস করে। গাছপালার উপরেই তারা সার বেঁধে দলে দলে যাতায়াত করে এবং সময় সময় মাটির উপরও নেমে আসে। বিষাক্ত দংশনের ভয়ে কেউ এদের কাছে ঘেঁষতে ভরসা পায় না। এরা এমনই দুর্ধর্ষ যে, শত্রু প্রবলই হোক, কি দুর্বলই হোক, আয়ত্তের মধ্যে পেলে তাকে আক্রমণ করবেই, মোটেই তারা প্রাণের ভয় করে না। প্রবল শত্রুর আক্রমণে এরা দলে দলে মৃত্যু বরণ করে, তবু বিনা বাধায় তাদের একচুলও অগ্রসর হতে দেবে না। ফড়িং বা প্রজাপতিকে কোনও রকমে একবার কায়দায় পেলেই হলো, দলে দলে এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করে। কিন্তু তাদের তুলনায় অতবড় একটা প্রাণীর সঙ্গে তারা প্রথমে বড়-একটা সুবিধা করতে না পারলেও হতাশ হয়ে পিছু হটে না। একটিই হোক বা দু-তিনটিই হোক—ডানা, লেজ বা পায়ে কামড়ে ধরে থাকে। ফড়িং এই অবস্থায় যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কেবল ছুটো-ছুটিই করে থাকে, অবশেষে ক্লান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করে। এদের উগ্র প্রকৃতির সুযোগ নিয়ে কোন কোন মাকড়সা শত্রুকে ফাঁকি দেবার জন্যে তাদের চেহারার

হুবহু অনুকরণ করে। এ-পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে তাতে দেখা যায়, তিন জাতীয় বিভিন্ন ভ্রাম্যমান মাকড়সা এই নাল্‌সো-পিঁপড়েকে অনুকরণ করে থাকে। এদের মধ্য 'প্ল্যাটালিয়ডস্‌' নামক এক জাতীয় মাকড়সার অনুকরণশক্তি খুবই বিস্ময়কর। নাল্‌সো-পিঁপড়ে ও 'প্ল্যাটালিয়ডস্‌' মাকড়সার গায়ের রঙে কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। উভয়ের গায়ের রংই ইটের রঙের মত লাল। একমাত্র গলদেশ ব্যতীত উভয়ের দৈহিক গঠনে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বিদ্যমান। কিন্তু পিঁপড়ে ও মাকড়সার পা ও চোখের সংখ্যা সমান নয়। পিঁপড়ে প্রভৃতি কীট-পতঙ্গের তিন জোড়া পা ও এক জোড়া চোখ থাকে। মাকড়সাদের কিন্তু চার জোড়া পা ও সাধারণতঃ চার জোড়া চোখ থাকে। পিঁপড়ে-মাকড়সাদের মাথার উপর চারটি এবং সম্মুখভাগে চারটি চোখ আছে। সম্মুখের এই চারটি চোখের মধ্যে মাঝের চোখ দুটি সব চেয়ে বড়। মনে হয় যেন মোটরের হেড লাইটের মত জ্বল জ্বল করছে। এই চোখ দুটির রং প্রায়ই বদ্‌লাতে দেখা যায়। কখনও উজ্জ্বল নীল, কখনও ঈষৎ লাল, আবার কখনও বা কালো মনে হয়। পোকামাকড় বা যে কোন শিকার এই উজ্জ্বল চোখ দুটার সামনে পড়লে যেন ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। মাকড়সা ও পিঁপড়েদের মধ্যে চোখ ও পায়ের সংখ্যার পার্থক্য থাকলেও এই মাকড়সারা অতি অদ্ভুত কৌশলে পিঁপড়ের দৈহিক গঠনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলে। পিঁপড়ের মাথার উপর এক জোড়া করে শুঁড় থাকে, কিন্তু মাকড়সার ঐরূপ কোনও শুঁড় নেই। পিঁপড়েরা সর্বদাই শুঁড় নেড়ে নেড়ে চলে এবং এই শুঁড় সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। শুঁড় দেখে সহজেই অন্যান্য কীটপতঙ্গ থেকে পিঁপড়েকে চিনে নিতে পারা যায়। অনুকরণকারী মাকড়সারা অতি সহজ উপায়ে এই শুঁড়ের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। চলবার সময় সম্মুখের দু-খানা পা সর্বদাই তারা পিঁপড়ের শুঁড়ের মত মাথার উপর তুলে ধরে নাচাতে থাকে। একে তো পিঁপড়ের গায়ের রং ও আকৃতির সঙ্গে এদের কোনই তফাৎ নেই, তাতে শুঁড়ের মত করে ঠ্যাং দুটাকে নাচাতে থাকলে শত্রু-মিত্র কারও সাধ্য নেই যে, সহজে এই অনুকরণকারী মাকড়সাকে চিনে উঠতে পারে। লাল পিঁপড়েরা যেখানে চলাফেরা করে অথবা যে

গাছে বাসা বাঁধে, তার আশেপাশেই এবং অনেক সময় এক প্রকার তাদের দলে মিশে এই 'প্ল্যাটালিয়ড্‌স্‌' মাকড়সারা ঘোরাফেরা করে থাকে। কাজেই সাধারণতঃ লোকে এগুলিকে পিঁপড়ে বলেই মনে করে থাকে। কিন্তু এদের কতকগুলি চাল-চলন পিঁপড়েদের থেকে স্বতন্ত্র। এরা যেরূপ দ্রুতবেগে চলাফেরা করতে পারে, নাল্‌সো-পিঁপড়েরা সেরূপ পারে না। সাধারণতঃ আস্তে আস্তে ঘোরাঘুরি করতে করতে হঠাৎ আবছাগোছের কিছু দেখলেই তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে এবং বিপদ বুঝলে চক্ষের নিমেষে ছুটে পালায় অথবা পাতার আড়ালে আত্মগোপন করে, কিন্তু নাল্‌সো-পিঁপড়েরা সেরূপ কিছুই করে না। অনেক সময় এদের গতিবিধি দেখে লোকে অবাক হয়ে ভাবে—দু-একটা নাল্‌সো-পিঁপড়ের এরূপ অদ্ভুত গতিবিধির কারণ কি? তারা বুঝতেই পারে না যে, এরা মোটেই পিঁপড়ে নয়। চলতে চলতে আবার সময় সময় ঘাড় বাঁকিয়ে এদিক-ওদিক দেখে নেয়। কেউ অনুসরণ করলে হয়রান হবার ফলে পাতা অথবা ডালের গায়ে সূতা আট্‌কে নীচে ঝুলে পড়ে।

স্ত্রী-প্ল্যাটালিয়ডস মাকড়সার আকৃতি, পরিণত ও অপরিণত উভয় বয়সেই ঠিক নালসো-পিঁপড়েরই মত; কিন্তু পুরুষ মাকড়সা অপরিণত বয়সে ঠিক স্ত্রী-মাকড়সার মত হলেও শেষবার খোলস পরিত্যাগের পর সম্পূর্ণ বিপরীত মূর্তি ধারণ করে। প্রায় ছয়বার খোলস পরিত্যাগের পর এরা পরিণত বয়সে উপনীত হয়ে থাকে। পঞ্চমবার খোলস বদ্‌লাবার পরেও স্ত্রী ও পুরুষ মাকড়সার মধ্যে কিছুই পার্থক্য দেখা যায় না—সবাইকে স্ত্রী-মাকড়সা বলেই মনে হয়। ষষ্ঠবার খোলস পরিত্যাগের সময় স্ত্রীরূপী পুরুষ-মাকড়সার হঠাৎ একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। এই সময় মাকড়সা কিছু সূতা বুনে তার উপর চুপ করে বসে থাকে। তারপর সেই স্ত্রীরূপী পুরুষ-মাকড়সার মাথার দিকের শক্ত খোলসটি যেন কব্জাওয়ালা ঢাক্‌নার মত উপরের দিকে উঠে আসে। তার মধ্য থেকে প্রায় ৫।৭ মিনিটের মধ্যেই ডবল নাল্‌সো-পিঁপড়ের মত অদ্ভুত একটা বিকটাকার প্রাণী বের হয়ে আসে। প্রত্যক্ষ না করলে ব্যাপারটা বিশ্বাস করতেই প্রবৃত্তি হয় না যে,

এরূপ একটা চেহারার প্রাণী, মুগুরের মত একজোড়া লম্বা ঠোঁট নিয়ে এই ছোট্ট খোলসটার মধ্য থেকে বের হয়ে আসতে পারে! ব্যাপারটা এমনই অদ্ভুত যে, আরব্যোপন্যাসের সেই কলসীর দৈত্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ছোট ছোট বিষদাঁত দুটির মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে প্রকাণ্ড মুগুরের মত দুটি যন্ত্র। কুমীরের লম্বা ঠোঁটের দু-দিকের দাঁতের মত এই মুগুরের প্রত্যেকটিতে লম্বালম্বি দু-সার দাঁত থাকে। মুগুরের মাথায় সাঁড়াশীর মত বাঁকানো লম্বা লম্বা দুটি বৃহৎ আকারের সূচিকা। এই বৃহৎ সূচিকা দুটিকে মুগুরের খাঁজে ভাঁজ করে রাখে। কাকেও আক্রমণ করবার সময় এই বিরাট ঠোঁট দুটিকে পাশাপাশি ভাবে হাঁ করে অগ্রসর হয়। বড় করে দেখলে এই বিরাট মুখগহ্বরটি দেখে অতি বড় সাহসী ব্যক্তিরও ভীতির সঞ্চার হয়। পূর্বেই বলেছি—পুরুষ-মাকড়সার শেষবার খোলস ছেড়ে এই নব কলেবর ধারণ করতে ৫।৭ মিনিটের বেশী সময় লাগে না। এইরূপ অভিনব আকৃতি ধারণ করবার পর পুরুষ-মাকড়সা প্রায় এক-ঘণ্টা কি দেড়-ঘণ্টাকাল চুপ করে বসে থাকে। ইতিমধ্যে শরীর ক্রমশঃ শক্ত হয়ে গায়ের রং গাঢ় লাল হয়ে ওঠে। এর পর সে আহারান্বেষণে বের হয় এবং স্ত্রী-মাকড়সার সন্ধান করে। এরা সূতা প্রস্তুত করতে পারলেও বাসা নির্মাণের ধার ধারে না, পুরনো পরিত্যক্ত বাসায় অথবা স্ত্রী-মাকড়সার সন্ধান পেলে তারই বাসায় অনেক সময় কাটিয়ে দেয়। স্ত্রী-মাকড়সা সাধারণতঃ সবুজ পাতার অপর দিকে সূতা বুনে একটু লম্বাটে ধরণের গোলাকার বাসা নির্মাণ করে এবং তার মধ্যে দশ-বারোটা ছোট ছোট সর্ষের মত হল্‌দে রঙের ডিম পাড়ে। ডিম না-ফোটা পর্যন্ত বাসার উপরেই অবস্থান করে, অবশ্য স্ত্রী-মাকড়সাকে আলাদা করে রাখলেও সময়মত ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়ে থাকে। দশ-পনেরো দিন পরে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। বাচ্চাগুলি দেখতে হুবহু ক্ষুদে পিঁপড়ের মত। কোনও কিছু না খেয়ে বাচ্চাগুলি বাসার মধ্যে পাঁচ-সাত দিন অবস্থান করবার পর আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করতে থাকে। পরিণত বয়স্ক মাকড়সা অপেক্ষা এই বাচ্চাগুলি অধিকতর দ্রুতগতিতে ছুটাছুটি করে থাকে। এদের শরীরের গঠন পরিণত

বয়স্কদের মত হলেও গায়ের রং থাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। মাথার দিকটা কালো, কিন্তু পিছনের দিকের অর্ধেক হল্‌দে ও অর্ধেক কালো—ঠিক ক্ষুদে পিঁপড়ের মত। তৃতীয়বার খোলস পরিত্যাগের সময় পর্যন্ত বাচ্চাগুলি ক্ষুদে পিঁপড়ের অনুকরণ করে চলে। তৃতীয়বার খোলস বদলাবার পর থেকেই এদের শরীরের রং সম্পূর্ণ লাল হয়ে যায়। তখন এরা উইরাজ নামক এক জাতীয় পিঁপড়ের অনুকরণ করে তাদের সঙ্গেই ঘোরাফেরা করে। চতুর্থ অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে পঞ্চমবার খোলস পরিত্যাগের পর এরা নাল্‌সো-পিঁপড়েকে অনুকরণ করে এবং তাদের দলের আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করে থাকে। এদের হালচাল দেখে মনে হয়, কেবলমাত্র শত্রুর চোখে ধূলি নিক্ষেপের জন্যেই এই অনুকরণশক্তির উন্মেষ ঘটেছে।

লাল পিঁপড়েদের অনুকরণকারী অপর এক জাতীয় লাল মাকড়সা আমাদের দেশের বনে-জঙ্গলে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায়। এদের নাম—ফর্‌টিসেপ্‌স্ মাকড়সা। এদের দেহের গঠন ঠিক পিঁপড়েদের মত না হলেও এমনভাবে চলাফেরা করে যে, হঠাৎ দেখে নাল্‌সো-পিঁপড়ে বলেই ভ্রম হয়। গায়ের রং নাল্‌সোর মতই লাল। শরীরের পশ্চাদ্ভাগে এমন ভাবে দুটি কালো ফোঁটা অবস্থিত যে, দেখে ঠিক নাল্‌সো-পিঁপড়ের চোখ দুটির মতই মনে হয়। এদের অনুকরণপ্রিয়তা ঠিক আত্মরক্ষামূলক নয়। পরিণত বয়সে এই ফরটিসেপ্‌স্ মাকড়সারা লাল পিঁপড়েদের শরীরের রস চুষে খেয়েই জীবনধারণ করে থাকে। কিন্তু এদের পক্ষে নাল্‌সো-পিঁপড়ে শিকার করা খুব সহজসাধ্য নয়। বিশেষতঃ এরা নাল্‌সোকে এত ভয় করে যে, সহজে তাদের কাছে ঘেঁষতে ভরসা পায় না। এই জন্যেই বোধ হয় এদের অনুকরণপ্রিয়তা-শক্তির উন্মেষ ঘটেছে। যেখানে নাল্‌সোরা দলে দলে বিচরণ করে, তাদের আশেপাশেই ফরটিসেপ্‌স্ মাকড়সা সম্মুখের চারখানা ঠ্যাং উঁচু করে চুপ করে বসে থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই ভাবে ফরটিসেপ্‌স্‌কে নাল্‌সো শিকারের প্রত্যাশায় চুপ করে বসে থাকতে দেখা যায়। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে হলে এরা একটানা চলে না—থেমে থেমে অগ্রসর হয়। নাল্‌সোদের কেউ কেউ দল ছেড়ে মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে

আশেপাশের অবস্থা তদারক করে, তাছাড়া নতুন খাদ্যের সন্ধানেও কেউ কেউ দল ছেড়ে বের হয়—কিন্তু বেশী দূরে যায় না। দূর থেকে এরূপ দু-একটা দল-ছাড়া নাল্‌সো ভুল করে ফর্‌টিসেপ্‌স্‌কে দেখে স্বজাতীয় পিঁপড়ে বলে ভুলক্রমে কাছে অগ্রসর হলেই আর রক্ষা নেই। ফর্‌টিসেপ্‌স্‌ সুযোগ বুঝে তার উপর লাফিয়ে পড়েই একেবারে ঘাড় কাম্‌ড়ে ধরে। তখন অনেক ধস্তাধস্তির পর মাকড়সার বিষে ক্রমশঃ নির্জীব হয়ে পড়লে শিকারী তাকে মুখে করে কোন নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে তার রস চুষে খেয়ে দেহটা ফেলে দেয়। সময় সময় ডালের উপর পিঁপড়ের সারের মধ্য থেকেও এরা এক-একটা পিঁপড়েকে ছোঁ মেরে ধরে আনে, তখন কিন্তু অন্য পিঁপড়েরা দুষ্কৃতকারীর পশ্চাদ্ধাবন করে। বেগতিক দেখে তখন পিঁপড়েটাকে মুখে নিয়ে সূতা ছেড়ে ডাল থেকে ঝুলে পড়ে। অনুসরণকারী পিঁপড়ে তখন হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ নীচের দিকে চেয়ে থাকে, অবশেষে হতাশভাবে ফিরে যায়।

যে গাছে নাল্‌সো-পিঁপড়ে বাসা বাঁধে তার আশেপাশে ছোট ছোট গাছের পাতার উপর সূতা বুনে এরা গোলাকার বাসা নির্মাণ করে। এদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে দেখতে প্রায় একই রকম। তবে পুরুষেরা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় হয়। এদের মস্তক গোলাকার এবং তাতে চার জোড়া চোখ আছে। কিন্তু মাঝের চোখ জোড়াই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং তার সাহায্যেই দেখাশোনা করে থাকে। একযোগে এদের দশ-পনেরোটি করে বাচ্চা হয়। বাচ্চাগুলির গায়ের রং জন্মের পর সাধারণতঃ সবুজাভ থাকে। তারপর দু-তিন বার খোলস পরিত্যাগের পর সম্মুখের দু-জোড়া পায়ের রং সবুজ ও ম্যাজেণ্টা রঙের মত ডোরাকাটা দেখায়। শেষবার খোলস পরিত্যাগের পর এদের দেহের রং সম্পূর্ণ লাল হয়ে যায়, কেবল পায়ের অগ্রভাগ সাদা থাকে। চলবার সময় থেমে থেমে যখন পা কাঁপাতে থাকে, তখন খুব সুন্দর দেখায়।

আমাদের দেশে আর এক জাতীয় লাল মাকড়সা দেখতে পাওয়া যায়—এগুলিকে 'রেনাই' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এরা দেখতে কতকটা ফর্‌টিসেপ্‌স্‌ মাকড়সার মত।

# বিবিধ

## মৌমাছির জীবন রহস্য

প্রয়োজনের তাগিদে কেবলমাত্র বন্য পশু-পক্ষীকে বশীভূত করেই মানুষ ক্ষান্ত থাকে নি, বিভিন্ন জাতীয় কীট-পতঙ্গকেও পোষ মানিয়ে তাদের দ্বারা প্রয়োজনীয় কার্যোদ্ধার করিয়ে নিচ্ছে। মৌমাছি এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মধু আহরণ করবার নিমিত্ত কোন্ সময়ে মানুষ প্রথম মৌমাছি পালন সুরু করেছিল, তা সঠিক নির্ণয় করতে না পারলেও সেটা যে সহস্রাধিক বছর পূর্বের কথা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে বর্তমান যুগে যেরূপ উন্নত কার্যকরী পন্থায় মৌমাছি পালন করা হয়, প্রাচীন প্রথা যে তার চেয়ে বহুলাংশে নিকৃষ্ট ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। মোটের উপর তখন মধু আহরণের নিমিত্ত সুবিধামত স্থানে চাক নির্মাণে মৌমাছিগুলিকে প্রলুব্ধ করবার জন্যেই বিবিধ কৌশল অবলম্বিত হতো। আজও পল্লী অঞ্চলে মৌমাছির ঝাঁক উড়ে যাবার সময় সেগুলিকে চাক বাঁধতে প্রলুব্ধ করবার জন্যে কয়েক প্রকার অদ্ভুত প্রথার প্রচলন দেখা যায়। যাহোক, মৌমাছি পালন সম্বন্ধে আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নয়। এস্থলে সাধারণভাবে তাদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করবো।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নানা জাতীয় মৌমাছি দেখা যায়। আমাদের দেশেও বিভিন্ন জাতীয় কয়েক রকমের মৌমাছি দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের বুনো বা বাঘা মৌমাছিই সবচেয়ে উগ্র প্রকৃতির এবং অধিকতর মধু-সঞ্চয়ী। উঁচু গাছের ডালে, বড় বড় গাছের ফাটলে,

দালানের কার্নিশে অথবা ছায়াচ্ছন্ন কোন গাছের ডালে মৌমাছিরা বড় বড় চাক নির্মাণ করে বসবাস করে। এক-একটা চাকে ৩০।৪০ হাজার থেকে ৭০।৮০ হাজার মৌমাছি দেখা যায়। পরস্পর গাত্র সংলগ্ন হয়ে এক-একটি চাকে এত অধিক সংখ্যক মৌমাছি বাস করলেও তাদের পরস্পরের সঙ্গে কখনও ঝগড়া-ঝাঁটি ঘটতে দেখা যায় না। অবশ্য সময়ে সময়ে এক চাকের মৌমাছি অন্য চাকের মৌমাছিগুলিকে আক্রমণ করে লুঠতরাজ করবার চেষ্টা করে থাকে। এরা ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার বিষয় উপেক্ষা করে সমাজের মঙ্গলের জন্যেই দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রমে কাজ করে থাকে এবং প্রয়োজন হলে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। যাঁদের একটু বিশেষভাবে মৌচাক লক্ষ্য করবার সুবিধা হয়েছে, তাঁরা জানেন যে, কিরূপ বুদ্ধিমত্তা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে মৌমাছিগুলি তাদের দৈনন্দিনকর্ম নির্বাহ করেথাকে। সারা শীতকালটা এরা সঞ্চিত মধুর উপর নির্ভর করে অনেকটা নিশ্চেষ্টভাবে কাটাবার পর বসন্তের আবির্ভাব থেকে যে ভাবে মধু আহরণ, চাক নির্মাণ, বাচ্চা প্রতিপালন, বাসার আবর্জনা পরিষ্কার এবং শত্রু-প্রতিরোধ প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যে ব্যাপৃত থাকে, তা দেখলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। এই রকমের বিভিন্ন কাজের জন্যে এদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ দেখা যায়। যার যা কাজ, সে যেন তা যন্ত্রের মতই করে যাচ্ছে। এতে তাদের কণামাত্র ক্লান্তি বা অবসাদ নেই! কোন কারণে অক্ষম বা দুর্বল না হওয়া পর্যন্ত এই কর্ম-প্রচেষ্টার বিরাম ঘটতে দেখা যায় না। চাকের অধিকাংশ মৌমাছিই দিনের বেলায় ফুলে ফুলে মধু আহরণে ব্যস্ত থাকে। তারা যে কেবল মধুই সংগ্রহ করে তা নয়; সঙ্গে সঙ্গে পিছনের পায়ের ঊর্ধ্বদেশের চিরুণীর মত যন্ত্রের সাহায্যে যথেষ্ট পরিমাণ ফুলরেণুও সংগ্রহ করে বাসায় নিয়ে আসে। ফুলের উপর থেকে একটা মৌমাছি ধরলেই দেখা যাবে—তার পিছনের পায়ের মধ্যস্থলে হলুদ বর্ণের ফুলের রেণুগুলি যেন কাইয়ের মত সঞ্চিত রয়েছে। কতকগুলি মৌমাছি আবার বাসার জন্যে জল সংগ্রহেই ব্যাপৃত থাকে। তারা ফুলের উপর না বসে সোজা কোনও জলাশয়ের উপর উড়ে যায়। জলাশয়ের ভাসমান জলজ পত্রাদির উপর বসে প্রচুর পরিমাণে জল

শুঁষে নিয়ে বাসায় ফিরে আসে। গরু-ছাগল যেমন করে জলপান করে সারবন্দিভাবে ভাসমান শালুক বা পদ্মপাতার কিনারায় বসে অনেক সময় তাদের জলপান করতে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি মৌমাছি সর্বদাই চাকের মধ্যে অবস্থান করে। কোন সময়েই সেগুলিকে বাসা ছেড়ে বাইরে যেতে দেখা যায় না। এদের মধ্যে কতকগুলি প্রকোষ্ঠ নির্মাণ, কতকগুলি বাচ্চা প্রতিপালন এবং কতকগুলি মধু ও চাক রক্ষার কার্যে নিযুক্ত থাকে। পাহারাদার মক্ষিকাগুলি সর্বদা সতর্কভাবে বাসার চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সময় সময় এক বাসার মৌমাছিরা অপর বাসায় লুঠতরাজ করবার চেষ্টা করে থাকে। তাছাড়া অনিষ্টকারী বিবিধ পোকা-মাকড়েরও অভাব নেই। তারা এদের বাচ্চা, ডিম ও মধুর লোভে, এমন কি—বাসার মোম খাবার জন্যেও আক্রমণ করতে কসুর করে না। এক জাতীয় 'মথ' আছে, যাদের শোঁয়াপোকারা মোম খেয়েই জীবনধারণ করে। মৌচাকের গন্ধ পেলেই এই জাতীয় শোঁয়াপোকা দল বেঁধে সেখানে উপস্থিত হয় এবং মুখ থেকে সূক্ষ্ম সুতা বের করে পাত্‌লা কাগজের মত জাল বুনে বাসার নীচের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এরূপে বাসার অধিকাংশই ক্রমশঃ সূতার জালে ঢেকে ফেলে। প্রথম থেকে বাধা দিতে না পারলে সেগুলিকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই এরা চাকে প্রবেশ করবার সকল প্রকার সম্ভাব্য পথে খাড়া পাহারা মোতায়েন করে। এই প্রহরীরা এতই সতর্ক যে, নিজেদের দলের যে কেউ বাইরে থেকে বাসায় উপস্থিত হোক না কেন, পরীক্ষা না করে তাকে ছেড়ে দেয় না। খুব সম্ভব শরীরের গন্ধ থেকেই এরা স্বজাতীয় বা বিজাতীয় দলের মৌমাছি বলে চিনতে পারে। কতকগুলি প্রহরী আবার চাকের অতি প্রয়োজনীয় জায়গা বিশেষে অবস্থান করে অতি দ্রুতগতিতে ডানা কাঁপাতে থাকে। বাসার নিকটে গেলেই একসঙ্গে অনেকগুলি মৌমাছির ডানা কাঁপানোর ঝন্‌ঝন্ শব্দ প্রাণে একটা আতঙ্কের সঞ্চার করে।

চাকের যাবতীয় মৌমাছিকে প্রধানতঃ দু-ভাগে ভাগ করা যায়—এক কর্মপটু শ্রমিক অর্থাৎ কর্মী; অপর দল সম্পূর্ণ কর্মবিমুখ। রাণী ও পুরুষ

মক্ষিকারাই শেষোক্ত ভাগে পড়ে। চাক নির্মাণ, বাচ্চা প্রতিপালন থেকে সুরু করে বাসা রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত যাবতীয় কাজ শ্রমিকেরাই করে থাকে। পুরুষ-মক্ষিকারা প্রধানতঃ আহার-বিহারেই মত্ত থাকে। রাণীকৃৎ প্রধান কাজ মৌমাছির বংশবৃদ্ধি করা। পুরুষেরা প্রায়ই দিনের শেষভাগে উচ্চ শব্দ করে বাসা থেকে উড়ে যায় এবং কিছুক্ষণ প্রমোদ ভ্রমণ করে বাসায় ফিরে আসে। প্রত্যেক চাকেই একটি মাত্র পরিণত বয়স্ক রাণী-মৌমাছি দেখতে পাওয়া যায়। কদাচিৎ এর ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়ে থাকে। মৌমাছিদের কার্যকলাপ দেখে মনে হয়—একটি মাত্র রাণীকে অবলম্বন করেই যেন সমাজ বন্ধন গড়ে উঠেছে! কিন্তু রাণী বলে তাকে চাকের মৌমাছিদের শাসনকর্ত্রী বুঝায় না। এদের মধ্যে রাজতন্ত্র বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই। এরা পুরাপুরি সমাজতান্ত্রিক। রাণীর কাজ একমাত্র প্রজনন করা। একটি মাত্র রাণীই চাকের প্রায় অধিকাংশ মৌমাছির মাতা। রাণী কেবল ডিম পেড়েই খালাস। একমাত্র যৌন-মিলনে অংশ গ্রহণ করা ছাড়া পুরুষ মৌমাছিদেরও আর কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। কাজেই মৌমাছিদের কথা বলতে গেলে প্রধানতঃ কর্মী মৌমাছিদেরই বুঝায়। কর্মীদের দ্বারাই মৌমাছি সমাজের পরিচয়।

পূর্বে লোকের ধারণা ছিল যে, ফুল থেকে মোম সংগ্রহ করে মৌমাছিরা তার সাহায্যে চাকের কুঠরিগুলি নির্মাণ করে। কিন্তু অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে যে, কর্মী-মৌমাছিদের পেটের নিম্নভাগে অবস্থিত কতকগুলি গ্রন্থি থেকেই মোম উৎপাদিত হয় এবং সেই মোমের সাহায্যেই এরা চাক নির্মাণ করে থাকে। মৌমাছির ঝাঁক উড়ে যেতে অনেকেই দেখে থাকবেন। উড়তে উড়তে সুবিধামত স্থান দেখতে পেলে সেখানেই কোনও গাছের ডালে বসে পড়ে। বাসা নির্মাণের অনুপযুক্ত মনে করলে দু-একদিন সেখানে অবস্থান করে আবার উড়ে যায়। উপযুক্ত স্থানে উপস্থিত হলে চাক নির্মাণ করবার পূর্বে কর্মী মৌমাছিরা বাসা বাঁধবার জন্যে নির্বাচিত স্থানে ঘনসন্নিবিষ্টভাবে ঝুলে কিছুকাল নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করে। এই সময় তাদের উদরের নিম্নদেশে মোম উৎপন্ন হতে থাকে। আমরা সাধারণতঃ যেরূপ মোমের সঙ্গে পরিচিত

—প্রথম উৎপন্ন হবার সময় তা মোটেই সেরূপ অবস্থায় থাকে না। মৌমাছির উদরের নিম্নভাগে প্রথম যে মোম উৎপন্ন হয় তা দেখতে অনেকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বচ্ছ অভ্র-খণ্ডের মত। এই স্বচ্ছ মোমের পাতগুলি মৌমাছির উদরের শক্ত খোলার ভাঁজে ভাঁজে প্রলম্বিত অবস্থায় সজ্জিত থাকে। বাসা নির্মাণ করবার সময় এরূপ অসংখ্য মোমের টুক্‌রা বাসার নীচে ভূমির উপর থাকতে দেখা যায়। মৌমাছিরা এই টুক্‌রাগুলি খুলে নিয়ে চিবিয়ে মুখ-নিঃসৃত অম্লরসাত্মক লালার সঙ্গে মিশ্রিত করে। সেগুলিকে এক প্রকার অস্বচ্ছ বাসা তৈরীর মণ্ডে পরিণত করে। এই মণ্ড কাদামাটির মত প্রয়োগ করে এরা ছয় কোণ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠুরি নির্মাণ করে। কুঠুরি নির্মাণ শেষ হলে রাণী তার শরীরের পশ্চাদ্ভাগ কুঠুরির ভিতরে প্রবেশ করিয়ে প্রত্যেকটিতে এক-একটি করে ডিম পেড়ে যায়। ডিম ফুটে কীড়া বের হবার পর কর্মীরা তাদের শরীর থেকে উৎপন্ন এক প্রকার সাদা ঘন তরল পদার্থের সঙ্গে ফুলের রেণু প্রভৃতি মিশিয়ে তাদের খেতে দেয়। এই পদার্থকে 'রয়েল জেলী' বা মৌমাছির দুধ বলা হয়। কুঠুরির পার্থক্য অনুযায়ী অর্থাৎ বাচ্চাগুলির ভবিষ্যৎ পরিণতির উপর লক্ষ্য রেখেই বোধ হয় খাদ্যের পরিমাণের তারতম্য করা হয়ে থাকে। বাচ্চাগুলির শৈশবাবস্থা অতিক্রম করবার পর মোমের সাহায্যে কর্মীরা তখন কুঠুরির মুখ বন্ধ করে দেয়। তখন থেকেই বাচ্চা-গুলির কৈশোর অবস্থা চলতে থাকে। কুঠুরির মুখ বন্ধ হবার পরেই বাচ্চা তার মুখ থেকে সূক্ষ্ম সুতা বের করে দেহের চতুর্দিকে একটি যুগ্ম আবরণী গড়ে তোলে। এই আবরণীর মধ্যে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করে কীড়া পুত্তলীতে রূপান্তরিত হয়। কীড়া অবস্থায় তাদের হাত-পা বা অন্য কোনও অঙ্গ-প্রতঙ্গের চিহ্নমাত্র থাকে না। পুত্তলী অবস্থায় বাচ্চার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আত্মপ্রকাশ করে; অর্থাৎ কতকটা অসম্পূর্ণ থাকলেও এই সময়ে বাচ্চা প্রকৃত মৌমাছির আকৃতি পরিগ্রহণ করে। অবস্থাটা অনেকটা মাতৃগর্ভে অবস্থিত পরিণত মনুষ্য-ভ্রূণের মত। আরও কিছুকাল নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করবার পর পূর্ণাঙ্গ মৌমাছির রূপ ধারণ করে কুঠুরির মুখ কেটে বাইরে আসে। নতুন কর্মী জন্মগ্রহণ করবার পর প্রথমতঃ কিছুদিন সে

বাসা ছেড়ে মোটেই বাইরে যায় না, বাসার আভ্যন্তরীণ কার্যেই ব্যাপৃত থাকে। আবর্জনা সরিয়ে তারা কুঠুরিগুলিকে পরিষ্কার রাখে, ডানা কাঁপিয়ে কুঠুরির অভ্যন্তরে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালন করে। চাকের প্রবেশ-পথে পাহারায় মোতায়েন থেকে আক্রমণকারী কীটপতঙ্গ তাড়াবার ব্যবস্থা করে এবং কেউ কেউ সংগৃহীত মধু সংরক্ষণের কার্যেও ব্যাপৃত হয়ে থাকে। পক্ষাধিক কাল গৃহকার্যে আত্মনিয়োগ করবার পর মধু সংগ্রহে বহির্গত হয়। কর্মী মৌমাছিরা সাত-আট সপ্তাহ থেকে প্রায় ছয় মাস কাল জীবিত থাকে, রাণী-মৌমাছিকে তিন বছর থেকে প্রায় চার বছর পর্যন্ত জীবিত থাকতে দেখা যায়। পুরুষ-মৌমাছিরা গ্রীষ্মের মাঝামাঝি জন্মগ্রহণ করে যৌন-অভিযানের পর প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে নানাভাবে প্রাণত্যাগ করে এবং অবশিষ্ট যারা থাকে তারাও কর্মীদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে—একটি রাণী থেকেই হাজার হাজার মৌমাছি জন্মগ্রহণ করে থাকে। পুরুষ, কর্মী ও নতুন রাণীরা তারই সন্তান। যৌন-মিলনের ফলে স্ত্রী ও পুরুষ মৌমাছি উৎপন্ন হবার ব্যাপারে কিছুমাত্র নতুনত্ব নেই। জীবজগতে অহরহই এরূপ ব্যাপার ঘটছে। কিন্তু একই রকম বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত হাজার হাজার কর্মী মৌমাছির উৎপত্তি হয় কিরূপে? মৌমাছি-জীবনের এটা এক অদ্ভুত রহস্য। গবেষণার ফলে—স্ত্রী, পুরুষ ও কর্মী—এই তিন শ্রেণীর মৌমাছির জন্ম-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে যতদূর জানতে পারা গেছে তা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।

মৌমাছিদের জীবনযাত্রাপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করলে সহজেই একথা মনে হয় যে, রাণী-মক্ষিকা ইচ্ছামত স্ত্রী, পুরুষ বা কর্মী মৌমাছি উৎপাদন করতে পারে। ডিম পাড়বার সময় হলেই রাণীকে সর্বক্ষণই চাকের উপর ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটি শূন্য কুঠুরিতে এক-একটি করে ডিম পাড়তে দেখা যায়। যে সকল কুঠুরিতে পুরুষ-মৌমাছি উৎপন্ন হয় সেগুলির আয়তন শ্রমিক-মৌমাছিদের কুঠুরি থেকে কিঞ্চিৎ বৃহদাকার। এই উভয় শ্রেণীর কুঠুরি থেকে রাণীর কুঠুরির আকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক এবং আয়তনেও তা অনেক বড়। পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গেছে—কুঠুরিগুলির আকৃতি বা আয়তনের পার্থক্য

সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিবেচনা না করেই রাণী একাদিক্রমে ডিম পেড়ে যায়। কিন্তু সর্বশেষে দেখা যায়—কুঠরির আয়তনের তারতম্যানুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর মৌমাছি জন্মগ্রহণ করেছে ; অর্থাৎ ছোট কুঠরি থেকে কর্মী, মাঝারি কুঠরি থেকে পুরুষ এবং বড় কুঠরি থেকে রাণী জন্মগ্রহণ করেছে। কাজেই পর্যবেক্ষকের পক্ষে এ কথা অনুমান করা স্বাভাবিক যে, রাণী ইচ্ছামত কর্মী, পুরুষ বা রাণীর ডিম প্রসব করে থাকে। যৌন-পার্থক্য হিসাবে প্রকৃত প্রস্তাবে রাণী ও কর্মী মক্ষিকাদের মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য। রাণীদের মত কর্মী-মৌমাছিরাও স্ত্রী জাতীয়। কিন্তু রাণীরা সন্তান-উৎপাদনে সক্ষম পক্ষান্তরে কর্মীরা বন্ধ্যা। রাণীদের প্রজনন যন্ত্র যেরূপ পরিপূর্ণতা লাভ করে কর্মী-মক্ষিকাদের প্রজনন যন্ত্র সেরূপ পরিণত অবস্থায় উপনীত হয় না। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও রাণী ও কর্মী মক্ষিকারা একই রকমের ডিম থেকেই জন্মগ্রহণ করে থাকে। অদ্ভুত হলেও ব্যাপারটা সহজেই উপলব্ধি হতে পারে। স্ত্রী জাতীয় মৌমাছিদের প্রজনন যন্ত্রের যথাযথ পরিপূর্ণতা নির্ভর করে খাদ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। শ্রমিক মৌমাছিরা স্ত্রী জাতীয় হলেও শৈশবাবস্থা থেকেই তারা প্রতিপালিত হয় ক্ষুদ্রায়তন কুঠরির মধ্যে। এই সকল কুঠরিতে মৌমাছির রয়েল জেলী বা দুধ প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হয় না। ঠিক যতটুকু প্রয়োজন কর্মীরা বাচ্চাগুলিকে ঠিক ততটুকু খাদ্যই দিয়ে থাকে। রাণীর কুঠরি অনেক বড়। তাতে বেশী পরিমাণ খাদ্যের স্থান সংকুলান হয়। কাজেই বড় কুঠরির বাচ্চা শৈশবাবস্থায় প্রচুর পরিমাণ সহজপাচ্য রয়েলজেলী উদরস্থ করতে পারে। প্রচুর খাদ্য উদরস্থ করবার ফলে সে যে কেবল আকৃতিতেই অনেক বড় হয় তা নয়, তার দেহ-যন্ত্রাদিও যথাযথ পরিপুষ্টি লাভ করতে পারে। কিন্তু রাণী ও শ্রমিক-মক্ষিকার পার্থক্য কেবল প্রজনন যন্ত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, আকৃতি ও প্রকৃতিগত বহুবিধ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। খাদ্যের পরিমাণের তারতম্য হিসাবে যদি কেবল ক্ষুদ্র ও বৃহদাকৃতির পার্থক্য দেখা যেত তবে ব্যাপারটা সহজবোধ্য হতো সন্দেহ নেই। কিন্তু কর্মীর শরীরের প্রান্তদেশ গোলাকার এবং রাণীর শরীরের পশ্চাদ্ভাগ লম্বা ও সূচালো, রাণী ও কর্মীর

চোয়াল এবং জিভ ভিন্ন ধরনের। রাণীর দেহে মোম-উৎপাদক বা রেণু-সংগ্রাহক যন্ত্র নেই, উভয়ের দেহবর্ণেও যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। তাছাড়া বুদ্ধিবৃত্তিতে রাণী মৌমাছিরা কর্মীদের অপেক্ষা অনেক নিম্ন-মানের বলে বোধ হয়। রাণী জন্মগ্রহণ করবার পর যৌন মিলনের জন্যে একবার মাত্র বাসা ছেড়ে উড়ে যায়। মিলনের পর চাকে ফিরে সে ডিম পাড়তে আরম্ভ করে। দলের বাসা পরিবর্তন করবার সময় ছাড়া আর কখনও তাকে বাসা ছেড়ে উড়তে দেখা যায় না। কর্মী-মৌমাছিরা তার আহার জোগায়, ডিম পাড়বার স্থান নির্দেশ করে এবং তার যাবতীয় কার্য নির্বাহ করে। মোটের উপর রাণীরা কর্মীদের হাতে যন্ত্রের মত পরিচালিত হয়। তাছাড়া রাণীদের এক অদ্ভুত মনোবৃত্তি দেখা যায়। যদি কোনও চাকে কখনও অপর রাণী-মৌমাছির আবির্ভাব হয়, তবে উভয়ের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ বেধে যায়। একটি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও নির্জীব না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের অবসান ঘটে না। কর্মীরা চতুর্দিকে ঘিরে এই যুদ্ধের ফলাফল দেখতে থাকে। যুদ্ধ শেষ হওয়ামাত্রই তারা বিজয়িনীকে তাদের রাণীর পদে বরণ করে নেয়। কাজেই রাণী ও শ্রমিকের এই যে কতকগুলি গুরুতর পার্থক্য বিদ্যমান, সেটা কি কেবল খাদ্যবস্তুর তারতম্যের উপরই নির্ভর করে? অথচ শ্রমিক ও রাণী মক্ষিকা যে একই রকমের ডিম থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে, তা অতি সহজেই প্রমাণিত হয়। ডিম ফোটবার পর দু-তিন দিনের মধ্যে শ্রমিকের প্রকোষ্ঠ থেকে বাচ্চা তুলে নিয়ে তাকে যদি রাণীর কুঠুরিতে এবং রাণীর কুঠুরির বাচ্চা শ্রমিকের কুঠুরিতে রাখা যায়, তবে দেখা যাবে—পরিবর্তন সত্ত্বেও শ্রমিকের কুঠুরি থেকে শ্রমিক এবং রাণীর কুঠুরি থেকে রাণী-মৌমাছিই উৎপন্ন হয়েছে। এই পরীক্ষা থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, এই জাতীয় ডিম থেকে খাদ্যের তারতম্যানুসারে রাণী ও কর্মী মৌমাছি উৎপন্ন হয়। ভিন্ন রকমের একপ্রকার ডিম থেকে পুরুষ-মক্ষিকা উৎপন্ন হয়ে থাকে। যৌন-মিলন না হলেও রাণী-মক্ষিকাকে ডিম পাড়তে দেখা যায়। এই অনিষিক্ত ডিম থেকেই পুরুষ-মক্ষিকা উৎপন্ন হয়ে থাকে। যৌন-মিলনের পর ডিম্ব-নিষেককারী রস ডিম্বাধারে না গিয়ে ডিম্বনলের

সঙ্গে সংযুক্ত একটি নির্দিষ্ট থলিতে সঞ্চিত হয়। ডিম বাইরে নির্গত হবার সময় ওই নলের মুখে তা নিষিক্ত হয়ে থাকে। কেউ কেউ অনুমান করেন, রাণী যখন ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ডিম পাড়বার জন্যে শরীরের পশ্চাদ্ভাগ প্রবেশ করিয়ে দেয় তখন চাপ লাগবার ফলে অভ্যন্তরস্থ থলি থেকে পুং-রস নির্গত হয়ে ডিমটিকে নিষিক্ত করে দেয়। পুরুষ মৌমাছিদের প্রকোষ্ঠ অপেক্ষাকৃত বড় বলে তাতে ডিম পাড়বার সময় চাপ লাগে না। কাজেই পুং-রস থলি থেকে নির্গত না হবার ফলে ডিমটি অনিষিক্তভাবেই বহির্গত হয়। এই অনিষিক্ত ডিম থেকে পুরুষ-মৌমাছি জন্মগ্রহণ করে থাকে।

সাধারণতঃ আমরা দেখতে পাই, জীব-জগতে পিতা ও মাতার সহযোগে সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং সেই সন্তান পিতা অথবা মাতার অনুরূপই হয়ে থাকে। জীবতত্ত্বের গোড়ার কথা আলোচনা করলে দেখা যাবে—আদি জীব-কোষে পিতা ও মাতার বৈশিষ্ট্য অন্তর্নিহিত থাকে। পুং-বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রাধান্য লাভ করলে ভ্রূণে ক্রমশঃ পুং-লক্ষণসমূহ আত্মপ্রকাশ করে, অন্যথায় স্ত্রী-লক্ষণসমূহ বিকশিত হয়ে থাকে। আদি জীব-কোষে স্ত্রী ও পুং বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব থাকে বলেই স্ত্রী অথবা পুং-সন্তান উৎপন্ন হতে পারে। কিন্তু মৌমাছিদের ক্ষেত্রে জীবের জন্ম-রহস্যের মূল তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে তাদের স্ত্রী ও পুরুষ উৎপত্তির ব্যাপারটাকে কিরূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? পুরুষের সম্পর্ক থাকলেই সেখানে স্ত্রী-সন্তান উৎপন্ন হবে—অথচ পুরুষ-সংস্রব না থাকলে সেখানে কেবলই পুরুষ সন্তান উৎপন্ন হবে—এ অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার। পুরুষ-সংস্রব বর্জিত স্ত্রী-গর্ভস্থ ডিম্ব অথবা জীব-কোষে পুরুষের বৈশিষ্ট্যসমূহ কেমন করে আত্মপ্রকাশ করে? বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর দেহ-কোষ, বিশেষ করে জীব-কোষে অবস্থিত 'ক্রোমসোমে'র কথা আলোচনা করলেই এর সহজ সমাধান হতে পারে। মানুষ হতে আরম্ভ করে প্রায় অধিকাংশ প্রাণীর পুরুষদের শরীরে যতগুলি পুং-কোষ উৎপন্ন হয়, তার অর্ধসংখ্যক কোষগুলিতে X এবং বাকী অর্ধেক থাকে Y-ক্রোমোসোম। স্ত্রীদের ডিম্বকোষের প্রত্যেকটিতেই থাকে X-ক্রোমোসোম। অর্থাৎ ক্রোমোসোমের দিক থেকে বলতে গেলে—পুরুষেরা—XY এবং স্ত্রীরা

XX। পুং-কোষের X-ক্রোমোসোম ডিম্বকোষের X ক্রোমোসোমের সঙ্গে মিলিত হলে সন্তান হবে স্ত্রী এবং পুং-কোষের Y-ক্রোমোসোম ডিম্ব-কোষের X-ক্রোমোসোমের সঙ্গে মিলিত হলে সন্তান হবে পুরুষ। Y-ক্রোমোসোম-টাকেই পুং-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বলে মনে করা হয়। মৌমাছির ক্রোমোসোমও যদি এই অবস্থায় থেকে থাকে তবে অনিষিক্ত ডিম্ব থেকে পুং-মৌমাছি উৎপন্ন হতে পারে না। কাজেই মনে হয়, পাখী, প্রজাপতি প্রভৃতি কয়েক জাতীয় প্রাণীদের মত পুং-মৌমাছি—XX এবং রাণী-মৌমাছি—XY-ক্রোমোসোম-সমন্বিত। মৌমাছির সমগোত্রীয় অন্যান্য প্রাণী সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে অন্ততঃ এই ধারণাই সমীচীন বোধ হচ্ছে।

## বোলতার জীবন-রহস্য

জীব-জগতের অনেকে এককভাবে বাস করলেও কেউ কেউ আবার সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে থাকে। জাতীয় উৎকর্ষ বিধানের দিক থেকে বিবেচনা করলে এককভাবে বসবাস করার অসুবিধা অনেক। কারণ জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি কাজই নিজে নিজে সম্পন্ন করতে হয়। কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থায় কর্ম-বিভাগের সুযোগ পাওয়া যায়। মানুষ সামাজিক জীব। আদিম মনুষ্যসমাজে প্রয়োজন অথবা অভাববোধ অনেক কম ছিল বলে বোধ হয় কতকটা স্বাভাবিকভাবেই কর্ম-বিভাগের গোড়াপত্তন সুরু হয়েছিল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে জাগতিক ব্যাপার সম্পর্কে অধিকতর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ ব্যষ্টিগত অথবা সমষ্টিগত প্রয়োজনে পার্থিব সম্পদ আহরণ এবং সুশৃঙ্খলার সঙ্গে বিবিধ দৈনন্দিন কার্য-নির্বাহের নিমিত্ত বল প্রয়োগে দাসত্বপ্রথার প্রচলন করে। পরবর্তীকালে অস্ত্রপ্রয়োগের সহায়তায় মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিসমূহ বিনষ্ট করে কৃত্রিম উপায়ে চিরজীবন তাদের দাসত্বকার্যে লিপ্ত রাখবার উপায় অবলম্বিত হয়। তৎপরবর্তী যুগে হয়তো নৈতিক কারণে এই প্রথা ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হলেও সামাজিক এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বুদ্ধি এবং কূট-কৌশল প্রয়োগে দাসত্বপ্রথা অব্যাহত রাখবার উপায় অবলম্বিত হয়। ধর্মের অনুশাসন, ইহকাল এবং পরকালের কাহিনী শুনিয়ে সেবা-ধর্মের মহিমা কীর্তন হয়তো এই উপায়েরই একটা বিশিষ্ট দিকমাত্র। যা হোক নৈতিক দৃষ্টিতে নির্দোষ এবং অনেকটা স্বাভাবিক উপায়ে মানুষ যদি

এমন এক জাতীয় মানুষ উৎপাদনে সক্ষম হতো, যাদের একমাত্র সেবাধর্মে অনুরক্তি ছাড়া ক্ষুৎ-পিপাসা ব্যতিরেকে অন্য কোনও প্রবৃত্তি থাকবে না অর্থাৎ তারা যদি যান্ত্রিক মানুষের মত রক্তমাংসের মানুষ সৃষ্টি করত পারত, তবে এই সমস্যা সমাধানে এতটা বিব্রত হয়ে পড়ত না। কিন্তু মানুষ এ ব্যাপারে কিছুদূর অগ্রসর হলেও আজও সেরূপ কিছু অব্যর্থ উপায় আবিষ্কারে সক্ষম হয় নি।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যা করতে পারে নি নিম্নস্তরের কীট-পতঙ্গেরা সুদূর অতীত যুগ থেকে তা আয়ত্ত করে সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগাচ্ছে। সমাজবদ্ধভাবে বাস করতে অভ্যস্ত মৌমাছি, বোল্‌তা, ভীমরুল, পিঁপড়ে প্রভৃতি প্রাণীদের কথা ধরা যাক। হাজার হাজার মৌমাছি, হাজার হাজার পিঁপড়ে একই বাসায় বাস করে। সমাজের বিভিন্ন কার্যনির্বাহের জন্যে এদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ দেখা যায়। তাদের এই শ্রেণী-বিভাগ স্বাভাবিক কারণ, রাজা, রাণী, সৈনিক, শ্রমিক বা কর্মী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীগুলির আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মৌমাছি, বোলতা, পিঁপড়ে প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় প্রত্যেকটি সমাজেই কর্মীদের সংখ্যা অগণিত। রাজা ও রাণীদের সংখ্যা কর্মীদের তুলনায় অনেক কম। মৌমাছিদের ক্ষেত্রে এক-একটি চাকে সাধারণতঃ একাধিক রাণী-মক্ষিকা দেখা যায় না। রাজা এবং রাণীরা অলসভাবে দিন কাটায়। তাদের কোনই কাজকর্ম করতে হয় না। কর্মীরাই সংসারের যাবতীয় কাজ করে থাকে। খাদ্য-আহরণ ও তার বিলিব্যবস্থা, বাসগৃহ নির্মাণ, বাসগৃহ পরিষ্কার, শিশু প্রতিপালন—এমন কি, রাজা ও রাণীদের মুখে খাবার তুলে দেওয়া ও তাদের পরিচর্যার যাবতীয় ব্যবস্থা কর্মীরাই করে থাকে। রাণী কেবল ডিম পেড়েই খালাস। কর্মীরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, কোনও কোনও ক্ষেত্রে দিনরাত্রি, প্রায় সমভাবেই বাসার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কার্যে ব্যাপৃত থাকে। কর্মীদের মধ্যে ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, আলস্য অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত বিশ্রামের প্রবৃত্তি দেখা যায় না। এদের কোনও কর্ম-নিয়ন্ত্রণকারী পরিদর্শকও নেই; প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্বাভাবিক

প্রবৃত্তির বশেই যন্ত্রের মত নিজের কাজ করে যায় এবং প্রত্যেক ব্যাপারেই প্রয়োজনমত বুদ্ধি খাটিয়ে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চেষ্টা করে। যত তুচ্ছই হোক, এরা কর্তব্যকার্য সম্পাদনে মৃত্যু বরণ করতেও কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। কর্মীদের আর একটি অদ্ভুত ক্ষমতা দেখা যায়। কোনও কারণে রাণীর অভাব ঘটলে বাসায় নতুন নতুন কর্মী উৎপন্ন হতে পারে না। যথেষ্ট সংখ্যক কর্মীর অভাবে সহজেই নানা প্রকার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়; এবং ফলে তাদের সমাজ অতি দ্রুত ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হয়। এরূপ ব্যাপার ঘটলে কর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ পুরুষ-সংস্রব ব্যতিরেকেই ডিম প্রসব করে নতুন নতুন কর্মী উৎপাদন করে থাকে।

স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণীর মিলনের ফলেই পিতা অথবা মাতার অনুরূপ সন্তান জন্মগ্রহণ করে থাকে।—জীবজগতে এটা একটা সাধারণ পরিচিত ঘটনা। কিন্তু নিম্নস্তরের এই সামাজিক প্রাণীদের মধ্যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে কেমন করে? এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার, তাছাড়া আরও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, রাণীরা যৌন-মিলনের পূর্বেও ডিম প্রসব করে থাকে; কিন্তু তাথেকে কেবল পুরুষই জন্মগ্রহণ করে। যৌন-মিলনের পর রাণীর ডিম থেকে কর্মীরাই আবির্ভূত হয়। কর্মীরা আকৃতি এবং প্রকৃতিতে মাতা বা পিতা কারও অনুরূপ নয়, পিঁপড়েদের কর্মীদের মধ্যে মাতা বা পিতা কারো সঙ্গে কোনও সামঞ্জস্য বের করা দুষ্কর। কেমন করে এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হয়? আজ পর্যন্তও এই জটিল রহস্য সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হয় নি। তবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে এই বিষয়ে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার জানতে পারা গেছে।

মৌমাছি, বোলতা, ভীমরুল, পিপীলিকা প্রভৃতি একই বর্গভুক্ত প্রাণী। মোটামুটি কতকগুলি বিষয়ে মিল থাকলেও এই বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীদের পরস্পরের মধ্যে গুরুতর কতকগুলি বৈষম্যও আছে। কাজেই মৌমাছি-সমাজের শ্রেণীভেদের কারণ নিষিক্ত বা অনিষিক্ত ডিম এবং 'রয়েল-জেলী' প্রয়োগের তারতম্যের বিষয় অবগত থাকলেও বোলতা, ভীমরুল, পিঁপড়ের মধ্যে প্রকৃত ব্যাপার কি ঘটে, তা জানবার জন্যে পিঁপড়ে সম্বন্ধে অনুসন্ধানে

ব্যাপৃত হয়েছিলাম। কিন্তু পিঁপড়েরা ক্ষুদ্রকায় প্রাণী এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে বাস করে বলে তাদের সম্পূর্ণ একটা বিরাট দলকে কৃত্রিম বাসস্থানে প্রতিপালন করে পর্যবেক্ষণ করা খুবই অসুবিধার ব্যাপার। তথাপি কয়েকবার চেষ্টা করেও সাফল্য লাভ করতে পারি নি। তখন অপেক্ষাকৃত বৃহদাকৃতির ভীমরুল, বোলতার কথা মনে পড়লো। কিন্তু ভয়ানক বিপজ্জনক বলে ভীমরুল পুষে পরীক্ষা করা সম্ভব ছিল না। বোলতা বিপজ্জনক হলেও ভীমরুলের মত ততটা গুরুতর নয়। কাজেই সতর্কতা অবলম্বন করে বোলতার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করেছিলাম। কলকাতার উপকণ্ঠে একটা পরিত্যক্ত স্থানে গাছের ডালে বোলতার প্রকাণ্ড একটা বাসার সন্ধান পাওয়া গেল। বাসাটাতে প্রায় পাঁচ-ছয় শতেরও অধিক বোলতা ছিল। বাসাটার অনেকটা অংশ লতাপাতার আড়ালে পড়লেও কিয়দংশ অনাবৃত ছিল। নিকটে না গেলে এদের কার্যকলাপ ভাল করে দেখা যায় না। কাছে যেতেও বিশেষ ভরসা হলো না; কারণ বাসা থেকে হাত দুই ব্যবধানে উপস্থিত হলেই এরা ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কাজেই টেলি-মাইক্রোস্কোপের সাহায্য নিলাম।

প্রায় ৫০ গজ দূর থেকে টেলি-মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে বাসার মধ্যে বোলতার কার্যকলাপ পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছিল। দু-তিন দিন পর্যবেক্ষণের ফলে বোলতাগুলির গতিবিধি ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক কিছু দেখতে পেলাম বটে, কিন্তু এতগুলি বোলতা বাসাটার উপর প্রায় ঘেঁষাঘেঁষি করে চলাফেরা করে বলে গর্তগুলির অভ্যন্তরস্থ ডিম ও বাচ্চার অবস্থা লক্ষ্য করবার উপায় ছিল না। অগত্যা দিবাবসানে বাসাটাতে একদিন আগুন ও প্রচুর ধোঁয়া প্রয়োগ করলাম। অধিকাংশ বোলতা মৃত্যুমুখে পতিত হলেও কতকগুলি উড়ে পলায়ন করেছিল। পরের দিন গিয়ে দেখলাম যারা পালিয়ে গেছিলো তারা বাসায় ফিরে এসেছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই কম। উত্তেজিত ভাবে তারা প্রত্যেকটি গর্তে মস্তক প্রবেশ করিয়ে বারংবার পরীক্ষা করে দেখছিল। বাসার দিকে অগ্রসর হতেই তারা ডানা প্রসারিত করে উত্তেজিত ভাবে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। কেউ কিন্তু বাসা

ছেড়ে উড়ে এলো না। তথাপি ভয়ে পিছিয়ে গেলাম এবং টেলি-মাইক্রোস্কোপের সাহায্যেই গর্তগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। বাসাটার মধ্যস্থলে কতকগুলি গর্তের মুখ সাদা টুপির মত পদার্থে আবৃত। বাকী গর্তগুলি সম্পূর্ণ অনাবৃত। বাসাটা থালার মত চ্যাপ্টা এবং কতকটা গোলাকার। গর্তগুলি বাসার ধারের দিক থেকে মধ্যভাগে ক্রমশঃ লম্বায় বড় হয়ে গেছে। ছোটবড় বিভিন্ন গর্তের মধ্যে বয়সের তারতম্য অনুযায়ী বিভিন্ন আকৃতির বাচ্চা ও ডিম দেখা যাচ্ছিল। গর্তগুলির মুখ নীচের দিকে। বাচ্চাগুলিও নীচের দিকেই মুখ করে রয়েছে। অপেক্ষাকৃত ছোট বাচ্চাগুলি প্রায় নিশ্চল ভাবেই অবস্থান করছিল; কিন্তু সর্বাপেক্ষা লম্বা গর্তগুলির অভ্যন্তরে হলুদ বর্ণের পরিপুষ্ট বাচ্চাগুলির অদ্ভুত একটা গতিভঙ্গী লক্ষ্য করলাম। সর্বাপেক্ষা বড় বড় বাচ্চাগুলির প্রত্যেকেই তাদের দেহের ঊর্ধ্বভাগ ধীরে ধীরে চক্রাকারে আন্দোলিত করছিল; বাচ্চাগুলি যে কেন এরূপ করছিল, তার কারণ কিছুই বুঝতে পারলাম না। পরের দিন দেখলাম বাসায় বোলতার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করতেই বোঝা গেল ঢাকনায় আবদ্ধ গর্তগুলি থেকে নতুন নতুন বোলতা বের হয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করছে।

যাহোক বোলতার সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাবার পূর্বেই বাসাটাকে তুলে আনবার মতলব করলাম। ধোঁয়া প্রয়োগে বোলতাগুলিকে তাড়িয়ে দিয়ে বাসাটাকে তুলে এনে পরীক্ষাগারে স্থাপন করলাম। দু-তিন দিন পরেই পুনরায় কিছু নতুন বোলতার আবির্ভাব ঘটলো। কিন্তু তারা কেউ বাসা ছেড়ে বাইরে বেরুত না। ইতিমধ্যে বাচ্চাগুলির মস্তক আন্দোলনের প্রকৃত কারণ বোঝা গেল। বড় বাচ্চাগুলি পুত্তলীতে রূপান্তরিত হবার সময় এরূপভাবে সূতা বুনে গর্তের মুখ বন্ধ করে দেয়। সূতা এত সূক্ষ্ম যে ম্যাগ্নিফাইয়িং গ্লাসের সাহায্য ছাড়া দেখা যায় না। মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বারংবার এরূপ সূক্ষ্ম সূতা জড়াবার ফলে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক সময়ের মধ্যেই গর্তের মুখে সাদা টুপির মত একটা আবরণী গড়ে ওঠে। ঢাক্না নির্মিত হবার পর বোলতার অপরিণত বাচ্চাটা সেখানে নিশ্চিন্ত মনে নিশ্চলভাবে

অবস্থান করে। কিছুকাল পরে ধীরে ধীরে কীড়াটা পুত্তলীর আকার ধারণ করে। এই অবস্থায় কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর উপরের পাত্‌লা খোলস পরিত্যাগ করে ডানাসমেত পূর্ণাঙ্গ বোলতা গর্তের ঢাক্‌না কেটে বেরিয়ে আসে।

যাহোক বাসাটাকে পরীক্ষাগারে রাখবার পর দিন-দশেকের মধ্যেই প্রায় দু-শতাধিক নতুন বোলতা বেরিয়ে এসে পুনরায় বাসাটাকে ঢেকে ফেলবার উপক্রম করলো। এদের অনেকেই বাইরে থেকে খাদ্য এবং বাসা নির্মাণের উপযোগী পদার্থ সংগ্রহ করে পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক ভাবেই কাজ চালাতে আরম্ভ করেছিল।

এই সময় একদিন পরীক্ষাগারে কয়েকজন দর্শক এসেছিলেন। বোলতা পুষতে দেখে তাঁরা বিশেষ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। একটু দূরে দাঁড়িয়েই তাঁদের নিকট ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছিলাম। ইতিমধ্যে দর্শকদের মধ্যে একজন ধূমপান করতে আরম্ভ করেছিলেন। দু-চার মিনিট পরেই বোলতাগুলি যেন অকস্মাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং দুই-একটি বাসা ছেড়ে উড়ে এসে একজন দর্শককে দংশন করে। পরে বুঝেছিলাম—তামাকের ধোঁয়াই এই উত্তেজনার কারণ। যাহোক এই ঘটনার পরে আর বোলতাগুলি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না। অবশেষে ক্লোরফর্ম গ্যাস প্রয়োগে বোলতাগুলিকে অজ্ঞান করে একে একে অধিকাংশ বোলতার ডানা কেটে দিলাম। তার ফলে বোলতাগুলি বাসার সমস্ত কাজই চালাতে পারতো কিন্তু উড়ে এসে কাকেও দংশন করবার সাধ্য ছিল না। যাদের ডানা কাটা হয় নি—অল্প সংখ্যক হলেও তারাই বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে আসতো। কিন্তু তার ফলেই বোধ হয় বিপদ দেখা দিল। বাসার প্রয়োজনানুরূপ সরবরাহ হচ্ছিল না। গায়ের রঙের পরিবর্তন দেখে বোঝা গেল, খুব সম্ভব উপযুক্ত খাদ্যাভাবে অনেকগুলি বাচ্চাই রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। হঠাৎ একদিন দেখা গেল মাছির মত অতি ক্ষুদ্র এক জাতীয় অদ্ভুত পতঙ্গ কোন কোন গর্তে ঢুকে রুগ্ন বাচ্চাগুলিকে চুষে খেয়ে ফেলেছে। বাসাটায় গর্ত অনেক এবং প্রায় প্রত্যেক গর্তেই ডিম অথবা বাচ্চা ছিল।

অল্প সংখ্যক বোলতার পক্ষে এতগুলি বাচ্চার তদারক সম্ভব হচ্ছিল না। কাজেই মড়ক অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তদুপরি মাছির আক্রমণে অতি শীঘ্রই বাসার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়লো। এই নানা অসুবিধার জন্যে কিছুকাল পরে পুনরায় লাল-পিঁপড়ে নিয়ে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হতে হলো। যাহোক, বোলতা প্রতিপালনের সময় তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কে যা লক্ষ্য করেছিলাম, সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করছি।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন জাতীয় অনেক রকম বোলতা দেখা যায়। কয়েক জাতীয় বোলতা বৃক্ষকোটরে অন্ধকার গহ্বরে অথবা অনেক সময় মাটির নীচে গর্ত খুঁড়ে বলের মত গোলাকার বাসা নির্মাণ করে। আবার কতকগুলি ঘরের চালার নীচে, গাছের ডালে অথবা নির্জন স্থানে কোনও কিছুর আড়ালে থালার মত চ্যাপ্টা বাসা তৈরী করে বসবাস করে। গর্তবাসী বোলতারা প্রথমতঃ অসংখ্য গর্ত সমন্বিত চ্যাপ্টা থালার মত তিন-চার স্তরে বাসা নির্মাণ করে সর্বশেষে সেগুলির চতুর্দিকে গোল করে একটা শক্ত আবরণে ঢেকে দেয়। এজন্য বাসাটাকে বাইরে থেকে বলের মত গোলাকার দেখায়, কিন্তু ভিতরে কুঠরিগুলি বিভিন্ন স্তরে পরপর সজ্জিত থাকে। শীতের কিছু পূর্বে এই জাতীয় রাণী-বোলতার যৌন-মিলন ঘটে। যৌন-মিলনের পর পুরুষগুলি মরে যায়। গর্ভবতী রাণী সারা শীতকালটা সুবিধামত কোনও স্থান নির্বাচন করে খড়কুটা বা অন্য কোনও শক্ত জিনিস আঁকড়ে ধরে শীত ঘুমে কাটিয়ে দেয়। শীতের অবসানে সে বাসা বাঁধবার জন্যে স্থান নির্বাচনে বহির্গত হয়। স্থান নির্বাচন হবার পর সে বারংবার পরিভ্রমণ করে দেখে এবং আনন্দে অধীর হয়েই যেন নানা প্রকার গতিভঙ্গী করে অবশেষে অনেকক্ষণ ধরে প্রসাধনে রত হয়। তারপর বাসার চতুর্দিকে বারংবার চক্রাকারে উড়তে উড়তে কোনও পুরাতন বৃক্ষকাণ্ড বা অন্য কোনও শুষ্ক কাষ্ঠের উপর বসে তার কিয়দংশ কুরে নেয়। সেই পদার্থের সঙ্গে মুখের লালা মিশ্রিত করে মণ্ডের মত প্রস্তুত করে। এই মণ্ডই বোলতার বাসা নির্মাণের প্রধান উপকরণ। বার বার এই মণ্ড সংগ্রহ করে রাণী প্রথমতঃ চারটি কোষ বা গর্ত নির্মাণ করে তার মধ্যে ডিম পাড়ে। ডিম ফোটবার পর

নানা প্রকার কীট-পতঙ্গ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসের টুক্‌রা মণ্ডের মত করে বাচ্চাগুলিকে খাওয়াতে থাকে। ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি গর্ত নির্মাণ করে তার মধ্যেও ডিম পেড়ে রাখে। এগুলিকে প্রতিপালন করতে করতেই প্রথম চারটি গর্ত থেকে চারটি কর্মী-বোলতা নির্গত হয়ে বাসার কাজে রাণীকে সাহায্য করতে আরম্ভ করে। আরও কিছুকাল পর যখন দশ-বারোটি কর্মী জন্মগ্রহণ করে, তারাই বাসা নির্মাণ, খাদ্য আহরণ প্রভৃতি যাবতীয় কাজ করে থাকে। রাণীকে তখন থেকে আর কোনও কাজ করতে হয় না। সে কেবল গর্তে গর্তে ডিম পেড়ে যায়।

আমাদের দেশের হল্‌দে রঙের বড় বোলতা ও খয়েরী রঙের ক্ষুদে বোলতারা গাছের ডালে, চালার নীচে অথবা আনাচে-কানাচে বাসা নির্মাণ করে। মৌমাছির চাকের গর্তগুলি যেমন শয়ানভাবে পাশের দিকে প্রসারিত থাকে, হল্‌দে বোলতার চাকের গর্তগুলি সেরূপে নির্মিত হয় না। এদের গর্তগুলি থাকে নীচের দিকে মুখ করে খাড়াভাবে। শীতের অবসানে রাণী বোলতাই প্রথমে বাসা নির্মাণ সুরু করে। গর্তের পত্তন হয়ে গেলেই তার দেয়ালের গায়ে ভিতরের দিকে একটি ডিম পেড়ে আট্‌কে রাখে। ডিমটি দেয়ালের গায়ে সমকোণে অবস্থান করে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবার সঙ্গে সঙ্গে গর্তটাকে লম্বায় ক্রমশঃ বাড়াতে থাকে। বাচ্চাটা নীচের দিকে মুখ করে থাকলেও কোনও ক্রমেই গর্ত থেকে পড়ে যায় না। এইরূপে প্রথমতঃ কয়েকটি কর্মী নির্গত হলে তারাই গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজের ভার গ্রহণ করে এবং নতুন নতুন গর্ত নির্মিত হওয়া মাত্রই রাণীরা তার মধ্যে ডিম পেড়ে দেয়। এক-একটা বাসায় কতকগুলি রাণী এবং কতকগুলি পুরুষ বোলতা থাকে। কিন্তু কর্মীদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। বাসার উপর অথবা আশেপাশেই এদের মিলন সংঘটিত হয়ে থাকে। মিলনের পর পুরুষেরা সাধারণতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রাণী-বোলতা নতুন বাসার পত্তন করে সারা বছর ডিম পাড়বার পর মৃত্যু বরণ করে। বছরের শেষের দিকে অর্থাৎ শীত আগমনের পূর্বেই বাসার মধ্যে নতুন নতুন পুরুষ ও রাণী-বোলতার আবির্ভাব ঘটতে থাকে। পুরুষ-বোলতাগুলি রাণীদের আগে জন্মগ্রহণ

করে। রাণীদের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত পুরুষ-বোলতাগুলি শ্রমিকদের সেবা-শুশ্রূষায় অতি সুখে পরিবর্ধিত হতে থাকে। তারা বাসার মধ্যে অলস ভাবে ঘুরে বেড়ায় অথবা সেচ্ছা-বিহারে বহির্গত হয়ে নতুন পত্রপল্লবের মধু খেয়ে সন্ধ্যার পূর্বে বাসায় আসে। মৌমাছির ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তারা অপরিণত বাচ্চাগুলিকে 'রয়েল-জেলী' প্রদান করে ইচ্ছামত রাণী-বোলতা উৎপাদন করে থাকে। 'রয়েল-জেলী' কম পরিমাণে দেওয়া হয় বলেই কর্মী-মৌমাছির উৎপত্তি হয়। রাণী-মৌমাছি আকৃতিতে অনেক বড়। তার জন্যে চাকের মধ্যে অনেক বড় গর্ত নির্মিত হয় এবং কর্মীরা তাতে প্রচুর পরিমাণে 'রয়েল-জেলী' রেখে দেয়। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে কর্মীদের গর্ত হতে অথবা যে কোনও স্থান হতে ডিম এনে 'রয়েল-জেলী' পূর্ণ রাণীর গর্তে রাখলে সেখান হতে রাণীই উৎপন্ন হয়ে থাকে। এতেই বোঝা যায়—'রয়েল-জেলী'র পরিমাণের তারতম্যের উপরই পুরুষ রাণী অথবা কর্মীদের উৎপত্তি নির্ভর করে। বোলতাদের মধ্যেও রাণীর গর্তটা কর্মীদের গর্ত অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় হয়। তা ছাড়া কর্মীদের গর্তের মুখের ঢাকনাটি প্রায় চ্যাপ্টা ; কিন্তু রাণীর গর্তের ঢাকনা গোলাকার টুপির মত! এরাও বাচ্চাগুলিকে 'রয়েল-জেলী'র মত একটা অপূর্ব পদার্থ খাইয়ে ইচ্ছামত কর্মী, পুরুষ অথবা রাণী উৎপাদন করে থাকে। এই শক্তিশালী পদার্থের প্রভাবে কোনও অজ্ঞাত উপায়ে রাণীরা ডিম পাড়বার যন্ত্ররূপে পরিণত হয় আর কর্মীরা ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ উপেক্ষা করে সমাজেরর জন্য আত্মোৎসর্গ করে থাকে।

## ডীমরুলের রাহাজানি

জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্নে একদিন বেলগাছিয়া রোড দিয়ে যেতে যেতে দেখতে পেলাম রাস্তার এক পাশে কালো রঙের একদল ক্ষুদে পিঁপড়ে সার বেঁধে চলেছে। নিকটেই রাস্তার উপর রেল-লাইনের পুল। পিঁপড়েরা এই রেল-পুলের বাঁধের নীচেই একটা গর্তের মধ্যে ঢুকছিল। একটু লক্ষ্য করতেই দেখা গেল—মাঝারি গোছের একটা কুনো ব্যাং পিঁপড়ের লাইনের প্রায় দু-তিন ইঞ্চি তফাতে ওৎ পেতে বসে আছে। ব্যাংটাকে এইভাবে নিরিবিলি চুপচাপ বসে থাকতে দেখে বড়ই কৌতূহল হলো—দেখা যাক কি করে। অনেকক্ষণ কিছুই করলো না—কেবল মাঝে মাঝে অদ্ভুত উপায়ে গলার নীচের পর্দাটাকে কাঁপাতে লাগলো। চলে যাব ভাবছি এমন সময় একটা পিঁপড়ে দল ছেড়ে ব্যাংটার একটু ধার ঘেঁষে অগ্রসর হওয়া মাত্রই চোখের নিমেষে সে তাকে গলাধঃকরণ করে ফেললো। কেবল টক্ করে একটু শব্দ শোনা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। কোন ফাঁকে যে জিভে ঠেকিয়ে পিঁপড়েটাকে মুখে পুরে দিল তা লক্ষ্য হলো না। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম—পিঁপড়ে খাবার লোভেই ব্যাংটা ওৎ পেতে বসে আছে। অল্প সময়ের মধ্যেই সে আরও দুটা পিঁপড়েকে টক্ টক্ শব্দ করে গিলে ফেললো। পিঁপড়ের সারের মধ্যে মাথা মোটা খুব বড় বড় সৈন্য শ্রেণীর পিঁপড়েরা মাঝে মাঝে আনাগোনা করছিল। হঠাৎ ওই রকমের একটা সৈনিক-পিঁপড়ে লাইন ছেড়ে ব্যাংটার সম্মুখীন হওয়া মাত্রই সে টক্ করে তাকে মুখে

পুরে ফেললো এবং সঙ্গে সঙ্গে কল কল শব্দে একটা করুণ আর্তনাদ শুনতে পেলাম। ব্যাংটা ছটফট করে এদিক ওদিক লাফাচ্ছে আর এক রকম অদ্ভুত শব্দ করছে। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম—পিঁপড়েটার অর্ধেকটা তার মুখের বাইরে রয়েছে। বোধ হয় জিভ ঠেকিয়ে তাকে গেলবার সময় সে ব্যাঙের জিভ কামড়ে ধরেছে। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ব্যাংটা ইতস্ততঃ লাফালাফি করছিল। পকেটে একটুখানি 'কঙ্গো-রেড' ছিল। হাতের কাছে কিছু না পেয়ে তারই খানিকটা ব্যাংটার গায়ের উপর ছড়িয়ে দিলাম। চিহ্ন রাখবার উদ্দেশ্য এই যে, এভাবে জব্দ হয়েও সে আবার পিঁপড়ে শিকারের জন্য কালও এখানে আসে কিনা। ব্যাংটা কিছুক্ষণ ছটফট করে মুখ ঘষে পিঁপড়েটাকে ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করলো, অবশেষে বাঁধের পাশেই একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

তার পরের দিন বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় সেখানে গিয়ে দেখি—পিঁপড়ের সার আগের মতই রয়েছে, কিন্তু ব্যাঙের দেখা নেই। অনুসন্ধানের ফলে পরে জানতে পেরেছি যে, ব্যাঙেরা সাধারণতঃ দিনের আলোতে আহারান্বেষণে বের হয় না। পড়ন্ত বেলায় অন্ধকারেই তারা শিকার করে থাকে। যাহোক, ব্যাঙের আগমনের অপেক্ষায় বসে আছি। প্রায় দশ-বারো হাত দূরে ঘাসের উপর এক খণ্ড শুষ্ক প্যাঁকাটি পড়েছিল—একটা ভীমরুল সেই প্যাঁকাটি থেকে চোয়ালের সাহায্যে কুরে কুরে কি যেন সংগ্রহ করছিল। মনে হলো যেন বাসা নির্মাণ করবার উপকরণ সংগ্রহ করছে। একমনে তাই দেখছি। ইতিমধ্যে দেখি—সওয়া ইঞ্চি কি দেড় ইঞ্চি লম্বা একটা সাদা রঙের শোঁয়াপোকা, কখনও বা ঘাসের উপর দিয়ে কখনও বা নীচে দিয়ে দিশাহারা হয়ে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে। একটা হল্‌দে রঙের বোলতা তাকে তাড়া করেছে। শোঁয়াপোকাটা বোলতার কাছ থেকে প্রায় সতেরো-আঠারো ইঞ্চি দূরে ঘাসের নীচ দিয়ে চলে গিয়েছিল বলে বোলতার চোখে পড়ে নি। সে এক বার ঘাসের নীচে ঢুকে, এক বার উপরে উঠে মরিয়া হয়ে যেন শোঁয়াপোকার সন্ধান করছিল। শোঁয়াপোকাটা যদি এক স্থানে চুপ করে বসে থাকতো, তবে বোধ হয় বোলতা সহজে তার সন্ধান

পেত না ; কিন্তু প্রাণভয়ে ছোটবার ফলেই এবার বোলতা তাকে দেখে ফেললো এবং তৎক্ষণাৎ উড়ে এসে তার ঘাড় কাম্‌ড়ে ধরলো। তখন সুরু হলো একটা ভীষণ ওলট-পালট কাণ্ড। শোঁয়াপোকাটা প্রাণপণে ছুটছে আর বোলতা তাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করছে—এর ফলে একবার বোলতা নীচে পড়ছে, শোঁয়াপোকাটা উপরে উঠছে, আবার শোঁয়াপোকা নীচে পড়ছে আর বোলতা তার পিঠের উপর চেপে বসছে। ওর‍ূপ ধস্তাধস্তি করতে করতে তারা প্যাঁকাটিটার খুব কাছে এসে পড়লো। শোঁয়াপোকাটার আর চলবার সামর্থ্য নেই—বোলতার পুনঃপুনঃ দংশনে একেবারে নির্জীব হয়ে আসছিল। তখন বোলতা তার পেটের দিকের খানিকটা অংশ চিরে ফেললো। সবুজ রঙের নাড়ীভুঁড়ি বের করে সে তা কুরে কুরে খেতে লাগলো। খানিকক্ষণ পরেই আবার উপরে উঠে শোঁয়াপোকার দেহ দ্বিখণ্ডিত করে লেজের দিকের বড় অংশ থেকেই কুরে কুরে খেতে লাগলো। ইতিমধ্যেই হঠাৎ কোত্থেকে একটা ভীমরুল উড়ে এসে ছোট প্যাঁকাটিটার কাছেই বসে ব্যস্তভাবে এদিক-ওদিক কি যেন দেখতে লাগলো। ভীমরুলটার অবস্থা দেখে মনে হলো সে যেন ইতিপূর্বেই কিছু একটা ঘটনার আঁচ পেয়েছিল, কিন্তু ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে পারে নি। কারণ ইতিমধ্যেই সে কাজ বন্ধ করে মাথা উঁচিয়ে যেন কিছু একটা অনুধাবন করবার চেষ্টা করছিল। এবার ঘুরে বসতেই বোলতার উপর তার নজর পড়লো এবং তৎক্ষণাৎ উড়ে গিয়ে বোলতাকে আক্রমণ করলো। এইর‍ূপ একটা প্রবল শত্রুর আচমকা আক্রমণে বোলতাটা বিভ্রান্ত হয়ে শিকার ছেড়ে উড়ে গেল, কিন্তু বেশী দূর না গিয়ে আবার ঘুরে এলো। ভীমরুলটা ততক্ষণে শিকারটাকে খাবার উদ্যোগ করছিল। বোলতাকে পুনরায় আসতে দেখে শিকার ছেড়ে সে তাকে আক্রমণ করতে গেল। বোলতা লড়াই না করে ঘাসের নীচ দিয়ে এসে শোঁয়াপোকার কর্তিত দেহখণ্ড মুখে নিয়ে উড়ে গেল। ভীমরুল কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়—সেও বোলতার পিছু ধাওয়া করলো। চেয়ে দেখলাম, কিছু দূরে গিয়ে বোলতা ও ভীমরুল উভয়েই পুলের অপর পার্শ্বে সহসা যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। এত

শীঘ্র তারা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল ? নিকটে তেমন কোনও গাছপালাও ছিল না, তবে কোথায় যাবে ? দেখবার জন্যে খানিকটা অগ্রসর হয়ে পুলের অপর পার্শ্বে গেলাম। কোথাও কিছু নেই। কিছুক্ষণ এদিক-সেদিক লক্ষ্য করতেই দেখতে পেলাম, বাঁধের ঠিক উপরেই পুলের তলায় বেশ একটু পরিষ্কার স্থানেই প্রকাণ্ড একটা বোলতার বাসা। বাসাটার ব্যাস প্রায় দশ ইঞ্চি হবে। অজস্র বোলতা বাসাটা ঘিরে রয়েছে। তারই এক পাশে সেই ভীমরুলটার সঙ্গে বোলতাদের তুমুল লড়াই বেধে গেছে। নিকটে যেতে ভরসা হলো না। একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। ভীমরুলটা যেন বোলতার চাকের মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করে দিয়েছে। যাকে কাছে পাচ্ছে তাকেই হুল ফুটিয়ে এবং কামড়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে। বোলতারাও বিপুল পরাক্রমে পাঁচ-সাতটা একত্র হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে কামড়াবার চেষ্টা করছে। ভীমরুল এক দিকে একটা বোলতাকে কাম্‌ড়ে ধরছে, তন্মুহূর্তেই অপর দিক থেকে চার-পাঁচটা বোলতা এসে তাকে আক্রমণ করছে। একটা মাত্র ভীমরুলই যেন সমস্ত চাকটাকে চষে ফেলছিল। দেখলাম চার-পাঁচটা ছিন্নশির বোলতা ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ করে মাটিতে পড়ে গেল।

প্রায় মিনিট দশেক পর্যন্ত ভীমরুলটা প্রাণপণে লড়াই করে অবশেষে রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করলো। ভীমরুলটা উড়ে যাবার পর বোলতারা ডানা খাড়া করে শুঁড় উঁচিয়ে চাকটার উপর অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। কেউ কেউ আবার প্রত্যেকটি গর্তে মুখ ঢুকিয়ে কি যেন পরীক্ষা করে দেখছিল। প্রায় পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যেই দেখলাম কতকগুলি বোলতা ডানা উঁচু করে শুঁড় খাড়া করে বাসাটার চতুর্দিকে সারবন্দীভাবে জমায়েৎ হয়েছে। বাকী অধিকাংশ বোলতাই বাসার মধ্যস্থলে জটলা করছে। মনে হলো যেন ভীমরুলের পুনরাক্রমণ আশঙ্কা করেই এরা এভাবে সজ্জিত হচ্ছিল ; কিন্তু বহুক্ষণ অপেক্ষা করেও ভীমরুলের আগমনের কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। তখন বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হলো। বেলা তিনটার সময় ফিরে গিয়ে দেখি—বাসাটাতে কোন গোলমাল নেই। বোলতারা দস্তুরমত কাজকর্ম করছে। মাঝে মাঝে কেউ কেউ বাসা থেকে

উড়ে যাচ্ছে, আবার কেউ কেউ খাদ্য সংগ্রহ করে ফিরে আসছে। বাসাটার খুব নিকটে যেতেই বোলতাগুলি আমাকে দেখবামাত্রই যেন আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তারা ডানা উঁচু করে সকলেই চুপ করে দাঁড়ালো। বিপদ আশঙ্কা করে আমি সরে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ পরেই তাদের সতর্কতার ভাব কেটে গেল এবং পুনরায় বাসার গর্ত তৈরী ও বাচ্চাদের খাওয়াদাওয়ার কাজে মনোনিবেশ করলো। সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত আর কোনও গোলমালের লক্ষণই দেখতে পেলাম না।

তার পর দিন সকাল বেলায় আবার গিয়ে দেখি—ইতিপূর্বেই বাসাটার উপর একটা ভীমরুলের সঙ্গে বোলতাদের তুমুল লড়াই বেধে গেছে। ভীমরুলটা যেন মরিয়া হয়ে যাকে পাচ্ছে তাকেই কামড়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে। ইতিমধ্যেই দেখি আর একটা ভীমরুল এসে বাসাটার চতুর্দিকে চক্রাকারে উড়তে লাগলো। দু-চার বার এরূপভাবে ঘুরে বাসাটার উপর বসেই একটা গর্তে মুখ ঢুকিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গেই চার-পাঁচটা বোলতা এসে তাকে চেপে ধরলো। ভীমরুলটা তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে আর একটা গর্তে মুখ ঢুকিয়ে একটা অপরিপুষ্ট বোলতার কীড়াকে টেনে বের করলো এবং ঘাড়ের দিকে কামড়ে ধরে উড়ে পলায়ন করলো। বোলতাগুলি যেন অসহায়ভাবে কতক্ষণ সেদিকে চেয়ে থেকে সকলে মিলে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ঝন্ ঝন্ শব্দে ডানা কাঁপাতে লাগলো। কিন্তু কেউই ভীমরুলের পশ্চাদ্ধাবন করলো না। অপর ভীমরুলটার সঙ্গে মারামারি তখনও থামে নি। প্রায় পাঁচ-ছয়টা বোলতা ভীমরুলের দংশনে বিকলাঙ্গ হয়ে নীচে পড়ে ছট্‌ফট করছিল। এতক্ষণ লড়াইয়ের ফলে ভীমরুলটাও বিশেষভাবে জব্দ হয়ে পড়েছিল—তার এক দিকের পা বোধ হয় বোলতার দংশনে অসাড় হয়ে যাওয়ায় সে কাৎরাতে কাৎরাতে এক দিক থেকে আর এক দিকে পালাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বোলতারা সুযোগ পেয়ে তাকে যেখানে-সেখানে অবিশ্রাম দংশন করতে লাগলো। ভীমরুলটা অবশেষে একটা বোলতার সঙ্গে জড়াজড়ি করে একেবারে চাক্‌টার কিনারায় এসে পড়তেই আরও দুটা বোলতা এসে আক্রমণ করলো এবং সকলে জড়াজড়ি করে মাটির উপর পড়ে

গেল। তাতেও কি লড়াই থামে! ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাম্‌ড়া-কাম্‌ড়ি করতে লাগলো। এদিকে চাকের বোলতাগুলি পুনরায় ব্যূহ রচনা করে ফেলেছে। চাক্‌টার চতুর্দিকে ডানা উঁচু করে অসংখ্য সান্ত্রী প্রায় নিশ্চল-ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সান্ত্রীদের পরেই একদল কর্মী-বোলতা কেবল গর্তের মধ্যে মুখ গুঁজে গুঁজে বাচ্চাদের তদারক করছে। বাসার মধ্যস্থলে সাদা টুপি দিয়ে মুখ বন্ধ করা কতকগুলি গর্তের চতুর্দিকে চাকের বাকী বোলতাগুলি সমবেত হয়ে মাঝে মাঝে ডানা কাঁপাচ্ছে। তাদের ডানা কাঁপানোর ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ কানে আসছিল। রোদ প্রায় পড়ে এসেছে—এমন সময় দেখি আর একটা ভীমরুল বাসার কাছে এসে উড়তে সুরু করেছে। বোলতাগুলি ভীমরুলের আগমন বুঝতে পেরেই এক সঙ্গে সকলে ডানা কাঁপাতে কাঁপাতে মুখ বাড়িয়ে প্রস্তুত হয়েছিল। ভীমরুলটা একবার বাসার খুব কাছে উড়ে এসে আবার দূরে চলে গেল। কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরেই হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে বাসার উপর পড়লো এবং বোলতাদের সমবেত বাধাদান সত্ত্বেও প্রায় দু-এক মিনিটের মধ্যেই আর একটা বাচ্চা মুখে করে উড়ে গেল। আলো পড়ে আসাতে বোলতারা তখন কি করছিল, দূর থেকে তা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা গেল না। কেবল কতকগুলি বোলতাকে বাসার চতুর্দিকে উড়ে বেড়াতে দেখলাম। কাছে গেলে যদি উড়ে এসে দংশন করে এই ভয়ে তার পর দিন টেলি-মাইক্রোস্কোপের সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে গেলাম। ভীমরুলেরা যখন বোলতার বাচ্চাদের সন্ধান পেয়েছে তখন নিশ্চয় আজ তারা আরও বেশী সংখ্যায় এসে বাচ্চা চুরি করবে—এটা আমার নিশ্চিত ধারণা হয়ে গিয়েছিল। বেলা প্রায় দশটার সময় এসে দেখি—যা ভেবেছিলাম, তাই ঘটেছে। ইতিমধ্যেই তারা বাচ্চা ছিনিয়ে নেবার অভিযান সুরু করে দিয়েছে। সকাল থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত হয়তো তারা বোলতার অনেক বাচ্চা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। যাহোক্‌, রাস্তার অপর পার্শ্বে বাসা থেকে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাত দূরে টেলি-মাইক্রোস্কোপ খাটিয়ে বাসার অবস্থা দেখতে লাগলাম। বাসার সান্ত্রীদের ব্যূহ পূর্বের মতই রয়েছে, কিন্তু বোলতার সংখ্যা অনেক কম বলে মনে হলো। তারা

অনেকেই কেবল ঘন ঘন গর্তের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে বাচ্চাদের তদারক করছিল। আর কতকগুলি কেবল ডানা উঁচু করে নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল। ইতিমধ্যেই এক সঙ্গে দুটা ভীমরুল উড়ে এসে বাসার উপর পড়লো। বোলতাদের সঙ্গে দুই স্থানে ভীমরুলের জড়াজড়ি কামড়া-কামড়ি সুরু হয়ে গেল। দু-এক মিনিটের মধ্যে প্রায় তিন-চারটা বোলতা সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে বাসা থেকেও পড়ে গেল। এর মধ্যে কোন্ ফাঁকে যেন ভীমরুল দুটা বাচ্চা মুখে করে উড়ে গেল। রাস্তার উপরে এসে দেখলাম, নীচে কয়েকটা বোলতা পড়ে ছট্‌ফট করছে। একটা বিকলাঙ্গ ভীমরুলও দেখতে পেলাম। পিঁপড়েদের মহোৎসব লেগে গেছে। তারা অনেকে মিলে বোলতার মৃতদেহ গর্তের দিকে বয়ে নিয়ে চলেছে। একটা অর্ধমৃত ভীমরুলকেও তারা আক্রমণ করেছে, কিন্তু তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না। পিঁপড়েরা তার ঠ্যাং ধরে টেনে আনবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে, কিন্তু সে তাদের নিয়েই কাৎরাতে কাৎরাতে লাইন ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছে। এদিকে বোলতাদের অবস্থা দেখে বোধ হলো যেন তারা খুবই ভয় পেয়ে গেছে। কারণ এই দৃশ্য দেখতে রাস্তায় অনেক লোক জড়ো হয়েছিল। তাদের কেউ কেউ একটু এগিয়ে যেতেই বোলতাদের অনেকেই পিছু হটতে হটতে একেবারে বাসার পিছন দিকে গিয়ে লুকিয়ে রইলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার পূর্ব স্থানে ফিরে আসতে লাগলো। যতই বেলা বাড়ছিল ভীমরুলের সংখ্যা যেন ততই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। একটার পর একটা তো আসছিলই, আবার মাঝে মাঝে এক সঙ্গে দু-তিনটা এসেও বোলতার বাচ্চাগুলি মুখে করে পালাচ্ছিল। এখন মারামারি বড় একটা দেখতে পাওয়া গেল না। খণ্ড যুদ্ধে দু-একটা বোলতা প্রাণ হারাচ্ছিল। ইতিমধ্যে কয়েকটা ছেলে ভীমরুলগুলিকে অনুসরণ করে তাদের বাসস্থান খুঁজে বের করেছে। সন্ধ্যার সময় তারা এসে বললো—প্রায় মাইল খানেক দূরে রাস্তা থেকে কিছু তফাতে একটা নাটা ঝোপের ভিতর ভীমরুলরা প্রকাণ্ড বাসা বেঁধেছে। সেখান থেকেই উড়ে এসে তারা বোলতার চাকের উপর এরূপ রাহাজানি করছে।

চতুর্থ দিন সকালে গিয়ে দেখলাম—বোলতার সংখ্যা খুবই কম। তারা সকলে মিলে চাকটার মধ্যস্থলে জমায়েৎ হয়েছে। পূর্বেই বলেছি, মধ্যস্থলে সাদা টুপি-ঢাকা কতকগুলি গর্ত ছিল। তার আশেপাশের গর্তগুলির মুখ খোলা এবং টেলি-মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে ভিতরের বাচ্চাগুলিকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু বাসার কিনারার চতুর্দিকের গর্তগুলিকে সম্পূর্ণ খালি দেখা গেল। বোধ হয় ভীমরুলেরা ঐ সব গর্তের সবগুলি বাচ্চাই নিয়ে গিয়েছিল। আজও দেখলাম, ভীমরুলেরা পূর্বের মতই আনাগোনা করছে। কেউ কেউ বাচ্চাগুলিকে নিয়ে যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ রিক্ত হস্তেই ফিরে যাচ্ছে। লড়াই তখন এক প্রকার নেই বললেই চলে। ভীমরুল আসবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই স্থানের বোলতাগুলি পিছু হটে গিয়ে বাসার পিছনদিকে লুকিয়ে থাকে, আবার চলে গেলেই তারা স্বস্থানে এসে জমায়েৎ হয়। এই সময়েও ভীমরুলের সম্মুখে পড়ে দু-একটা বোলতা মারা যাচ্ছিল। এবার খুব ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম---অনাবৃত গর্তের বাচ্চাগুলি অনবরত কেবল মাথা ঘোরাচ্ছে। ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে টেলি-মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রটাকে আরও নিকটে এনে বসালাম। অনেকক্ষণ লক্ষ্য করবার পর বোঝা গেল বাচ্চাগুলিও বিপদের কথা আঁচ করেই যেন মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুতা বের করে গর্তের মুখে ঢাকনা প্রস্তুত করছে। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কয়েকটা গর্তের ঢাকনা গড়ে উঠতে দেখলাম। বাচ্চারা নিজেই মুখ থেকে সূতা বের করে গর্তের ঢাকনা বন্ধ করে দেয়। পুত্তলীতে রূপান্তরিত হবার পূর্বেই এরা ঢাকনা বুনতে সুরু করে। এই ঢাকনা এত শক্ত যে হাতে টেনে ছেঁড়া যায় না। ভীমরুলেরা এতক্ষণ ঢাকনা কেটে পুত্তলী বের করে নেবার চেষ্টা করে নি, খোলামুখ গর্তের ছোট ছোট বাচ্চাগুলিকেই নিয়ে গেছে। এবার অন্য কিছু না পাওয়ায় তারা ঢাকনা ছিঁড়ে পুত্তলী বের করবার চেষ্টা করতে লাগলো। এই কাজে অনেক সময় লাগছিল। এই সুযোগে বোলতারা এসে আবার দলবদ্ধভাবে তাদের আক্রমণ করতে লাগলো। কিন্তু ভীমরুল একে বাচ্চার স্বাদ পেয়েছে তাতে অতি দুর্ধর্ষ কোপন স্বভাব; কিছুতেই হটবার পাত্র নয়। মারামারিতে দু-একটা স্থানচ্যুত হলেও অন্যেরা

এসে সেই স্থান দখল করে টুপি কেটে পুত্তলী বের করে নিতে লাগলো। বোলতারা দলে দলে প্রাণ দিয়েও তাদের রক্ষা করতে পারলো না। পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যেই ভীমরুলেরা বোলতাদের প্রায় সমস্ত বাচ্চা ও পুত্তলী ছিনিয়ে নিয়ে গেল। অবশিষ্ট বোলতারা ভীমরুল দেখলেই আর ভয়ে কাছে ঘেঁষতো না—বাসার পিছনে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করতো। বাসায় যে দু-চারটা বাচ্চা তখনও অবশিষ্ট ছিল, কর্মী ও খাদ্যের অভাবে তাদের মধ্যে আর এক নতুন উপদ্রব আরম্ভ হলো। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এক-প্রকার ক্ষুদে মাছি এসে তাদের আক্রমণ করে শরীরের রস চুষে খেতে লাগলো। এইরূপে প্রায় আট-নয় দিনের মধ্যেই অতবড় বোলতার বাসাটা প্রবল অত্যাচারীর কবলে পড়ে একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল।

## নেউলে পোকার জন্ম-রহস্য

গবেষণাগার-সংলগ্ন উদ্যানে একদিন লজ্জাবতী লতার সংকোচন সম্পর্কে একটা বিশেষ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করছিলাম। বেলা তখন দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি। উদ্যানের পাশেই ছোট ছোট আয়াপানের গাছ সারবন্দিভাবে লাগানো হয়েছে। হঠাৎ নজরে পড়লো—প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা ধূসর বর্ণের একটা শোঁয়াপোকা আমার পাশ দিয়েই অতি দ্রুতগতিতে ছুটে চলছে। অস্বাভাবিক গতিভঙ্গীর জন্যে পোকাটার উপর নজর না দিয়ে উপায় ছিল না। কাছেই ছিল আয়াপানের ঝোপ। মনে হলো যেন রোদের প্রখর তাপ সহ্য করতে না পেরে সে আয়াপানের গাছগুলির দিকেই ছুটে যাচ্ছে। যাহোক, পোকাটা আমাকে অতিক্রম করে আরও প্রায় আট-দশ হাত অগ্রসর হয়ে একটা আয়াপানের পাতার উপর উঠে পড়লো এবং দম নেবার জন্যেই যেন কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর আবার এ-পাতা ও-পাতার উপর অস্থিরভাবে ছুটাছুটি আরম্ভ করে দিল। ছুটাছুটি করলেও তার গতিবেগ যে ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়ে আসছে—এটা পরিষ্কারভাবেই মনে হচ্ছিল। প্রায় দশ-বারো মিনিট ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করবার পর একটা পাতার উপর সে নির্জীবের মত চুপ করে রইলো। চলবার সময় শোঁয়াপোকার শরীর অনেকটা প্রসারিত হয়ে থাকে, কিন্তু নিশ্চলভাবে অবস্থান করবার সময় যথেষ্ট সংকুচিত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও দেখা গেল—শোঁয়াপোকাটার শরীর ক্রমশঃই সংকুচিত হচ্ছে। আধ ঘণ্টাকাল এভাবে কাটবার পর কাঠি দিয়ে

একটু নেড়ে দেখলাম—পোকাটার জীবনস্পন্দন রয়েছে বটে, কিন্তু তার আর নড়াচড়া করবার ক্ষমতা নেই। কিছুকাল পূর্বেই গতিবেগে জীবনী-শক্তির যে প্রাচুর্য লক্ষ্য করেছিলাম, অকস্মাৎ এমন কি ঘটলো, যাতে সে একেবারে নির্জীব হয়ে পড়লো ? পুত্তলীতে রূপান্তরিত হবার কিছুকাল পূর্বে এই জাতীয় শোঁয়াপোকা কিছুকাল নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করে বটে, কিন্তু গুটি বাঁধবার জন্যে আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। তখন মুখ দিয়ে গায়ের শোঁয়াগুলিকে ছিঁড়ে ফেলে এবং মুখ-নিঃসৃত আঠালো সুতার সাহায্যে শরীরের চতুর্দিকে ডিম্বাকৃতি আবরণী গড়ে তোলে। এই আবরণীই হলো শোঁয়াপোকার গুটি। যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হলেও এক্ষেত্রে কিন্তু সেরূপ গুটি নির্মাণের কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। তবে কি এটা খোলস পরিবর্তনের পূর্বাভাস ? খোলস পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবার জন্যে কৌতূহল তীব্র হয়ে উঠলো। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর দেখা গেল—শোঁয়াপোকার শরীরের চামড়া ভেদ করে তিন-চার মিলিমিটার লম্বা সূতার মত সূক্ষ্ম একটি কীড়া, শোঁয়াগুলির উপরে উঠে এসে ঠিক জোঁকের মত এদিক-ওদিক শুঁড় আন্দোলন করতে লাগলো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও তিন-চারটা কীড়াকে একই ভাবে কিলবিল করে শোঁয়াগুলির উপরে উঠে আসতে দেখলাম। আট-দশ মিনিটের মধ্যেই আরও প্রায় বিশ-পঁচিশটা পোকা শরীরের নানা স্থান থেকে বেরিয়ে এলো। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একটি কীড়াও শোঁয়াপোকাটার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে নি এবং প্রত্যেকটিই শোঁয়াগুলির উপরিভাগে অবস্থান করে শরীরের সূক্ষ্মাগ্র ভাগ ঊর্ধ্ব দিকে প্রসারিত করে কেবলই চতুর্দিকে সঞ্চালন করছিল। মাছ, মাংস বা ময়লা পচে গেলে যেরূপ পোকা উৎপন্ন হয়, এই কীড়াগুলি দেখতে প্রায় সেরকম, কিন্তু আকারে অনেক ছোট। শোঁয়াপোকার শরীর ভেদ করে বের হবার পর কীড়াগুলি শোঁয়া আঁকড়ে অনবরত মস্তক আন্দোলন করছে কেন—তার কারণ বুঝতে না পেরে ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে লাগলাম। সাত আট মিনিটের মধ্যেই দেখা গেল প্রত্যেকটি কীড়ার শরীরের চতুর্দিকে যবের দানার চেয়ে ছোট ছোট সাদা ডিম্বাকৃতির আবরণী গড়ে উঠছে। বুঝতে

বাকী রইল না যে, পোকাগুলি কোনও এক প্রকার পতঙ্গের বাচ্চা ; পুত্তলীতে রূপান্তরিত হবার পূর্বে নিরাপদে অবস্থান করবার জন্য গুটি বাঁধছে। প্রায় মিনিট দশেকের মধ্যেই ছোট ছোট শ্বেত বর্ণের গুটিতে শোঁয়াপোকার শরীরটা প্রায় ঢেকে গেল। শোঁয়াপোকাটাকে নাড়াচাড়া দিয়ে দেখলাম জীবনের কোনও চিহ্নই নেই। গুটি থেকে কিরূপ পতঙ্গ বের হয়, দেখবার জন্যে গুটিসমেত শোঁয়াপোকাটাকে একটা কাচের পাত্রে আবদ্ধ করে রাখলাম। দিন দশেক পরে দুপুরবেলায় একদিন দেখা গেল—গুটির এক পাশে ক্ষুদ্র ছিদ্র কেটে ক্ষুদে পিঁপড়ের মত কালো রঙের এক প্রকার ডানাওয়ালা পতঙ্গ বেরিয়ে আসছে। সবগুলি গুটি থেকে পতঙ্গ বেরিয়ে আসতে প্রায় দু-দিন লেগে গেল। এই ক্ষুদ্রকায় ডানাওয়ালা পতঙ্গগুলি এক জাতীয় নেউলে-পোকা। এই ঘটনার পর অনেক দিনের চেষ্টায় এই জাতীয় নেউলে-পোকাকে শোঁয়াপোকার গায়ে হুল ফুটিয়ে ডিম পাড়তে দেখেছিলাম। শোঁয়াপোকা যখন আহারে ব্যস্ত থাকে তখন নেউলে-পোকা অকস্মাৎ উড়ে এসে তার গায়ের উপর বসে এবং দেহের পশ্চাদ্দেশে অবস্থিত হুলের মত ডিম পাড়বার যন্ত্রটি তার দেহে প্রবেশ করিয়ে ডিম পেড়ে যায়। দেহে ডিম প্রবিষ্ট হবার দিন কয়েক পর্যন্ত শোঁয়াপোকাটা কতকটা স্বাভাবিকভাবেই চলাফেরা করে থাকে ; আসন্ন মৃত্যুর কথা সে মোটেই বুঝতে পারে না। পাঁচ-সাত দিন পর যখন পোকাগুলি শরীরের সারাংশ চুষে খেয়ে বাইরে আসবার চেষ্টা করে তখন শোঁয়াপোকা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ছুটাছুটি আরম্ভ করে দেয়। এর পরই সব শেষ।

কলকাতার কোনও একটি বাড়ীর প্রাঙ্গণে মাঝারিগোছের একটা শিউলি গাছের পাতার গায়ে দেড় ইঞ্চি লম্বা ধূসর বর্ণের একটা কাঁকড়া-মাকড়সা থলির মত বাসা নির্মাণ করে ডিম পেড়েছিল। কয়েক দিন ধরেই তার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিলাম। অধিকাংশ সময়ই মাকড়সাটা ডিম আগলে বসে থাকত, বাসা ছেড়ে বেশী দূরে যেত না। বেলা প্রায় চারটার সময় একদিন দেখা গেল, মাকড়সাটা বাসার বাইরে পাতার এক প্রান্তে চুপ করে বসে আছে। কতক্ষণ এভাবে বসেছিল বলতে পারি না। কিছুক্ষণ বাদে ঘুরে

এসে মাকড়সাটাকে সেই স্থানে একই ভাবে অবস্থান করতে দেখলাম। কিন্তু এবার একটা অদ্ভুত দৃশ্য নজরে পড়লো। অনেকটা কুমোরে-পোকার মত দেখতে প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা একটা সরু লিক্‌লিকে পোকা মাকড়সাটার মাথার উপর এদিক-ওদিক কয়েকবার উড়ে কিছুক্ষণের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। মাকড়সাটা বোধ হয় কোনও বিপদের আভাস পেয়েছিল। কারণ শেষ মুহূর্তে পোকাটা যখন তার কাছ ঘেঁষে চলে যায়, তখনই সে তড়িদ্বেগে ছুটে গিয়ে তার বাসার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। পাঁচ-সাত মিনিট নিঃশব্দে কাটবার পর পোকাটা হঠাৎ আবার কোথা থেকে উড়ে এসে মাকড়সার বাসাটার ঠিক উপরেই অবতরণ করলো। শরীরের পশ্চাদ্দেশ অদ্ভুত ভঙ্গীতে সঞ্চালন করতে করতে পোকাটা বাসার চতুর্দিকে ঘুরেফিরে দেখবার পর বাসার এক মুখ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো। বলা বাহুল্য যে, সব রকমের মাকড়সারা শিকার ধরবার জন্যে জাল পাতে না। তাদের বাসায় প্রবেশের জন্যে অথবা বহির্গমনের জন্যে দুটি করে পথ থাকে। পোকাটা বাসার ভিতরে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করতে না করতেই মাকড়সাটা অন্য মুখ দিয়ে যেন ছিট্‌কে বাইরে এসে পড়লো এবং আত্মগোপন করবার জন্যে পাতার তলার দিকে আশ্রয় গ্রহণ করলো। পোকাটাও তার পিছনে পিছনে বাইরে এসে থেমে থেমে কতকটা যেন নৃত্যের ভঙ্গীতে তাকে খুঁজতে লাগলো। পোকাটা পাতার নীচের দিকে যাওয়ামাত্রই মাকড়সাটা যেন বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মত ছিট্‌কে উপরে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই পোকাটা এসে তার পিঠের উপর চেপে বসলো এবং দেহের পশ্চাদ্ভাগ ধনুকের মত বাঁকিয়ে ক্ষুদ্র একটি ডিম পেড়ে সরে পড়লো। চক্ষের নিমেষেই এতগুলি কাণ্ড ঘটে গেল।

পোকাটা উড়ে যাবার পর মাকড়সাটা যেন কতকটা অভিভূতের মত ধীরে ধীরে তার বাসায় প্রবেশ করলো। পরের দিন সকালে গিয়ে মাকড়সাটাকে দেখতে পাওয়া গেল না। বাসার ভিতরেই রয়েছে স্থির করে পাতাটাকে একটু নাড়া দিতেই মাকড়সাটা বাইরে এসে পাতার মধ্যস্থলে এক স্থানে চুপ করে বসে রইলো। দেখা গেল পিঠের উপরের গতকালের ক্ষুদ্র সাদা পদার্থটি এখন একটা সর্ষের দানার মত বড় হয়েছে। ব্যাপারটা পরিষ্কার

অনুধাবন করতে না পেরে অতি সন্তর্পণে পাতাসমেত মাকড়সাটিকে কাচের পাত্রে বন্দী করে পরীক্ষাগারে রেখে দিলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদেই মনে হলো যেন সর্ষের মত ক্ষুদ্র পদার্থ পূর্বাপেক্ষা অনেকটা বড় হয়ে উঠেছে। মাইক্রোস্কোপের পরীক্ষায় পরিষ্কার দেখা গেল—গোলাকার পদার্থটা আসলে গোলাকার নয়; লম্বাকৃতি একটি কীড়া বা লার্ভা মাত্র। শরীরটাকে বাঁকিয়ে দুই প্রান্ত এক স্থানে রেখেছে বলে গোলাকার বোধ হচ্ছিল। কীড়াটা মাকড়সার পিঠের চামড়া কামড়ে ধরে তার রস-রক্ত চুষে খাচ্ছে। বেলা আড়াইটার সময় কীড়াটা বেশ মোটা একটা মুড়ির আকার ধারণ করলো। অদ্ভুত এদের বাড়বার ক্ষমতা। মাকড়সাটার স্ফীত উদরদেশ অনেকটা সংকুচিত হয়ে পড়েছে এবং তার শরীরে জড়তার লক্ষণ সুস্পষ্ট। আরও ঘণ্টাখানেক বাদে তার হৃৎস্পন্দন একরূপ থেমে এসেছে বলেই মনে হলো। এখন খালি চোখেই দেখা গেল কীড়াটা মাকড়সার উদরদেশ কুরে কুরে খেতে সুরু করেছে। আরও প্রায় আধ ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই উদর থেকে মস্তক পর্যন্ত সর্বাংশ নিঃশেষে উদরসাৎ করে ফেললো। ঠ্যাংগুলি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। মনে হয়েছিল সেগুলি হয়তো তার প্রয়োজনে লাগবে না, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, দেখবার মত কোনও ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব না থাকলেও বোধ হয় গন্ধ বা স্পর্শের সাহায্যেই বুঝে নিয়ে একাদিক্রমে সব কয়টি ঠ্যাং-ই নিশ্চিহ্ন করে ফেললো। প্রায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কীড়াটা তার শৈশব অতিক্রম করে কৈশোরের পুত্তলী রূপ ধারণ করবার আয়োজন করতে লাগলো। খাওয়া শেষ হবার পর কীড়াটা প্রায় আধ ঘণ্টাকাল চুপ করে রইলো। তার পরেই সূচালো মুখটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সূতা বুনতে লাগলো। পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যেই সূতা বুনে শরীরের চতুর্দিকে পাত্‌লা একটা ডিম্বাকৃতির আবরণী গড়ে তুললো। সূক্ষ্ম সূতার আস্তরণের ভিতর দিয়ে তখনও পোকাটার কার্যপ্রণালী পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। ডিম্বাকৃতি গুটির অভ্যন্তরে সে একবার এদিকে মুখ করে আবার বিপরীত দিকে ঘুরে সূতার বেষ্টনী দৃঢ়তর করে তুলছিল। সন্ধ্যার পূর্বেই তার গুটি বাঁধা শেষ হয়ে গেল। গুটির রং হলো এখন গাঢ় বাদামী। গুটির একপ্রান্ত কালো

রঙের টুপির মত পদার্থে আবৃত। আলোর দিকে ধরে দেখা গেল খোলের ভিতর পোকাটা লম্বাটে অবস্থায় নিশ্চেষ্টভাবে রয়েছে। ছয় দিনের মধ্যেই সে পুত্তলীর আকার ধারণ করলো এবং দিন পনেরো পরে গুটির কালো মুখটা কেটে ডানাসমেত একটি পূর্ণাঙ্গ নেউলে-পোকা গুটি থেকে বেরিয়ে এলো।

জীবন্ত কীট-পতঙ্গের দেহে ডিম পেড়ে ভবিষ্যৎ বাচ্চাদের খাদ্যসংস্থানের সুব্যবস্থা করে রাখে, এরূপ অসংখ্য বিভিন্ন জাতীয় পোকা পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়। আমাদের দেশেও এ-জাতীয় বহু সংখ্যক রকমারি পোকা অহরহই নজরে পড়ে। এরা সাধারণতঃ নেউলে-পোকা নামে পরিচিত। বিভিন্ন জাতীয় নেউলে-পোকার দৈহিক-গঠন যেমন বিভিন্ন, দেহ-বর্ণও তেমনি বিচিত্র। এক বা দুই মিলিমিটার থেকে দেড় ইঞ্চি, দুই ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা নেউলে-পোকা দেখা যায়। এফিডিয়াস নামক এক জাতীয় ক্ষুদ্রকায় নেউলে-পোকা অনায়াসে ছোট্ট একটি সূচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে গলে যেতে পারে। এই ক্ষুদ্রকায় নেউলে-পোকারা শস্যাদির অনিষ্টকারী এক জাতীয় সবুজ পোকার শরীরে ডিম পেড়ে থাকে। এই সবুজ পোকাগুলি চারাগাছের কচি পাতা খেয়ে জীবনধারণ করে। এফিডিয়াস পোকারা খুঁজে খুঁজে তাদের শরীরে একটি করে ডিম প্রবেশ করিয়ে দিয়ে যায়। যে-সব স্থানে সবুজ পোকা থাকবার সম্ভাবনা, সে-সব স্থানে দুটি শুঁড় উঁচু করে এফিডিয়াস পোকাদের বেপরোয়াভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। বেপরোয়া বললাম এই জন্যে যে, যখন এরা সবুজ পোকার অনুসন্ধানে ঘোরাঘুরি করে, তখন ম্যাগনিফাইয়িং গ্লাসের সাহায্যে এদের অতি নিকটে বসে কার্যপ্রণালী পরিদর্শন করলেও এরা কিছুমাত্র ভীত হয় না। পোকার দেখা পেলেই উভয় শুঁড়ের বাঁকানো অগ্রভাগের সাহায্যে স্পর্শ করে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেই উল্লাসে যেন অধীর হয়ে ওঠে। তখন শুঁড় দুটিকে অনবরত নাচাতে থাকে। সেই সময় পোকাটার অঙ্গভঙ্গী দেখে তার উল্লাস এবং উত্তেজনার ভাব পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। সবুজ পোকাটাকে তখন শুঁড় দিয়ে বারবার পরীক্ষা করে দেখতে থাকে এবং কিছুক্ষণের জন্যে থেমে

তার পিছন দিকে উপস্থিত হয়। তারপর পিছনের পায়ের সাহায্যে সবুজ পোকার পিঠ আঁকড়ে ধরে এবং শরীরটাকে সম্মুখের দিকে কিঞ্চিৎ উঁচু করে দ্রুতগতিতে ডানা কাঁপাতে আরম্ভ করে। দু-এক সেকেণ্ডের মধ্যেই শরীরের পশ্চাদ্দেশ ধনুকের আকারে বাঁকিয়ে পোকাটার পেটের দিকে হুল ফুটিয়ে দেয়। দু-তিন সেকেণ্ডের মধ্যেই ডিম পাড়া শেষ হয় এবং উড়ে গিয়ে অন্য একটা পোকাকে ধরে। এরূপে ক্রমাগত কয়েকটা পোকার শরীরে এক-একটা করে ডিম প্রবেশ করিয়ে দেয়। সবুজ পোকারা সাধারণতঃ অনেক-গুলি একসঙ্গে অবস্থান করে। কাজেই একটা নেউলে-পোকার পক্ষে তিন-চার মিনিট সময়ের মধ্যে দশ-বারোটা পোকার শরীরে ডিম পাড়ায় কোনই অসুবিধা হয় না। ডিম শরীরে প্রবেশ করবার পর থেকেই সবুজ পোকা ক্রমশঃ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তে থাকে। দু-এক দিনের মধ্যেই তার শরীরের রং বদ্‌লে বাদামী বা ঈষৎ হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং শরীরটা ক্রমশঃ স্ফীত হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে দেহাভ্যন্তরে ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে তার রস-রক্ত চুষে খেতে থাকে। দশ-বারো দিন পরে ডানাওয়ালা পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ শুষ্ক মৃতদেহের শক্ত বহিরাবরণীর মধ্যস্থলে ছিদ্র করে বেরিয়ে আসে। বিভিন্ন জাতীয় নেউলে-পোকার সাহায্যে প্রতিদিন এভাবে বিভিন্ন জাতীয় বহু সংখ্যক অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ বিনষ্ট হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক বিধানে এরূপ সমতা রক্ষিত না হলে কিরূপ গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হতো, তা সহজেই অনুমেয়।

আমাদের দেশে যে সকল নেউলে-পোকা দেখা যায়; তাদের জাতিগত পার্থক্য হিসাবে দৈহিক গঠন ও বর্ণবৈচিত্র্যের পার্থক্য থাকলেও প্রায় প্রত্যেকেরই শরীরের পশ্চাদ্ভাগে দেহের তুলনায় অসম্ভব লম্বা তিনটি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তুর মত পদার্থ দেখা যায়। এগুলিকে সাধারণ তন্তুর মতই মনে হয় বটে, কিন্তু মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করলে দেখা যায় দুটি সূত্রের গায়ে করাতের মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য দাঁত রয়েছে। এই সূক্ষ্ম দাঁতের সাহায্যেই তারা নিরীহ পোকার শরীরে ছিদ্র করে সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্মাগ্র ডিম্ব-নলটি প্রবেশ করিয়ে ডিম পেড়ে দেয়। আক্রান্ত পোকাগুলির শরীরে এই তীক্ষ্ণ দাঁত-

বিশিষ্ট অস্ত্রটি প্রবেশ করিতে দিতে তাকে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না এবং মুহূর্তের মধ্যেই কার্য সমাধা করে সরে পড়ে। এদের নজরে পড়লে শুঁয়া-পোকা বা অন্যান্য পতঙ্গের কীড়াদের আর রক্ষা নেই। বিশেষ ভাবে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে বিভিন্ন জাতীয় প্রজাপতি ও পতঙ্গের বাচ্চারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে দেহের রং বা আকৃতির সামঞ্জস্যবিধানের জন্যে অনুকরণ করবার ক্ষমতা আয়ত্ত করে নিয়েছে। আমাদের দেশীয় লেবু-প্রজাপতি, কপি-মথ, দুধলতা প্রজাপতির বাচ্চারা এ-বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছে বলে বোধ হয় অনেক ক্ষেত্রে নেউলে-পোকার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে থাকে। কোনও কোনও শুঁয়াপোকা আবার অনুকরণশক্তির সাহায্য না নিয়ে ভয় দেখিয়ে বা শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ নির্গত করে নেউলে-পোকার হাত থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক শ্রেণীর নেউলে-পোকা দেখা যায়, যারা কেবল ফল, মূল, লতাপাতার গায়ে হুল ফুটিয়ে ডিম পেড়ে থাকে। এরাও দেখতে প্রায় উক্ত নেউলে-পোকার অনুরূপ ; কিন্তু কেবল উদ্ভিদ জাতীয় পদার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে সেগুলিকে করাতে-পোকা বলা হয়। বিভিন্ন জাতীয় ফলের বহিরাবরণে কোনও ক্ষতচিহ্ন না থাকা সত্ত্বেও ভিতরে বহু পোকা দেখা যায়। এরা করাতে-পোকার ডিম থেকে উদ্ভূত পোকা। তাছাড়া লতাপাতার কচি ডগায় গ্রন্থির মত স্ফীতি, কারও পাতার গায়ে ফোস্কা অথবা গুটির মত অদ্ভুত পদার্থ জন্মাতে দেখা যায়। এগুলি করাতে-পোকার কাণ্ড। লতা-পাতার মধ্যে ডিম পাড়বার সময় এদের ডিম্ব-নল থেকে এমন কোনও পদার্থ নির্গত হয়, যার প্রভাবে পাতার গায়ে গুটি, স্ফীতি অথবা কয়েক রকম উপাঙ্গ আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

## কুমোরে-পোকার সন্তানরক্ষার কৌশল

ঘরের দেয়ালে, পতিত জমি বা বৃক্ষকাণ্ডের উপর বোলতার মত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণকারী বিভিন্ন রঙের পোকা অনেকেরই নজরে পড়ে থাকবে। চলিত কথায় এগুলিকে কুমোরে-পোকা বলা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতীয় অসংখ্য কুমোরে-পোকা দেখা যায়। আমাদের দেশেও বিভিন্ন জাতীয় কুমোরে-পোকার সংখ্যা কম নয়। এ-দেশীয় উজ্জ্বল নীলাভ সবুজ অথবা সবুজ আভাযুক্ত সোনালী রঙের পোকাগুলির প্রতিই অধিকতর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। অবশ্য কালো, হলদে, খয়েরী অথবা বিবিধ বর্ণে চিত্রিত পোকাও যথেষ্ট দেখা যায়। যে সব কুমোরে-পোকা সচরাচর আমাদের নজরে পড়ে, তাদের অনেকেই ঘরের দেয়াল বা আনাচে-কানাচে নরম মাটির সাহায্যে বাসা তৈরী করে ; কেউ কেউ আবার মাটিতে গর্ত খুঁড়ে ডিম পাড়ে। এই জন্যেই বোধ হয় এদের নাম হয়েছে কুমোরে-পোকা। কিন্তু কয়েক জাতীয় কুমোরে-পোকা গাছের গুঁড়িতে ছিদ্র করে বাসা নির্মাণ করে, কোনও কোনও কুমোরে-পোকা আবার ফাঁপা বাঁশ বা নলখাগড়ার মধ্যেও বাসা বাঁধে। কয়েক জাতীয় পোকা মোটেই বাসা তৈরী করে না। বসবাস করবার জন্যে এদের বাসা বাঁধবার প্রয়োজন হয় না ; ডিম ও বাচ্চাদের জন্যেই এদের বাসার প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ সন্তানদের জন্যেও যারা বাসা নির্মাণ করে না, তারা বাচ্চাদের আহারোপযোগী জীবন্ত প্রাণীর শরীরের অভ্যন্তরে অথবা বহির্দেশে ডিম পেড়ে যায়। অনেকে আবার কচি ফুল বা

মুকুলের গায়ে হুল ফুটিয়ে ডিম পেড়ে রাখে। ডিম ফুটে বের হলেই যথেষ্ট সঞ্চিত খাদ্য উদরস্থ করে তারা দ্রুতগতিতে বেড়ে ওঠে এবং প্রাণীর দেহ ভেদ করে অথবা মুকুলে ছিদ্র করে বেরিয়ে আসে।

বোলতা, ভীমরুল প্রভৃতি পতঙ্গের সঙ্গে অনেকাংশে দৈহিক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও কুমোরে-পোকার জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বোলতা, ভীমরুল, মৌমাছিরা সর্বদাই সমাজবদ্ধ ভাবে বাস করে; কিন্তু কুমোরে-পোকা সর্বদাই একাকী বাস করতে অভ্যস্ত; কখনও দলবদ্ধভাবে বাস করে না। বোলতা, মৌমাছি প্রভৃতি প্রাণীরা দিবাবসানেই নিজ নিজ বাসায় প্রত্যাবর্তন করে বিশ্রাম করে; কিন্তু বিশ্রাম করবার জন্যে কুমোরে-পোকার কোনও নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই। পাতার আড়ালে, গাছের ডালে বা ঘাসের ঝোপে আত্মগোপন করে এরা রাত কাটিয়ে দেয়। অনেকে আবার ঘাসের ডাঁটা কামড়ে ধরে শরীরটাকে পাশাপাশি প্রসারিত করে নিদ্রা যায়। সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে বলে মৌমাছি, বোলতা, ভীমরুল প্রভৃতির স্ত্রী-পতঙ্গেরা ডিম পেড়েই খালাস, বাকী সব কাজের ভার শ্রমিকদের উপর।

বাচ্চাদের পরিণতি লাভ করবার বয়স পর্যন্ত কর্মী বা শ্রমিকেরাই তাদের তদারক করে থাকে। কিন্তু কুমোরে-পোকারা সামাজিক প্রাণী নয় বলে তাদের মধ্যে কর্মী বা শ্রমিক জাতীয় কোনও প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। কাজে কাজেই স্ত্রী কুমোরে-পোকাকে নিজে নিজেই সন্তানরক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। এরা সন্তানরক্ষার ব্যবস্থা করে বটে, কিন্তু সেগুলিকে মৌমাছি বা বোলতার শিশুর মত প্রতিপালন করে না; বোলতা বা মৌমাছিরা যেমন বাচ্চাগুলিকে আহার্যদ্রব্য মুখে তুলে খাইয়ে দেয় এবং সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখে, কুমোরে-পোকার বাচ্চাদের সে-সব কাজ নিজেদেরই করতে হয়। ডিম ফুটে বের হবার পর থেকেই আহারাদি কার্যে বাচ্চাগুলি স্বভাবতঃই অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকে। অবস্থার চাপে পড়েই হয়তো অতি শৈশব কাল থেকেই তাদের সর্ববিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়েই গড়ে উঠতে হয়েছে।

বোলতারা শোঁয়াপোকা বা অন্যান্য কীট-পতঙ্গের পিছু পিছু ছুটে তাদের আক্রমণ করে থাকে এবং তৎক্ষণাৎ শিকারের দেহ ছিন্নভিন্ন করে অধিকাংশই উদরসাৎ করে ফেলে। সময় সময় শিকারের অবশিষ্টাংশ বাসায় বয়ে নিয়ে যায়। ভীমরুলেরাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ শিকার করে এক পায়ের সাহায্যে গাছের ডালে ঝুলে তৎক্ষণাৎ তাদের উদরস্থ করে। কিন্তু কুমোরে-পোকা নানা জাতীয় পোকামাকড় শিকার করলেও তারা কখনও ঐ শিকার উদরস্থ করে না। ফুলের মধু ও শর্করা-জাতীয় শক্ত পদার্থই তাদের কুরে কুরে খেতে দেখেছি। অবশ্য বোলতা, ভীমরুল, মৌমাছিরা সকলেই শর্করা জাতীয় পদার্থ পরম উপাদেয় বোধে চেটে খায়। ডিম পাড়বার সময় হলেই কুমোরে-পোকা নানা জাতীয় পোকামাকড় শিকার করবার জন্যে ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি করতে থাকে এবং শিকার পেলেই বাচ্চাদের জন্যে গর্তের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখে।

আমাদের দেশে ঘরের আনাচে-কানাচে বা দেয়ালের গায়ে লম্বাটে ধরনের এবড়ো-খেবড়ো এক-একটা শুকনো মাটির ডেলা লেগে থাকতে দেখা যায়। সেগুলি এক প্রকার কালো রঙের লিকলিকে কুমোরে-পোকার বাসা। এই পোকাগুলির গায়ের রং আগাগোড়া মিশমিশে কালো, কেবল শরীরের মধ্যস্থলের বোঁটার মত সরু অংশটি হলদে। ডিম পাড়বার সময় হলেই এরা বাসা তৈরী করবার জন্যে উপযুক্ত স্থান খুঁজতে বের হয়। দুই-চার দিন ঘুরে-ফিরে মনোমত কোনও স্থান দেখতে পেলেই তার আশেপাশে বারবার ঘুরে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করে দেখে। তারপর খানিক দূর উড়ে গিয়ে আবার ফিরে আসে এবং স্থানটাকে পুনঃপুনঃ দেখে নেয়। দু-তিন বার এরূপভাবে এদিক-ওদিক উড়ে অবশেষে কাদামাটির সন্ধানে বের হয়। যতটা সম্ভব নিকটবর্তী স্থানে কাদামাটির সন্ধান করতে সময় সময় দু-এক দিন চলে যায়। কাদামাটির সন্ধান পেলেই বাসা নির্মাণের জন্যে সেই স্থান থেকে নির্বাচিত স্থানে যাতায়াত করে রাস্তা চিনে নেয়। সাধারণতঃ আশেপাশে চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ ব্যবধান থেকে মাটি সংগ্রহ করে থাকে। কিন্তু অত কাছাকাছি বাসা নির্মাণের উপযোগী মাটি না পেলে সময় সময় দেড়শ'-দুশ'

গজ দূর থেকেও মাটি সংগ্রহ করে থাকে। কাছাকাছি কোনও স্থান থেকে মাটি সংগ্রহ করে বাসার একটা কুঠুরি নির্মাণ প্রায় শেষ করে এনেছে, এমন সময় সেই স্থানে কাদামাটি চাপা দিয়ে বা বাসাটা সরিয়ে ফেলে দেখেছি—সংস্কারবশেই হোক বা বুদ্ধি করেই হোক, কুমোরে-পোকাটা বাসার সন্ধান না পেয়ে কোনও একটা জলাশয়ের পাড়ে উড়ে গিয়ে সেখান থেকে ভিজা মাটি সংগ্রহ করে পূর্বের জায়গায় নতুন করে বাসা তৈরী সুরু করেছে। যত বারই এরূপ করেছি, ততবারই দেখেছি—পুকুর বা নালা, ডোবা যত দূরেই থাকুক না কেন, সেখান থেকেই ভিজা মাটি এনে বাসা তৈরী করেছে। এই সব অসুবিধার জন্যে অবশ্য বাসা নির্মাণে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটে। একটি কুঠুরি তৈরী হয়ে গেলেই তার মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য, অর্থাৎ পোকামাকড় ভর্তি করে তাতে একটি মাত্র ডিম পেড়ে মুখ বন্ধ করে তারই গা ঘেঁষে নতুন কুঠুরি নির্মাণ সুরু করে। কাজেই এ থেকে মনে হয় যে, কুমোরে-পোকা ইচ্ছামত ডিম পাড়বার সময় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

বাসা নির্মাণের জন্যে মাটি সংগ্রহ করবার সময় উড়ে গিয়ে ভিজা মাটির উপর বসে এবং লেজ নাচাতে নাচাতে এদিক-ওদিক ঘুরেফিরে দেখে। উপযুক্ত মনে হলেই সেখান থেকে ভিজা মাটি তুলে নিয়ে চোয়ালের সাহায্যে খুব ছোট্ট এক ডেলা মাটি মটরদানার মত গোল করে মুখে করে উড়ে যায়। মাটি কুরে তোলবার সময় অতি তীক্ষ্ণ স্বরে একটানা গুনগুন শব্দ করতে থাকে। মুখ দিয়ে চেপে চেপে মাটির ডেলাটিকে দেয়ালের গায়ে অর্ধ-চন্দ্রাকারে বসিয়ে দেয়। মাটির ডেলাটাকে লম্বা করে চেপে বসাবার সময়ও তীক্ষ্ণ স্বরে একটানা গুনগুন শব্দ করতে থাকে। কোনও অদৃশ্য স্থানে বাসা বাঁধবার সময়ও এই গুনগুন শব্দ শুনেই বুঝতে পারা যায়, কুমোরে-পোকা বাসা বাঁধছে। পুকুর ধারে কাদামাটির উপর মাছির মত একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা ঘুরে ঘুরে আহার সংগ্রহ করে। এরূপ স্থলে মাটি তোলবার সময় ঐরূপ কোনও পোকা তার কাছে এসে পড়লে মাটি তোলা বন্ধ রেখে তাকে ছুটে গিয়ে তাড়া করে। যাহোক, বারবার এরূপ এক-এক ডেলা মাটি এনে ভিতরের দিকে ফাঁকা রেখে ক্রমশঃ উপরের দিকে বাসা গেঁথে

তুলতে থাকে। প্রায় সওয়া ইঞ্চি লম্বা হলেই গাঁথুনি ক্ষান্ত করে। এরূপ একটি কুঠুরি তৈরী করতে প্রায় দু-দিন সময় লেগে যায়। ইতিমধ্যে মাটি শুকিয়ে বাসা শক্ত হয়ে যায়। কুমোরে-পোকা তখন কুঠুরির ভিতরে প্রবেশ করে মুখ থেকে একপ্রকার লালা নিঃসৃত করে তার সাহায্যে কুঠুরির ভিতরের দেয়ালে প্রলেপ মাখিয়ে দেয়। প্রলেপ দেওয়া শেষ হলে শিকারের অন্বেষণে বের হয়। আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাকড়সার অভাব নেই; তারা জাল বোনে না, ঘুরে ঘুরে শিকার ধরে। এই কুমোরে-পোকারা বেছে বেছে এরূপ ভ্রমণকারী মাকড়সা শিকার করে থাকে। কোনও রকমে মাকড়সা একবার চোখে পড়লেই হলো, ছুটে গিয়ে তার ঘাড় কামড়ে ধরে। কিন্তু কামড়ে ধরলেও একেবারে মেরে ফেলে না। শরীরে হুল ফুটিয়ে এক রকম বিষ ঢেলে দেয়। একবার হুল ফুটিয়ে নিরস্ত হয় না। কোনও কোনও মাকড়সাকে পাঁচ-সাত বার পর্যন্ত হুল ফুটিয়ে থাকে। এর ফলে মাকড়সাটার মৃত্যু হয় না বটে, কিন্তু একেবারে অসাড়ভাবে পড়ে থাকে। তখন কুমোরে-পোকা অসাড় মাকড়সাকে মুখে করে নব-নির্মিত কুঠুরির মধ্যে উপস্থিত হয়। কুঠুরির নিম্নদেশে মাকড়সাটাকে চিৎ করে রেখে তার উদর দেশের এক পাশে লম্বাটে ধরণের একটি ডিম পাড়ে। ডিম পেড়েই আবার নতুন শিকারের সন্ধানে বের হয়। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে দশ-পনেরোটা মাকড়সা সংগ্রহ করে সেই কুঠুরির মধ্যে জমা করে আবার দু-তিন ডেলা মাটি এনে কুঠুরির মুখ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়। তার পর দু-এক দিনের মধ্যেই পূর্বোক্ত কুঠুরির গায়েই আর একটি কুঠুরি নির্মাণ সুরু করে। সেই কুঠুরিটিও মাকড়সা পূর্ণ করে তাতে ডিম পেড়ে মুখ বন্ধ করবার পর তৃতীয় কুঠুরি নির্মাণ করতে আরম্ভ করে। এরূপে এক একটি বাসার মধ্যে চার-পাঁচটি কুঠুরি নির্মিত হয়। ডিম পাড়া সম্পূর্ণ হয়ে গেলে সে তার ইচ্ছামত যে কোনও স্থানে চলে যায়, বাসার আর কোনও খোঁজ-খবরই নেয় না। বাচ্চাদের জন্যে খাদ্য সঞ্চিত রেখেই সে খালাস।

দু-এক দিনের মধ্যেই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। বাচ্চা সরু লম্বাটে হাত-পা শূন্য পোকা মাত্র। ডিম থেকে বের হবার পর থেকেই বাচ্চাটি

মাকড়সার দেহ খেতে আরম্ভ করে। একটি খাওয়া শেষ হলেই আর একটিকে খেতে আরম্ভ করে। দিন-রাত তার খাওয়া ছাড়া আর কোনও কাজ নেই। খেতে খেতে প্রায় সাত-আট দিনের মধ্যেই সবগুলি মাকড়সাকে নিঃশেষ করে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরও যথেষ্ট বেড়ে উঠতে থাকে; কিন্তু আকৃতি বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয় না। ডিম পাড়বার পাঁচ-ছয় দিন পরে কুমোরে-পোকার বাসা ভেঙে দেখেছি—বাচ্চাগুলি বেশ বড় হয়েছে, মাকড়সাগুলি তখনও সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয় নি, কিন্তু এত দিন পরেও সবগুলি মাকড়সাই জীবিত ছিল, যদিও সম্পূর্ণরূপে অসাড়। একটু জোরে সুড়সুড়ি দিলেই হাত-পা নেড়ে সাড়া দিত। মেরে ফেললে নিশ্চয়ই এতদিনে পচে নষ্ট হয়ে যেত। বাচ্চাগুলি যাতে রোজ টাট্‌কা খাদ্য পায়, তার জন্যেই কুমোরে-পোকা শিকারগুলিকে অসাড় করে রাখবার কৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছে।

এক-একটি কুঠুরির মাকড়সাগুলি সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হলেই বাচ্চাগুলি কয়েক ঘণ্টা চুপ করে অবস্থান করে। তার পর মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শরীরের চতুর্দিকে এক প্রকার সূক্ষ্ম সুতার জাল বুনতে থাকে। প্রায় দুদিনের চেষ্টায় শরীরের চতুর্দিকে খোলসের মত এক প্রকার আবরণ গড়ে ওঠে। বাচ্চাটি সেই আবরণের মধ্যে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করে। এই সময় বাচ্চা ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ পুত্তলীর রূপ ধারণ করে। কিছু দিন পরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপুষ্ট হলে মাটির আবরণ ছিদ্র করে বের হয়ে যায়।

মাকড়সা-শিকারী কুমোরে-পোকাদের আরও একটি বিশেষত্ব এই যে বিভিন্ন জাতীয় পোকা বিভিন্ন জাতীয় অথবা এক গোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মাকড়সাই সংগ্রহ করে থাকে। প্রত্যেকের বাসার মধ্যে একই শ্রেণীর মাকড়সা দেখতে পাওয়া যায়। খুব ক্ষুদ্র কয়েক জাতীয় কুমোরে-পোকা কেবল পিঁপড়ে-মাকড়সাই বাচ্চাদের জন্যে সংগ্রহ করে রাখে। কেউ কেউ আবার বিভিন্ন জাতীয় জাল-বোনা মাকড়সাকে জাল থেকে ধরে নিয়ে আসে। কুমোরে-পোকাকে জাল-বোনা মাকড়সা শিকার করতে যেরূপ কৌশল ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে দেখেছি, তা সত্য-সত্যই বিস্ময়কর। এক প্রকার

কুঁজো মাকড়সা তাঁবুর মত বাসা নির্মাণ করে এবং তারা এক সঙ্গে বহু তাঁবু খাটিয়ে দলে দলে বাস করে থাকে। তাঁবুর জালের বুনোনি সাধারণ মাকড়সার জালের মত নয়। এটা ঠিক সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট তারের জালের মত। জালগুলি কাপড়ের মত টানা-পোড়েনে বোনা—নীচে এক থাক বা দু-থাক চাঁদোয়া বিস্তৃত। মধ্যস্থলে মাকড়সা মালার আকারে ডিম পেড়ে অতি সুরক্ষিত অবস্থায় চুপ করে বসে থাকে। বাস্তবিকই অন্যান্য জাল বোনা মাকড়সারা যেরূপ অরক্ষিত ভাবে জালে বাস করে, এদের অবস্থান ক্ষেত্র মোটেই সেরূপ নয়। ছোট ছোট শত্রুর পক্ষে সেটা একরূপ দুর্ভেদ্য দুর্গবিশেষ। চতুর্দিকে বহু বাসা একত্র থাকায় এদের প্রবেশ পথ শত্রুর পক্ষে আরও অগম্য হয়ে ওঠে। কিন্তু সূচের মত সরু প্রায় আধ ইঞ্চি লম্বা এক প্রকার নীল রঙের কুমোরে-পোকা অনেক ঘুরে ফিরে বিভিন্ন ফাঁক-ফন্দিতে সেই বাসার মধ্যে ঢুকে মাকড়সাকে আক্রমণ করে। ঘুরে-ফিরে বললাম এই জন্যে যে, জাল ছিঁড়ে সোজাসুজি মাকড়সাকে ধরবার চেষ্টা করলেই কুমোরে-পোকার বিপদ অবশ্যম্ভাবী, কারণ জালের আঠায় তাকে জড়িয়ে পড়তেই হবে। কাজেই তাকে ঘুরে ফিরে প্রশস্ত ফাঁক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। মাকড়সা এই জাতীয় কুমোরে-পোকা অপেক্ষা আকারে বড় হলেও শত্রুর ভয়ে কম্পিত কলেবরে ছুটাছুটি করে এক বাসা থেকে আর এক বাসায় বা একই বাসার ভিতরে বা বাইরে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করে, কিন্তু তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। কুমোরে-পোকা চিৎ হয়ে কাৎ হয়ে কখনও উড়ে গিয়ে কখনও বা ছুটাছুটি করে যেন মরিয়া হয়েই শিকার আক্রমণ করে। একটি মাকড়সার পিছনে কুমোরে-পোকা লাগতে দেখা মাত্রই একসঙ্গে সংলগ্ন সকল বাসার মাকড়সারা বাসস্থান পরিত্যাগ করে কোনও নিভৃত স্থানে এমনভাবে আত্মগোপন করে থাকে যে, শত চেষ্টা করেও তাদের খুঁজে বের করা যায় না।

আর এক জাতীয় মাঝারি আকৃতির কুমোরে-পোকা দেখা যায়। তারা ডিম পাড়বার জন্যে কখনও বাসা নির্মাণ করে না। তারা বড় বড় এক জাতীয় কাঁকড়া-মাকড়সার গায়ে ডিম পেড়ে যায়। এই মাকড়সারা পাতা

মুড়ে বাসা নির্মাণ করে অধিকাংশ সময়েই তার মধ্যে অবস্থান করে। কুমোরে-পোকা ডিম পাড়বার সময় উপস্থিত হলেই সেগুলিকে বাসার মধ্য থেকে খুঁজে বের করে। এই মাকড়সাদের বাসায় দুটি করে দরজা থাকে। কুমোরে-পোকাকে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে দেখলেই মাকড়সা অন্য দরজা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়ে প্রাণভয়ে ছুটতে থাকে। কিন্তু কিছুতেই শত্রুর হাত থেকে নিস্তার পায় না। পিছু তাড়া করে কুমোরে-পোকা তাকে ধরে ফেলে এবং কোনও রূপ আহত না করে তার পেটের একপাশে একটি ডিম পেড়ে যায়। ডিমটি তার গায়ে আঠার মত লেগে থাকে। ডিম পাড়বার পরক্ষণেই এরূপ একটা মাকড়সাকে ধরে বড় কাচপাত্রে রেখে দেখেছিলাম। প্রথম দিন অপরাহ্নের দিকে ডিম পেড়েছিল। দ্বিতীয় দিন সকালবেলায় দেখলাম ডিমটা যেন অনেক বড় হয়ে উঠেছে, কিন্তু একই জায়গায় লেগে রয়েছে। প্রায় এগারোটার সময় দেখলাম বেশ পরিষ্কার বাচ্চার আকার ধারণ করেছে এবং মাকড়সার রস শুষে নেবার প্রক্রিয়াটাও স্পষ্টরূপে দৃষ্টি-গোচর হলো। তার শরীরের বৃদ্ধি যেন ক্রমশঃই দ্রুততর হয়ে উঠছিল।

মাকড়সাটা এতক্ষণ পর্যন্ত বেশ স্বাভাবিকভাবেই নড়াচড়া করছিল। কিন্তু প্রায় একটার সময় দেখলাম, বাচ্চাটা অনেক মোটা ও বড় হয়ে উঠেছে এবং মাকড়সার পেটটা যেন অনেকটা চুপসে গেছে। মাকড়সাটা তখন একস্থানে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। বেশী নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। বেলা দুটার পর থেকেই বাচ্চাটা যেন ভীষণ মূর্তি ধারণ করে পেটটাকে কুরে খেয়ে ঠ্যাংগুলিকে একটি একটি করে নিঃশেষ করতে লাগলো। প্রায় ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যেই এত বড় একটা মাকড়সাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেললো। খাওয়া শেষ হলে বাচ্চাটা প্রায় ঘণ্টা-দুই বিশ্রামের পর মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শরীরের চতুর্দিকে সূতা বুনতে লাগলো। আড়াই ঘণ্টার পর শরীরের চতুর্দিকে একটা পাত্‌লা স্বচ্ছ আবরণ গঠিত হলো। তার পর দিন দেখি, আবরণ আরও কঠিন, অস্বচ্ছ ও কাল্‌চে বাদামী রং ধারণ করেছে। প্রায় একমাস পরে পূর্ণাঙ্গ কুমোরে-পোকা গুটি কেটে বাইরে বেরিয়ে এলো।

পরিত্যক্ত জমির বেলেমাটির উপর একটু নজর রাখলেই দেখতে পাওয়া

যাবে, নানা জাতীয় উজ্জ্বল নীল, সোনালী বা হল্‌দে রঙের বড় বড় কুমোরে-পোকা গর্ত খুঁড়তে ব্যস্ত রয়েছে। এদের অনেকেই এক ইঞ্চি থেকে প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা হয়ে থাকে। মাটির নীচে তির্যকভাবে ৬।৭ ইঞ্চি গর্ত খুঁড়ে নিম্ন প্রান্ত অপেক্ষাকৃত চওড়া করে বাটির মত তৈরী করে। এরাও ডিম পাড়বার সময় হলেই গর্ত খুঁড়তে আরম্ভ করে। গর্ত খোঁড়বার সময় প্রথমতঃ পা দিয়ে মাটি দূরে ছড়িয়ে ফেলে। গর্ত যতই নীচে নামতে থাকে, শরীরের অধিকাংশ নীচে ঢুকে যাবার ফলে আর পা দিয়ে মাটি ছড়াতে পারে না। তখন সে মুখে করে মাটি তুলে এনে দূরে গিয়ে ফেলতে থাকে। এভাবে গর্ত নির্মাণ শেষ হলে সে শিকারের সন্ধানে বের হয়। নীল রঙের বড় বড় কুমোরে-পোকারা উইচিংড়ি শিকার করে থাকে। কেউ কেউ পঙ্গপাল অথবা বড় বড় কয়ারফড়িংও শিকার করে। উইচিংড়ি শিকার করবার জন্যে এরা তাদের গর্ত খুঁজে বেড়াতে থাকে। কয়েক জাতীয় বড় বড় উইচিংড়ি মাটির নীচে দু-মুখো গর্ত করে বাস করে। এরা কিছুতেই আলোতে আসতে চায় না। দিনের বেলায় চুপ করে থাকে—সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই সকলে মিলে অতি তীক্ষ্ণ স্বরে একটানা ঝিন্‌ঝিন্ শব্দ করতে থাকে। দিনের বেলায়ও সময় সময় একটানা শব্দ করে থাকে। দিনের বেলায় একটু নিস্তব্ধ অবস্থা বুঝতে পারলেই লম্বা লম্বা শুঁড় দুটাকে গর্তের মুখে একটুখানি বের করে ধীরে ধীরে আন্দোলন করতে থাকে। কুমোরে-পোকারা ঘুরতে ঘুরতে এই শুঁড়ের আন্দোলন দেখেই তাদের গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কিন্তু গর্তেরমধ্যে তাদের ধরা খুবই শক্ত ব্যাপার। কুমোরে-পোকা গর্তে ঢোকবা-মাত্রই উইচিংড়ি অপর মুখ দিয়ে লাফিয়ে বাইরে পালিয়ে যায়। এরা এক এক লাফে প্রায় দু-তিন হাত জায়গা অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু এত দ্রুতগতিতে লাফিয়েও তারা কুমোরে-পোকার হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না। কুমোরে-পোকা তৎপরতার সঙ্গে উড়তে উড়তে তাকে অনুসরণ করে সুযোগ পেলেই ঘাড়ে কাম্‌ড়ে ধরে হুল ফোটাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সহজে উইচিংড়িকে এঁটে উঠতে পারে না। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর উইচিংড়ি কিছুটা নিস্তেজ হয়ে পড়লে তার শরীরের নিম্নাংশে ও ঘাড়ের কাছে কয়েকবার হুল ফুটিয়ে

দিলেই সে একেবারে অসাড় হয়ে পড়ে। তখন কুমোরে-পোকা শিকারটাকে সেখানে রেখে বোধ হয় রাস্তা ঠিক করে নেয়। তারপর অসাড় উইচিংড়িটাকে চিৎ করে গলার কাছে কাম্‌ড়ে ধরে উড়ে যেতে চেষ্টা করে, কিন্তু অত ভারী শিকারসহ একটানা উড়ে যেতে পারে না। খানিক দূর উড়ে আবার মাটিতে অবতরণ করে এবং একইভাবে ধরে পোকাটাকে মাটি বা ঘাসের উপর দিয়ে ঘষ্‌ড়ে নিয়ে যেতে থাকে। আবার খানিক দূর উড়ে যায়। এরূপভাবে শিকারকে গর্তের কাছে এনে মাটিতে ফেলে রেখে একটু এদিক-ওদিক দেখে গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে। অল্পক্ষণ পরেই বের হয়ে এসে শিকারটাকে পূর্ববৎ কাম্‌ড়ে ধরে গর্তের মধ্যে নিয়ে যায়। যদি এভাবে গর্তের মধ্যে ঢুক্‌তে না পারে, তবে শিকারের শুঁড় ধরে গর্তে টেনে নামায়। শিকারটাকে গর্তের প্রশস্ত স্থানে রেখে তার পেটের দিকে একটা ডিম পেড়ে প্রায় দশ-বারো মিনিট পরেই বাইরে চলে আসে। বাইরে এসে চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ করবার পর পায়ের সাহায্যে আল্‌গা মাটিগুলিকে গর্তের ভিতর ফেলে মুখ বন্ধ করে চলে যায়। শিকার আকারে ছোট হলে সময় সময় দুটি উইচিংড়িও একই গর্তে রেখে দিতে দেখা যায়। উইচিংড়ির দেহ সম্পূর্ণরূপে খেয়ে ফেলবার পর বাচ্চা গুটি বাঁধে এবং প্রায় মাসাধিক কাল পরে পূর্ণাঙ্গ কুমোরে-পোকা মাটি সরিয়ে বের হয়ে আসে।

যারা মাটিতে গর্ত করে ডিম পাড়ে তাদের মধ্যে কোনও কোনও জাতীয় কুমোরে-পোকা কেবল মাকড়সাই শিকার করে আনে। বড় মাকড়সা শিকার করে তার সব কয়টি ঠ্যাং কেটে ফেলে দেয়, শুধু দেহটা বাসায় নিয়ে আসে। মাকড়সা অপেক্ষাকৃত ছোট হলে তাদের ঠ্যাং কেটে ফেলে না, বাসার কাছে এসে শিকার বেহাত হবার ভয়েই বোধ হয় অনেক সময় ছোট ছোট গাছপালার ডালের উপর রেখে দেয় এবং গর্তের ভিতর তদারক করে এসে শিকার ভিতরে নিয়ে যায়। এরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন গর্ত খুঁড়ে প্রত্যেক গর্তে একটি মাত্র ডিম পেড়ে রাখে।

কোনও কোনও জাতীয় বড় বড় কুমোরে-পোকা মথ প্রজাপতির বড় বড় শূককীটই বেছে বেছে শিকার করে। এই শূককীটেরা পাতার রঙের সঙ্গে

গায়ের রং মিলিয়ে আত্মগোপন করে থাকে ; কিন্তু কুমোরে-পোকার চোখ এড়াবার উপায় নেই। তারা শূককীটকে ঘাড়ে কামড় দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয় এবং অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর শরীরের নানা স্থানে হুল ফুটিয়ে তাকে অসাড় করে ফেলে। তারপর গলায় কামড়ে ধরে টানতে টানতে বাসায় নিয়ে যায়। শূককীটগুলি সময় সময় এত বড় হয় যে, গর্তের ভিতর প্রবেশ করাতে পারে না, কাজেই শিকার বাইরে রেখে গর্ত অধিকতর প্রশস্ত করে নেয়। তারপর তাকে টেনে ভিতরে নিয়ে যায়। ডিম পাড়বার পর গর্তের মুখ বন্ধ করে এরা এক অদ্ভুত কাণ্ড করে। এক খণ্ড ভারী মাটির টুক্‌রা সংগ্রহ করে তাকে গর্তের মুখে বারবার আছাড় মারতে থাকে। এতে নরম মাটি চেপে বসে গিয়ে গর্তের স্থানটি আশেপাশের জায়গার সঙ্গে বেমালুম মিশে যায়। শত্রুর চোখে ধূলি দেবার জন্যেই এই ব্যবস্থা করে থাকে।

অনেক জাতের কুমোরে-পোকা গাছের গুঁড়িতে ছিদ্র করে বাসা নির্মাণ করে। তারা বাচ্চার আহারের জন্যে বিভিন্ন রকমের পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ ধরে এনে অসাড় করে সেখানে সঞ্চিত করে রাখে। কতকটা ভীমরুলের মত দেখতে এক প্রকার উজ্জ্বল নীল রঙের কুমোরে-পোকা এদেশে গাছের উপর প্রায়ই দেখা যায়। এরা ছোট-বড় নানা জাতীয় আরসোলা ধরে বাসায় নিয়ে যায়। কুমোরে-পোকার আরসোলা শিকার যা প্রত্যক্ষ করেছি, তা বাস্তবিকই অদ্ভুত। শিবপুরের বাগানে ও সুন্দরবনের এক স্থানে একই রকম ঘটনা দেখেছিলাম। প্রকাণ্ড একটা গাছের গুঁড়ির উপর একটা মাঝারি গোছের কুমোরে-পোকা একটা জীবন্ত আরসোলাকে শুঁড়ে ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। আরসোলাটাও দিব্যি হেঁটে হেঁটে কুমোরে-পোকার সঙ্গে যাচ্ছিল। খানিক দূর গিয়েই কুমোরে-পোকাটা আরসোলাটাকে ছেড়ে দিয়ে গাছের উপরে বাসাটা দেখে আসছিল। কিন্তু আরসোলাটা যেখানে ছিল, ঠিক সেখানেই ঠায় দাঁড়িয়েছিল। আবার এসে কুমোরে-পোকা তাকে শুঁড়ে ধরে টেনে খানিক দূর উপরে নিয়ে গিয়ে এক স্থানে দাঁড় করিয়ে রেখে চলে গেল। এই ফাঁকে একটা কাঠি দিয়ে আরসোলাটাকে অন্য স্থানে ঠেলে

দিলাম ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আরসোলাটা পুনরায় ঘুরে ফিরে এসে ঠিক পূর্ব স্থানেই স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। যতবার আরসোলাটাকে সরিয়ে দিলাম, ততবারই সে ঠিক পূর্ব স্থানে এসে উপস্থিত হলো। সুন্দরবনেও ঠিক একই রকম ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। আরসোলাটা ভয়ে সম্মোহিত হয়ে অথবা কোনও অদ্ভুত বিষের ক্রিয়ায় এরূপ কাণ্ড করেছিল, তা আজও বুঝতে পারি নি।

আমাদের দেশে পুরনো দেয়ালের গায়ে অথবা কোনও পরিত্যক্ত স্থানে কালো রঙের এক প্রকার অদ্ভুত পোকা দেখা যায়। এরা দেখতে একটা সাধারণ কুমোরে-পোকার মত। কিন্তু শরীরের পশ্চাদ্ভাগ এত ক্ষুদ্র যে নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। শরীরের এই অসামঞ্জস্য ভয়ানক চোখে লাগে। এগুলি সাধারণতঃ ধোবি-পোকা নামে পরিচিত। এই ধোবি-পোকা কোনও বাসা নির্মাণ করে না। ডিম পাড়বার সময় হলেই এরা গাছের ডালে কচি ডগার অভ্যন্তরে হুল ফুটিয়ে ডিম পেড়ে রাখে। ডিম ফুটে বাচ্চাগুলি গাছের কোমল অংশ খেয়ে বাড়তে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে গাছের ডগার আহত অংশও অসম্ভব রূপে ফুলে ওঠে। বাচ্চাগুলি পরিণতি লাভ করে গাছের গায়ে ছিদ্র করে বেরিয়ে আসে। আমাদের দেশে এই জাতীয় বিভিন্ন শ্রেণীর পোকা দেখতে পাওয়া যায়।

এক-চতুর্থ ইঞ্চি বা আরও ক্ষুদ্রকায় বহু জাতের কুমোরে-পোকারও আমাদের দেশে অভাব নেই। এদের অনেকেই বাসা নির্মাণ করে না। কোনও জীবন্ত প্রাণীর শরীরে ডিম পেড়ে যায়। আমাদের দেশে এক ইঞ্চির প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ পরিমিত এক জাতীয় কুমোরে-পোকা দেখতে পাওয়া যায়। এরা সাদা শোঁয়াবিশিষ্ট শোঁয়াপোকার শরীরে হুল ফুটিয়ে ডিম পেড়ে যায়। ডিম পাড়বার প্রায় আট-দশ দিন পরে শোঁয়াপোকাটা ক্রমশঃ নির্জীব হয়ে পড়তে থাকে! পূর্ব থেকেই তার আহার-বিহারে অরুচি ধরতে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে বন-জঙ্গল থেকে বের হয়ে কোনও পরিষ্কার স্থানে এসে চুপ করে বসে থাকে। এক স্থানে চুপ করে বসবার কয়েক ঘণ্টার পরেই দেখা যায়, তার শরীরের ভিতর থেকে চামড়া ভেদ করে

একের পর এক সূতার মত সরু সরু প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটা ছোট ছোট বাচ্চা বেরিয়ে আসছে। বাচ্চাগুলি বাইরে এসেই শোঁয়াগুলির মধ্য থেকে শরীরটাকে অদ্ভুত ভঙ্গীতে মোচড় দিতে দিতে সূতা বের করে এবং শরীরের চতুর্দিকে গুটি বাঁধতে থাকে। বিশ থেকে ত্রিশ মিনিটের মধ্যে সবগুলি বাচ্চাই গুটি প্রস্তুত করে ফেলে এবং এক-একটি চালের মত সাদা সাদা গুটি শোঁয়গুলির গায়ে লেগে থাকে। শোঁয়াপোকাটা তখন ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ছয়-সাত দিন থাকবার পর ছোট ছোট পূর্ণাঙ্গ পোকাগুলি গুটি কেটে উড়ে যায়।

## পঙ্গপাল

পঙ্গপালের ব্যাপারটা কিরূপ, সে সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের ধারণা সম্পূর্ণ অস্পষ্ট। তার প্রধান কারণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব। পঙ্গপালের উপদ্রব যে কি ভীষণ তা যথাযথ বর্ণনা করা দুরূহ। একসঙ্গে অকস্মাৎ অগণিত পতঙ্গের আবির্ভাব একটা অভাবনীয় ব্যাপার। চোখে না দেখলে পঙ্গপালের অভিযানের ভীষণতা কিয়ৎ পরিমাণেও হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। সিনেমা-ফিল্মে পঙ্গপালের অভিযানের দৃশ্য দেখে বাস্তব ঘটনার ভীষণতা কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলাম। একসঙ্গে লক্ষ কোটি পঙ্গপাল দেখে নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি পতঙ্গ কোথা থেকে এসে অকস্মাৎ গাছপালা, পথ-ঘাট উপর-নীচ সব কিছু ছেয়ে ফেললো। আকাশ-বাতাস যেদিকে তাকাও—কেবল পঙ্গপাল আর পঙ্গপাল। স্থানে স্থানে তিন চার ফুট উঁচু হয়ে পঙ্গপাল জমেছে। পুঞ্জীভূত ঘনকৃষ্ণ বিশাল মেঘ দেখতে দেখতে যেমন করে দিনের আলো আচ্ছন্ন করে ফেলে তার চেয়েও বহুগুণ গাঢ়তার আবরণে আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন করে পঙ্গপালের অভিযান চলতে থাকে। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য। কোথাও ব্যাপকভাবে মড়ক লাগলে পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা যেমন ভীতিবিহ্বলতার পরিচয় দিয়ে থাকে—বহুদূরে পঙ্গপাল দেখা যাচ্ছে—এ কথা শুনে মানুষ তেমনই আতঙ্কে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। হাওয়া অফিস যেমন ঝড়, জল, ঘূর্ণিবাত্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সূচনা দেখলে

তড়িদ্বার্তার সাহায্যে পূর্বেই সকলকে সতর্ক করে দেয়, কোনও স্থানে পঙ্গপালের আবির্ভাব ঘটলে আজকাল সেরূপ তাদের অগ্রাভিযানের সম্ভাবিত পথ সম্বন্ধে পূর্বাহ্নেই সকলকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। এর ফলে দূরবর্তী স্থানের লোকেরা এদের যথাসম্ভব প্রতিরোধ করবার জন্যে পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হতে পারে। কিন্তু এদের অভিযান ব্যর্থ করা অসম্ভব। আকাশের এক দিক থেকে কৃষ্ণবর্ণ ঘন মেঘের মত পঙ্গপালের অগ্রগতি দেখতে পেলেই গ্রামের লোকেরা একযোগে দিশাহারাভাবে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে, শিঙ্গা ফুঁকে অথবা বিভিন্ন উপায়ে ভীষণ শব্দ করে তাদের অভিযানের দিক পরিবর্তন করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করে ; কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে দিক পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা গেলেও মোটের উপর এর দ্বারা কোনও সুফল লাভ হয় না। যতই কিছু উপায় অবলম্বিত হোক না কেন—মাঠ-ঘাট, আকাশ-বাতাস ছেয়ে পঙ্গপালের অভিযান চলতে থাকে। আগুন অথবা অন্য কোনও উপায়ে স্তূপীকৃত ভাবে ধ্বংস করলেও এদের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি কিছুই বুঝতে পারা যায় না—সংখ্যা এদের এতই অগণিত।

যে সকল স্থান শস্য এবং সবুজ তৃণগুল্ম বা গাছপালায় আচ্ছন্ন ছিল পঙ্গপালের আবির্ভাবের কয়েক ঘণ্টা পরেই দেখা গেল, সে সব স্থানের চেহারা একেবারে বদ্‌লে গেছে। কোনও স্থানেই আর সবুজের চিহ্ন মাত্র নেই। ঘাসপাতা, শাক-সব্জীর তো কথাই নেই, বড় বড় গাছপালা সকলই পত্র শূন্য অবস্থায় বিরাজ করছে। পঙ্গপালেরা বহু বিস্তীর্ণ প্রান্তরের যাবতীয় পত্র-পল্লব শস্যাদি নিঃশেষে উজাড় করে দেশকে মরুভূমিতে পরিণত করে উড়ে গেছে। মোটের উপর কোনও স্থানে পঙ্গপাল আবির্ভাবের পূর্বে এবং পরের অবস্থা দেখলে একথা সহজেই মনে হবে যেন কোনও অদ্ভুত যাদুবিদ্যাবলে দেশটা রাতারাতি এভাবে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কোনও কোনও স্থানে খুব পুরু হয়ে বরফ পড়লে সময় সময় রেল চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সেরূপ রেল লাইনের উপর পুরুভাবে পঙ্গপাল জমে যাবার ফলে রেল চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে এরূপ ঘটনারও নজীর আছে। এ থেকেই পঙ্গপালের সংখ্যার গুরুত্ব অনুমান করা যেতে পারে।

পঙ্গপালেরা উড়ে এসে কেবল যে দেশের পর দেশ উজাড় করেই চলে যায়, তা নয় সঙ্গে সঙ্গে তারা মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রচুর পরিমাণে ডিমও পেড়ে যায়। এই ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়ে পরবর্তী বছরে যাবতীয় শস্যাদি নষ্ট করে ফেলে। এইরূপে একবার পঙ্গপালের আবির্ভাব ঘটলে ক্রমাগত কয়েক বছর তাদের উৎপাত চলতে পারে। আবার এমনও দেখা যায়—যেমন অকস্মাৎ তারা আবির্ভূত হয়েছিল, কয়েকদিন পরে তেমন আকস্মিক ভাবেই তারা উড়ে গেছে। অসম্ভব রূপে বংশবৃদ্ধির ফলে এরা যে খাদ্যাভাবে মৃত্যু মুখে পতিত হয়—এরূপ অবস্থা প্রায় কখনও ঘটতে দেখা যায় না। কারণ খাদ্যাভাবের সূচনাতেই এরা দলবদ্ধভাবে অন্যত্র উড়ে যেতে সুরু করে।

পঙ্গপালের উৎপাত সম্বন্ধে প্রাচীন মিশরের একটি বর্ণনায় উল্লেখিত আছে--পরমেশ্বর আমাদের দেশের উপর দিয়ে সারাদিন সারারাত পূর্ব দিকের বায়ু প্রবাহিত করালেন। প্রভাত হবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব বায়ু পঙ্গপালের আবির্ভাব ঘটালো। পঙ্গপালেরা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। তারা যেন পৃথিবীর সর্বস্থান ঢেকে ফেললো। কাজেই দেশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। দেশের যেখানে লতাপাতা, শাক-সবজি, গাছপালা ছিল, তা সবই নিঃশেষ করে ফেললো। বিস্তীর্ণ মিশরের কোথাও একটু সবুজের চিহ্নমাত্র রইলো না।

বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে আজও পঙ্গপালের উপদ্রব প্রতিকারের তেমন কোনও কার্যকর পন্থা আবিষ্কৃত হয় নি। ১৯২৮ সালে ডানাশূন্য অপরিণত বয়স্ক পঙ্গপালের আক্রমণে প্যালেস্টাইন এক প্রকার শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। ১৯২৫ সালে মিশরে পঙ্গপালের আক্রমণ হয়। কিন্তু কীট-তত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিকদের সমবেত প্রচেষ্টায় মিশর সে যাত্রায় অনেকটা আত্মরক্ষায় সক্ষম হয়েছিল। আলজিরিয়া, পারস্য, দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ-আফ্রিকা ও রাশিয়ার বহুস্থান কয়েক বছর পর পর পঙ্গপালের উপদ্রবে উৎসন্ন হয়ে গেছে। ১৯২৯ সালে কেনিয়াতে পঙ্গপালের উপদ্রব হয়। তার ফলে সেখানে খাদ্য-রেশনের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। ১৯২৬ সালে একমাত্র উত্তর ককেশাস প্রদেশেই প্রায় ৮০০০০ একর জমির গম, ভূট্টা, বাজরা

প্রভৃতি শস্য পঙ্গপালের উদরস্থ হয়েছিল। এ থেকেই পঙ্গপালের উপদ্রবের ভীষণতা কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি হবে।

ছোট শুঁড়ওয়ালা বৃহত্তর এক জাতীয় কয়ার-ফড়িংকেই সাধারণতঃ পঙ্গপাল নামে অভিহিত করা হয়। অবশ্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতীয় কয়ার-ফড়িং এবং অন্যান্য তৃণভোজী পতঙ্গ—এমন কি, দলবদ্ধ ঝিঁঝিঁ পোকাকেও পঙ্গপাল নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যাহোক, আমাদের দেশে কয়ার-ফড়িং বোধ হয় অনেকেই দেখে থাকবেন। এরা ঝোপঝাড়ে এবং শস্যক্ষেত্রেই অনবরত বিচরণ করে থাকে। এদের শরীরের গঠন খুবই দৃঢ়। পিছনের ঠ্যাং দুখানি দেহের তুলনায় খুবই লম্বা এবং স্থূলাকার। এই ঠ্যাং দুটির শক্তিও অসাধারণ। ঠ্যাঙের সাহায্যে এরা প্রায় দশ-বারো ফুট দূরে লাফিয়ে যেতে পারে। প্রায়ই এরা গাছ বা লতাপাতার উপর লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। নেহাৎ দায়ে পড়লে উড়ে যায়। তবে উড়তে তত পটু নয়। ঘাসপাতা, ফুল-ফল খেয়েই ওরা জীবনধারণ করে। আমাদের দেশেই অন্ততঃ বিশ-পঁচিশ রকমের কয়ার-ফড়িং দেখা যায়, কিন্তু এরা কেউ দলবদ্ধভাবে উড়ে বেড়ায় না, সর্বদাই এককভাবে বিচরণ করে। কয়েক জাতীয় কয়ার-ফড়িং সিকি ইঞ্চির বেশী বড় হয় না। আমাদের দেশীয় প্রকৃত পঙ্গপাল জাতের কয়ার-ফড়িংগুলি প্রায় দু-ইঞ্চি থেকে আড়াই ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। এরা সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম। বিভিন্ন জাতীয় কয়ার-ফড়িঙের শরীরে বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ দেখা যায়। বিভিন্ন জাতীয় কয়ার-ফড়িংই শরীরের পশ্চাদ্ভাগের সাহায্যে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে ডিম পাড়ে। ডিম পাড়বার পূর্বে এদের স্ত্রী-পুরুষের মিলনরীতিও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। এদের পিছনের পায়ের ভিতরের দিকে অতি সূক্ষ্ম করাতের দাঁতের মত সারবন্দিভাবে সূক্ষ্ম কাঁটা আছে। শরীরের উভয় পার্শ্বস্থিত পাত্‌লা পর্দার উপর উখার মত ঘষে এরা এক প্রকার শব্দ উৎপন্ন করতে পারে। একটু মনোযোগ দিলেই এখানে-সেখানে ঘাসপাতার মধ্যে এদের চিড়িক্ চিড়িক্ শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে। পূর্বেই বলেছি, এরা দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে না। মিলনের সময় হলেই পুরুষ পতঙ্গটা প্রথমে তিন বার অথবা কোনও কোনও স্থলে চার বার চিড়িক্

চিঁড়িক্ শব্দ করে। কয়েক দফায় এরূপ শব্দ করবার পর আশেপাশে কোথাও কোনও স্ত্রী-পতঙ্গ থাকলে সেও তখন তিন বার কি চার বার চিঁড়িক্ চিঁড়িক্ শব্দ করে। কিছুক্ষণ পরে পুরুষ পতঙ্গটি আবার অনুরূপ শব্দ করতে থাকে। প্রায় আধঘণ্টা কাল পালাক্রমে উভয়ে এরূপ শব্দ করবার পর পুরুষ পতঙ্গটা উড়ে গিয়ে স্ত্রী-পতঙ্গের নিকটে উপস্থিত হয়। স্ত্রী-পতঙ্গের শরীরের পশ্চাদ্ভাগে ডিম পাড়বার শক্ত অথচ সূচালো একটি লম্বা নলের মত পদার্থ আছে। এর সাহায্যে সে গর্তের মধ্যে সুবিন্যস্তভাবে কতকগুলি ডিম পেড়ে রাখে। গুচ্ছাকারে সজ্জিত ডিমগুলির উপরিভাগে একটা শক্ত আবরণী বেষ্টিত থাকে। বাচ্চাগুলি দেখতে অনেকটা পূর্ণবয়স্ক পতঙ্গের মত। কিন্তু তাদের ডানা থাকে না। এরা বারংবার খোলস পরিত্যাগ করে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রজাপতি এবং ফড়িঙের যেমন শেষবার খোলস পরিত্যাগের পর ডানার পূর্ণরূপ বিকশিত হয়, এদের কিন্তু সেরূপ হয় না। প্রত্যেকবার খোলস পরিবর্তনের পর ডানাগুলি ক্রমে ক্রমে বড় হতে থাকে এবং শেষ বারে পূর্ণাঙ্গ অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। বাচ্চা বয়সে এরা প্রায়ই লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। অপরিণত বয়স্ক বাচ্চাগুলিই বেশীর ভাগ শস্যাদি উজাড় করে দেয়। Locusta migratoria নামে এক জাতীয় পঙ্গপাল দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপ এবং পশ্চিম-এশিয়ার ভূখণ্ডসমূহে মাঝে মাঝে আবির্ভূত হয়ে থাকে। এই জাতীয় পঙ্গপালই একবার উত্তর ককেশাসে আবির্ভূত হয়েছিল। এই পঙ্গপালগুলিকে এবং বিশেষভাবে তাদের ডিম সমেত একটি নির্দিষ্ট স্থানকে পরীক্ষার ফলে দেখা যায়—তাদের ডিম ফুটে পূর্বোক্ত পঙ্গপালের অনুরূপ অনেক বাচ্চা বের হয়েছে বটে; কিন্তু তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকমারি বাচ্চারও অভাব নেই। পূর্বে যে পঙ্গপালকে স্বতন্ত্র জাতীয় মনে করা হতো, এরা দেখতে ঠিক তাদেরই মত ছিল। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই জাতীয় পঙ্গপাল পূর্ব বছরে সেস্থানে মোটেই দৃষ্টিগোচর হয় নি। এরা সাধারণতঃ এককভাবেই বিচরণ করে; কিন্তু পূর্বোক্ত পতঙ্গগুলি দলবদ্ধভাবে দেশ-দেশান্তরে উড়ে বেড়াতেই অভ্যস্ত। তারপর পরীক্ষাগারে এই পঙ্গপাল নিয়ে পুনরায় দস্তুরমত গবেষণা সুরু হয়। পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয় যে,

উড়ন্ত পঙ্গপাল এবং বর্ণবৈচিত্র্যবিশিস্ট একাকী বিচরণকারী পঙ্গপালেরা একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। কাজেই বোঝা গেল যে, পঙ্গপালের দল প্রথম অন্য স্থান থেকে উড়ে এসেছিল তাদের সন্তান-সন্ততিরাই ভিন্নরূপ ধারণ করে একাকী বিচরণকারী পঙ্গপালে পরিণত হয়েছে। সুতরাং কোনও কোনও ক্ষেত্রে পঙ্গপালের আকস্মিক আবির্ভাবের পর আবার আকস্মিক তিরোধান ঘটলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের বংশধরেরা থেকেই যায়। উড়ন্ত পঙ্গপালের ডিম থেকেই একাকী বিচরণকারী পঙ্গপালের উৎপত্তি ঘটে থাকে। তখন তাদের আকৃতি, প্রকৃতি সবই পরিবর্তিত হয়ে যায়। কতকগুলি প্রজাপতির মধ্যেও এরূপ ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। এদের শীত ও বর্ষা উভয় ঋতুতেই বাচ্চা হয়ে থাকে। শীতকালের বাচ্চা বর্ষাকালের বাচ্চা অপেক্ষা আকৃতি, প্রকৃতি এবং বর্ণবৈচিত্র্যে সম্পূর্ণ পৃথক। এই বিষয়ে অধিকতর পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে মরুভূমির পঙ্গপাল Schistocerca gregaria এবং S. paranensis, Locustana pardalina, Melanoplu spretus প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় পঙ্গপালের বাচ্চাগুলিও বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতিবিশিষ্ট হয়ে থাকে। পরীক্ষাগারে যথেষ্ট সংখ্যক পঙ্গপাল প্রতিপালন করে দেখা গেছে, এদের সংখ্যা অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি না পেলে এরা একাকী বিচরণ করে থাকে, কিন্তু সংখ্যা অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পেলেই এদের মধ্যে ওড়বার প্রবৃত্তি জাগতে আরম্ভ করে। খাদ্যের প্রাচুর্যের ফলে অসংখ্য বাচ্চা জন্মাতে থাকে—সংখ্যা আরও বেড়ে গেলে খাদ্য সংগ্রহের প্রবৃত্তি থেকে ওড়বার ইচ্ছা প্রবল হয় এবং দু-একটির ওড়বার প্রবৃত্তি দেখে অপর পতঙ্গেরাও ক্রমশঃ উদ্বুদ্ধ হয় এবং উড়ন্ত পতঙ্গের দল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরূপে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য দল একত্রিত হয়ে সকলে একই দিকে উড়ে চলে। অভিযানের ফলে অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হলেও অবশিষ্টেরা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে বিরাট দল ক্রমশঃ কমতে কমতে অবশেষে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়। কয়েক বছর পরে আবার যখন এই ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে, তখন কোনও এক স্থান থেকে অথবা বিভিন্ন স্থান থেকে অভিযান সুরু হয় এবং ক্রমশঃ বিরাট দলে পরিণত হয়ে দেশ উজাড় করতে করতে অগ্রসর হয়।

পঙ্গপালের উপদ্রব প্রতিকারার্থে আজ পর্যন্ত তেমন কোনও কার্যকরী উপায় আবিষ্কৃত না হলেও এদের আগুনে পুড়িয়ে মারবার জন্যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বিত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ এদের অগ্রগতির পথে আড়াআড়িভাবে লম্বা লম্বা গভীর নালা কেটে রাখা হয়। তাড়া খেয়ে এরা দলে দলে গর্তের মধ্যে পড়ে স্তূপীকৃত হতে থাকে। তখন কেরোসিন প্রভৃতি দাহ্য পদার্থের সাহায্যে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। অনেক স্থলে আবার গভীর গড়খাইয়ের মধ্যে মসৃণ টিনের পাতের লম্বা পাত্র নালার মধ্যে পরপর সাজিয়ে রাখা হয়। পঙ্গপালেরা তার নীচে পড়ে গেলে টিনের মসৃণ গা বেয়ে উপরে উঠে আসতে পারে না। তখন সেগুলিকে ক্রেনের সাহায্যে উপরে তুলে বস্তাবন্দী করে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়।

## কানকোটারীর জীবন-কথা

মাছের ঘুম সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য নির্ধারণের জন্যে রাতের অন্ধকারে একবার কতকগুলি পরীক্ষা চালাতে হয়েছিল। পরীক্ষাগারের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের সম্মুখে রাতের বেলায় একদিন কিছুক্ষণের জন্যে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে কাজ করছিলাম। আলোর ঔজ্জ্বল্যে আকৃষ্ট হয়ে বিচিত্র আকৃতির রকমারি পোকা এসে টেবিলের উপর পড়তে লাগলো। তার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র আকৃতির গঙ্গা-ফড়িঙের মত কয়েকটি বাদামী রঙের পোকার অপূর্ব অঙ্গভঙ্গী এবং মস্তক সঞ্চালন লক্ষ্য করছিলাম। ইতিমধ্যে কয়েক জাতীয় ক্ষুদে জল-পোকাকেও আলোটার চতুর্দিকে লাফালাফি করতে দেখলাম। জল-পোকাগুলি যদিও আমার অপরিচিত নয়, তথাপি তারা যে কেমন করে টেবিলটার উপরে উঠে আসলো, ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আলোর চতুর্দিকে পোকাগুলির গতিবিধি লক্ষ্য করছি, এমন সময় সাঁড়াশীর মত লেজওয়ালা একটা অদ্ভুত আকৃতির পোকা এসে টেবিলের উপর পড়লো! এর শরীরে যে কোনও রকমের ডানার অস্তিত্ব আছে তা বুঝতেই পারা যায় না। কেমন করে পোকাটা টেবিলের উপর এলো? পোকাটা এত দ্রুত-গতিতে ছুটাছুটি করছিল যে, ভাল করে তাকে লক্ষ্য করতেই পারছিলাম না। দেখতে দেখতে ঐরূপ আরও কয়েকটি পোকা এসে জুটলো। তাদের তড়িৎগতিতে ছুটাছুটি এবং অপূর্ব অঙ্গভঙ্গী দর্শনে কারও কৌতূহল উদ্রিক্ত না হয়ে পারে না। মাঝে মাঝে এরা পরস্পর ঝগড়াঝাঁটি করছিল, আবার

কখনও কখনও ছুটে উধাও হচ্ছিল। এরা এমনই চঞ্চল যে, এক মুহূর্তের জন্যেও কোন স্থানে একটু স্থিরভাবে থাকতে দেখলাম না। কেউ কেউ দেহের পশ্চাদ্ভাগের সাঁড়াশীটাকে পর্যায়ক্রমে প্রসারিত ও সংকুচিত করে অতি মসৃণ সর্পিল গতিতে যেন নৃত্যের ভঙ্গী প্রদর্শন করছিল।

এই পোকাগুলির সর্বশরীর প্রায় উন্মুক্ত; কিন্তু পিঠের ঠিক উপরিভাগে শক্ত খোলার মত অতি ক্ষুদ্র দুটি আবরণী আছে। একটাকে ধরে তার পিঠের উপরের শক্ত খোলা দুটি প্রসারিত করে দেখলাম—সেগুলির নীচে প্যারাসুটের মত ভাঁজ-করা দুটি চমৎকার ডানা রয়েছে। বাইরে থেকে দেখে কিছু বুঝতে না পারা গেলেও এই ডানার সাহায্যেই এরা অনেক দূর উড়ে যেতে পারে। এরা কিন্তু ফড়িং বা প্রজাপতির মত যতক্ষণ খুশী আকাশে বিচরণ করতে পারে না। এক স্থান থেকে নিকটবর্তী অন্য কোনও স্থানে যেতে হলে কিয়ৎকালের জন্যে ডানা দুটিকে কাঁপিয়ে একটানা খানিকটা অগ্রসর হতে পারে মাত্র। তখন বুঝলাম—ডানায় ভর করেই এরা টেবিলের উপর উপস্থিত হয়েছিল। যাহোক, অনেকক্ষণ ধরে এদের গতিবিধি লক্ষ্য করবার কালে একসময় দেখলাম—একটা পোকা আলোটার খুব নিকটে এক স্থানে অনেকটা স্থিরভাবে অবস্থান করে যেন ডানার আবরণী দুটিকে অতি দ্রুতবেগে কাঁপাচ্ছে। আনন্দের আতিশয্যেই এরূপ করছে বলেই মনে হলো। পোকাটা থেমে থেমে এরূপ করছিল এবং মাঝে মাঝে এক একবার দ্রুতগতিতে চতুর্দিকে ঘুরে আসছিল। কেন এরূপ করছে ঠিক বুঝা যাচ্ছিল না। অবশেষে অপেক্ষাকৃত বড় আর একটা পোকা ওর কাছে এসে ঘুরতে লাগলো। পোকাটা মাঝে মাঝে ডানাও কাঁপাচ্ছিল। খুব নিকটে কান পেতে শুনলাম—অতি অস্পষ্ট একপ্রকার ঝির্-ঝির্ শব্দ হচ্ছে। আরও কিছুক্ষণ লক্ষ্য করবার পর বুঝতে পারলাম—এটাই তাদের মিলনের পূর্বরাগ। যাহোক, এতগুলি কীট-পতঙ্গের মধ্যে এই পোকাগুলির অপূর্ব চঞ্চল গতি-ভঙ্গীতে যেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কাজেই এদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর বিষয় অবগত হবার জন্যে আগ্রহান্বিত হওয়া স্বাভাবিক। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি পোকা ধরে বিশেষভাবে নির্মিত কাচপাত্রে আবদ্ধ করে রাখলাম।

পরের দিন সুবিধামত স্থানে রেখে সেগুলিকে প্রতিপালন করতে লাগলাম। এদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর মধ্যে সন্তানবাৎসল্য এবং তাদের প্রতিপালন ব্যবস্থাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সম্বন্ধে আলোচনা করবার পূর্বে এই পোকাগুলির মোটামুটি পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

এই পোকাগুলি আমাদের দেশে সাধারণতঃ কানকোটারী নামে পরিচিত। কানকোটারীর শরীর অনেকটা লম্বাটে গোছের সরু এবং মসৃণ। দেখতে কতকটা ডানা ও পিছনের মোটা ঠ্যাং-শূন্য উইচিংড়ির মত। মাথার সম্মুখভাগে ছোট ছোট দুটি শুঁড় আছে। শুঁড় দুটি বিভিন্ন খণ্ডে সংযুক্ত। বুকের পিছনে শরীরের বাকী অংশ অঙ্গুরীর মত বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত। লেজের প্রান্তভাগে ঠিক সাঁড়াশীর মত একটি অদ্ভুত অস্ত্র আছে। এই সাঁড়াশীর মত যন্ত্রটাই এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পিঠের উপর উভয় দিকে খুব ছোট ছোট দুটি শক্ত খোলার মত আবরণী আছে। ক্ষুদ্র ডানা দুটি এরই নীচে ভাঁজ করা থাকে। কয়েক জাতীয় কানকোটারীর আবার মোটেই ডানা থাকে না। কানকোটারী সম্বন্ধে সাধারণ লোকের একটা অদ্ভুত ধারণা আছে। এরা নাকি সুবিধা পেলেই মানুষের কানের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং সাঁড়াশীর সাহায্যে কর্ণপটাহ কুরে কুরে খায়। এই প্রকার অদ্ভুত ধারণা থেকেই এরা কানকোটারী নামে পরিচিত হয়েছে। আবার অনেকে বলে, এরা পত্র-পল্লবের আড়ালে লুকিয়ে থাকে এবং সুবিধামত মানুষের গায়ের উপর পড়ে সাঁড়াশীর দ্বারা ক্ষত উৎপন্ন করে দেয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল ধারণার কোনই ভিত্তি নেই। এগুলিকে অতি নিরীহ প্রাণীই বলা যেতে পারে পারে। এরা কাকেও কামড়ায় না বা দংশনও করে না। নিরীহ প্রাণী হলেও ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকেই এদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে। ডালিয়া, ফ্লক্‌স্‌, কার্‌নেশন এবং অন্যান্য বাহারে ফুলের পাপড়ি এবং বিভিন্ন জাতীয় ফলমূল অনেক সময়ে পোকায় কেটে নষ্ট করে। বাগানের মালিদের জিজ্ঞেস করলে তারা একবাক্যেই বলবে যে, এটা কানকোটারীরই কাজ। কানকোটারীই ফুলের পাপড়ি কেটে এবং ফুলের গায়ে ছিদ্র করে অনিষ্ট করে থাকে। প্রমাণ স্বরূপ তারা

হয়তো দু-একটা ফুল ঝেড়ে তা থেকে দু-একটা কানকোটারী বের করে দেখাবে অথবা কোনও ফলের গায়ে ছিদ্র থেকেও দু-একটা কানকোটারী বের করে দেখাতে পারে। কিন্তু এ থেকেই এ কথা প্রমাণ হয় না যে, এরাই ফলের গায়ে ছিদ্র করে থাকে অথবা ফুলের পাপড়ির অনিষ্টসাধন করে থাকে। এগুলিকে ফলের গায়ের ছিদ্রের মধ্যে অথবা ফুলের পাপড়ির মধ্যে দেখতে পাওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু সেজন্যে এরা সত্য সত্যই কোনও ফল-ফুলের অনিষ্টসাধন করে না। কানকোটারী রাত্রিচর প্রাণী। দিনের বেলায় এরা গর্তের মধ্যে বা কোনও কিছুর আড়ালে আত্মগোপন করে থাকে এবং রাতের বেলায় আহারান্বেষণে বহির্গত হয়। কাজেই এদের ফুলের পাপড়ির আড়ালে অথবা ফলের গায়ে গর্তের মধ্যে অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায়। অন্যান্য পোকারা ফুলের পাপড়ি কেটে বা ফলের গায়ে ছিদ্র করে চলে যায়। সেই সকল ছিদ্রে অথবা কীটদষ্ট ফুলে কান-কোটারীরা আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। এ থেকেই কানকোটারীর সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এরা কিন্তু গাছপালার পক্ষে অনিষ্টকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ উদরসাৎ করে আমাদের যথেষ্ট উপকারই করে থাকে। এদের পেট চিরে মাইক্রোস্কোপের নীচে পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে—তাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ-উকুন ও শোঁয়াপোকা, শ্যামাপোকা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুগলি প্রভৃতি নানা জাতীয় প্রাণীর দেহাবশেষ রয়েছে। তাছাড়া এদের পেটের মধ্যে বেশীর ভাগই অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গের ডিম পাওয়া যায়। অবশ্য সুযোগ পেলে তারা তাদের স্বজাতীয়দের ডিম উদরসাৎ করতেও কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। এরা কীট-পতঙ্গভোজী হলেও ফুল-ফল প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ পদার্থ যে একেবারে স্পর্শ করে না, তা নয়। যখন গাছ-উকুন বা অন্যান্য অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ নিঃশেষিত হয়ে যায় তখন খাদ্যাভাবে এরা পাকা ফলের রস, ফুলের পাপড়ি বা কচিপাতা প্রভৃতি খেয়ে উদরপূরণ করে।

আমাদের দেশে ছোট-বড় কয়েক জাতীয় কানকোটারী দেখতে পাওয়া যায়। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই লেজের দিকে সাঁড়াশীর মত একজোড়া

সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র থাকে। সাঁড়াশীর আকৃতির পার্থক্য দেখে স্ত্রী-পুরুষ কানকোটারী চিনতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। স্ত্রী-কানকোটারীর সাঁড়াশীর মুখ দুটি প্রায় সরলভাবে প্রসারিত এবং পরস্পর গাত্রসংলগ্নভাবে অবস্থান করে। কিন্তু পুরুষ পোকাদের সাঁড়াশী দেখতে অবিকল বেড়ী বা বাউলির মত। পুং পোকাদের এই বেড়ীর অগ্রভাগ দুটি পরস্পর সংলগ্ন হলেও মধ্যস্থলে গোলাকার ফাঁক থেকে যায়। বিবর্তনের দিক থেকে দেখলে কোন্ বিশেষ উদ্দেশ্যে দেহের পশ্চাদ্ভাগে এই অদ্ভুত অস্ত্রটির উদ্ভব ঘটেছিল, তা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় না। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কদাচিৎ এর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। কাঁকড়া বা চিংড়ির দাড়ার মত আহার সংগ্রহে ব্যবহৃত হলেও এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হতো। পূর্বেই বলেছি, পিঠের উপর এদের ডানা দুটি শক্ত খোলার নীচে ভাঁজ করা থাকে। অনেকের ধারণা, ডানা মেলবার পর পুনরায় যথাস্থানে ভাঁজে ভাঁজে সন্নিবেশিত করা কষ্টকর ব্যাপার; সাঁড়াশীর সাহায্যেই এরা ডানা গুটিয়ে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করতে পারে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ কয়েক জাতীয় কানকোটারীর মোটেই ডানা নেই অথচ তাদের প্রত্যেকেরই সাঁড়াশী আছে। তবে পোষবার সময় দেখেছি—যখন ডিম আগলে বসে থাকে, তখন কোন কিছুর সাহায্যে শরীর স্পর্শ করলে শরীরের পশ্চাদ্ভাগ ঘুরিয়ে সাঁড়াশীর সাহায্যে তাকে চেপে ধরে।

শীতের সময় অধিকাংশ পোকা-মাকড়ই কম-বেশী নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করে। অনেকে আবার সারা শীতকালই ঘুমন্ত অবস্থায় কাটিয়ে দেয়। কানকোটারী শীতের সময় কেবল ঘুমিয়ে কাটালেও অনেকটা নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই এদের যৌন-মিলন সংঘটিত হয়। যৌন-মিলনের পর এরা কোনও সুবিধাজনক গর্ত বা ইট-কাঠ প্রভৃতির নীচে একবারে ত্রিশ-চল্লিশটি ডিম পাড়ে। কোনও কোনও জাতীয় কানকোটারীর শীতের সময়েই যৌন-মিলন ঘটে থাকে। কিন্তু তারা ডিম পাড়ে শীতের অবসানে। এদের ডিম পাড়বার ব্যাপার অনেকটা রাণী-মক্ষিকার মত। ডিমগুলি সম্পূর্ণ গোলাকার নয়। বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে ডিমের গায়ে

রামধনুর মত রঙের আভা দেখতে পাওয়া যায়। কীট-পতঙ্গের মধ্যে দেখা যায়—তারা সাধারণতঃ ডিম পেড়েই খালাস। মা তার ডিমের মোটেই তদারক করে না। অনেকে ডিম পেড়ে বাচ্চাদের আহারের জন্যে প্রচুর খাদ্য সঞ্চিত করে রাখে। অনেকে আবার বাচ্চার আহার্যোপযোগী গাছপালা বা প্রাণীদেহে ডিম পেড়ে যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে এই নিয়মের অদ্ভুত ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়। যেমন মৌমাছি, পিঁপড়ে বাচ্চারা আগাগোড়া ধাত্রীর সাহায্যে প্রতিপালিত হয়ে থাকে। আমাদের দেশীয় মৎস্যশিকারী মাকড়সারা শতাধিক বাচ্চা পিঠে নিয়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে থাকে। কাঁকড়া-বিছারাও বাচ্চাগুলি বড় না হওয়া পর্যন্ত সেগুলিকে পিঠে নিয়ে বেড়ায়। তাছাড়া কতকগুলি প্রাণী বাচ্চাদের কাছে থেকে অনবরত তাদের তদারক করে থাকে। আমাদের দেশের আড়-মাছ, শোল-মাছ যেমন অনবরত সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাদের বাচ্চাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করে, কানকোটারীর সন্তান-বাৎসল্যও তদনুরূপ। ডিম পাড়বার সময় থেকে আরম্ভ করে স্ত্রী-পোকাটা পারতপক্ষে তাদের ছেড়ে কোথাও যায় না। যখন খাদ্যসংগ্রহ করতে বের হয়, তখনও মাঝে মাঝে গর্তে ফিরে এসে ডিমগুলিকে দেখে যায়। কিন্তু নেহাৎ অসুবিধায় না পড়লে এ সময়ে খাদ্য সংগ্রহে বহির্গত হয় না। মাটির মধ্যে সাধারণ গর্তের মত একটি স্থানে ডিমগুলিকে একত্রিত করে শরীরের সম্মুখভাগ এবং সম্মুখের পায়ের সাহায্যে সেগুলিকে আবৃত করে রাখে। ঐ সময়ে শরীরের পশ্চাদ্ভাগের সাঁড়াশী ও পা দুটিকে উঁচু করে এমনভাবে অবস্থান করে যে, কোনও শত্রুর পক্ষে গর্তে ঢুকে কিছু অনিষ্টসাধন করা অসম্ভব। তাছাড়া শত্রুকে আঘাত করবার জন্যে ডিম পাড়বার পর তারা আর একটি অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করে। মুষ্টিযোদ্ধারা লড়াই করবার সময় যেমন চামড়ার ভারী দস্তানা ব্যবহার করে, এরাও সেরূপ পিছনের পা দুটির প্রান্তভাগে কাদা জমিয়ে পুরু দস্তানা তৈরী করে নেয়। কাদা শুকিয়ে পা দুখানি ঠিক শক্ত মুগুরের আকৃতি ধারণ করে। এই অবস্থায় চলবার সময় কানকোটারী তার সম্মুখের পা মাত্র ব্যবহার করে। পিছনের পা দুটি ভারী বস্তুর মত ঘষড়ে চলতে থাকে। এই সময়ে ডিম বা কানকোটারীর

শরীর স্পর্শ করলেই দেখা যাবে সে তার মুগুরের মত পায়ের সাহায্যে ঝট্‌কা আঘাত করে শত্রুকে হটিয়ে দিতে চাইছে। কাজেই এরা যে ডিম রক্ষা করবার জন্যে পা দুখানিতে এরূপভাবে ইচ্ছামত কাদা মাখিয়ে নেয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। সময় সময় কোনও পায়ের কাদার আবরণ ভেঙে গেলে পুনরায় জুড়ে নিতে দেখা যায়। পিপেটের সাহায্যে দুই পায়ের কাদার ডেলার উপর দু-এক ফোঁটা জল নিক্ষেপ করে দেখা গেছে মাটি ভিজে কাদার ডেলা ক্রমশঃ গলে গেলে পুনরায় দু-একদিনের মধ্যেই পা দুটিকে মুগুরের মত করে নিয়েছে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবার কিছুকাল পরে কানকোটারী পায়ে আর মাটির প্রলেপ রাখে না।

পনেরো-ষোল দিন পরে কানকোটারীর ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। এই কয়দিন তার আর অবসর থাকে না। সর্বদাই ডিম তদারক করে। ডিমগুলিকে প্রায়ই একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে সরিয়ে রাখে। একপ্রকার আঠালো পদার্থের সাহায্যে ডিমগুলি গায়ে গায়ে লেগে থাকে। একসঙ্গে সংলগ্ন এরূপ অনেকগুলি ডিমকে কানকোটারী চোয়ালের সাহায্যে প্রথমে স্থানান্তরিত করে। পরে এসে বিক্ষিপ্ত ডিমগুলিকে সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। যখন ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে সুরু করে, তখন কানকোটারী অতি ব্যস্ত হয়ে উত্তেজিতভাবে ডিমগুলির মধ্যে কখনও মস্তক প্রবেশ করিয়ে কখনও বা শুঁড় দিয়ে বাচ্চাগুলিকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে। প্রায় ঘণ্টাখানেক সময়ের মধ্যেই মায়ের চতুর্দিকে সম্পূর্ণ সাদা রঙের কালো চোখ বিশিষ্ট চল্লিশ-পঞ্চাশটি বাচ্চা মাছির মত কিলবিল করতে থাকে। মা তাদের জন্যে নতুন গর্ত করে সেখানে তাদের রাখবার ব্যবস্থা করে। মা যেদিকে তাদের নিয়ে যেতে চায়, তারা যেন কি এক ইঙ্গিত পেয়ে সে দিকেই যেতে থাকে। মুরগীর বাচ্চাগুলিকে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে অনেকেই দেখেছেন। মা যেখানে থাকে, তার আশেপাশেই ঘুরেফিরে তারা আহার সংগ্রহ করে; কিন্তু কোনও প্রকার বিপদের সম্ভাবনা দেখলে মুরগী এক প্রকার শব্দ করলেই বাচ্চাগুলি ছুটে এসে মায়ের ডানার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিপদের ভয় কেটে গেলেই মা বাচ্চাগুলিকে পুনরায় যথেচ্ছ

বিচরণ করতে দেয়। কানকোটারী মুরগী অপেক্ষা নিম্নস্তরের প্রাণী হলেও বাচ্চাগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে কোন অংশেই উন্নতর প্রাণী অপেক্ষা হীন বলে মনে হয় না। কোনরূপ বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই বাচ্চাগুলি ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকলেও কি যেন একটা সংকেত পেয়ে মায়ের চতুর্দিকে একত্রিত হয়ে একেবারে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। এতগুলি বাচ্চা যে কিভাবে এরূপ শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। বোধ হয় বাচ্চাগুলি একে অন্যের শুঁড়ে শুঁড় স্পর্শ করে বিপদের সংকেত জানিয়ে দেয়। বিপদ কেটে গেলে পুনরায় নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যেই ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্নভাবে ঘোরাফেরা করতে থাকে। পূর্বেই বলেছি, বাচ্চাগুলি বের হবার পর সম্পূর্ণ সাদা থাকে ; কিন্তু ধীরে ধীরে দেহের রং পরিবর্তিত হয়ে গাঢ় বাদামী বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। ডিম থেকে বহির্গত হবার পনেরো-ষোল দিন পর বাচ্চাগুলি প্রথম বার খোলস পরিবর্তন করে। তখন পুনরায় শ্বেত বর্ণ ধারণ করে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই রং পরিবর্তিত হয়ে বাদামী বা ধূসর বর্ণে পরিণত হয়। বাচ্চাগুলি কিন্তু তখনও মায়ের সঙ্গ ছাড়ে না অথবা মা-ই বাচ্চাদের স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয় না। দ্বিতীয় বারের খোলস পরিত্যাগের পরও মা তাদের জন্যে আহার সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে।

অনেক সময় দেখা যায়, বাচ্চাগুলির বয়স দু-তিন সপ্তাহ হলে কানকোটারী আবার নতুন করে কতকগুলি ডিম পাড়ে। পূর্বের বাচ্চাগুলিও সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। বাচ্চাগুলির জ্বালাতনে বিব্রত হয়ে মা-কানকোটারী সাধারণতঃ শেষের ডিমগুলিকে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে ; কিন্তু বাচ্চাগুলিকে তাড়াবার চেষ্টা করে না। বাচ্চাগুলিও আবার এমনই যে, সুবিধা পেলে তাদের মায়ের এই নতুন ডিমগুলিকে খেয়ে নিঃশেষ করতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। একই ঋতুতে স্ত্রী-কানকোটারী কিছু দিন পর পর প্রায় তিন-চার বার ডিম পাড়ে, প্রথম বারের অপেক্ষা ডিমের সংখ্যা ক্রমশঃই কম হতে থাকে। বাচ্চাগুলি চারবার খোলস বদ্‌লাবার পর পরিণত বয়স্ক কানকোটারীর আকার ধারণ করে। ফড়িং, প্রজাপতি প্রভৃতি কতকগুলি

প্রাণীর বাচ্চারা খোলস বদ্‌লাবার সঙ্গে সঙ্গেই আকৃতিতে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রথমে তারা পুত্তলীতে রূপান্তরিত হয়। পুত্তলী অবস্থায় এরা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকে। আবার পুত্তলী অবস্থা থেকে খোলস বদ্‌লে সম্পূর্ণ নতুন রূপ পরিগ্রহ করে বহির্গত হয়। কানকোটারী চার বার খোলস পরিবর্তন করলেও তাদের এরূপ কোনও অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে না। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদের দেহের আয়তন বেড়ে যায়, কিন্তু উপরের চামড়াটা শক্ত হয়ে যাবার পরে তা আর শরীরের সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে পারে না। কাজেই খোলস বদ্‌লাবার প্রয়োজন হয়। তৃতীয় বার খোলস পরিবর্তন করবার পর পিঠের ডানার আবরণ আত্মপ্রকাশ করে। কানকোটারী সাধারণতঃ এক বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে। স্ত্রী-কানকোটারী ক্রমাগত তিন-চার বার ডিম পাড়লেও তার যৌন-মিলন একবারই ঘটে থাকে। মৌমাছি ও পিঁপড়ের রাণীরা যেমন একবার মিলনের পর অনবরত নিষিক্ত ডিম প্রসব করতে পারে, কানকোটারীও সেরূপ একবার মিলনের পর কয়েক-বারই নিষিক্ত ডিম প্রসব করে থাকে। গুবরে পোকা, মৌমাছি প্রভৃতি কীট-পতঙ্গেরা তাদের দেহের ওজনের তুলনায় অনেক গুণ বেশী ভারী জিনিস টেনে নিয়ে যেতে পারে। গুবরে পোকা তার শরীরের ওজনের ১৮২ গুণ ভারী এবং ভ্রমর তিন শত গুণ ভারী জিনিস টানতে পারে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, কানকোটারী তার ওজনের ৫৩০ গুণ ভারী জিনিস টানবার শক্তি রাখে।

## কীট-পতঙ্গের বাজনা

প্রাণী-জগতে সুগায়ক হিসেবে পাখীরাই সমধিক পরিচিত। কিন্তু প্রাণীদের মধ্যে মানুষ ও পাখী ছাড়া কণ্ঠসঙ্গীতে আর কেউ যে কৃতিত্ব অর্জন করে নি, এমন কথা বলতে পারা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যাঙের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। গানে ব্যাং কারও অপেক্ষা কম যায় না। মানুষের কাছে তাদের গানের কদর না থাকতে পারে, তাদের স্বজাতীয়দের কাছে কিন্তু কদর খুবই বেশী। বর্ষা সমাগমে তাদের সঙ্গীতের প্রতিযোগিতা চলতে থাকে এবং প্রণয়িনীরা প্রতিযোগীদের সঙ্গীতের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিবেচনা করেই তাদের সঙ্গী নির্বাচন করে থাকে। শোনা যায়, সীল জাতীয় কোনও কোনও প্রাণী নাকি সময়ে সময়ে অতি করুণ সুরে ঐকতানে গান গেয়ে থাকে। কিন্তু মানুষ যেমন একাধারে যন্ত্র ও কণ্ঠ-সঙ্গীতে পারদর্শিতা লাভ করেছে, অন্য কোন প্রাণী সেরূপ দ্বিবিধ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে নি। পাখী, ব্যাং প্রভৃতি প্রাণীরা যেমন কণ্ঠসঙ্গীত আয়ত্ত করেছে নিম্নস্তরের কীট-পতঙ্গেরাও তেমনি যেন যন্ত্রসঙ্গীতে আধিপত্য লাভ করেছে। পৃথিবীতে বাজনদার কীট-পতঙ্গের সংখ্যা অগণিত। আমাদের দেশেই যে কত বিভিন্ন রকমের বাজনদার কীট-পতঙ্গ আছে, তার সংখ্যা নির্ণয় করা দুষ্কর। এরা যান্ত্রিক কৌশলে সুসংলগ্ন শব্দ-তরঙ্গ উৎপাদন করে থাকে। আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় যেরূপ নির্দিষ্ট কতকগুলি আলোক-তরঙ্গ উপলব্ধি করতে সক্ষম, শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষমতাও সেরূপ সীমাবদ্ধ। নির্দিষ্ট সুর-তরঙ্গের সীমা

অতিক্রম করে গেলে কোনও শব্দই আমাদের কর্ণগোচর হবে না। তার মধ্যেও আবার ক্ষীণ ও সূক্ষ্মতর তরঙ্গগুলি সহজে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে আকৃষ্ট করতে পারে না। বিশেষতঃ সূক্ষ্মতর তরঙ্গগুলি যদি একটানা চলতে থাকে তবে তাতে শ্রবণেন্দ্রিয় এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে, বিশেষ মনোযোগ না দিলে তা মোটেই আমাদের বোধগম্য হয় না। আমাদের আশেপাশে ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিভিন্ন জাতীয় কীট-পতঙ্গেরা অহরহ বাজনা বাজিয়ে থাকে। সুরের তীক্ষ্ণতা থাকলেও আওয়াজ এত ক্ষীণ যে, সেদিকে আমাদের মনোযোগ মোটেই আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু কীট-পতঙ্গের মধ্যে ঝিঁঝিঁপোকা ও পঙ্গপাল জাতীয় কয়েক প্রকার ফড়িঙের আওয়াজের সুরগ্রাম এত উগ্র ও কর্ণভেদী যে, তাতে যখন-তখনই লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

বিভিন্ন জাতীয় মাছ, গুবরে পোকা ও কোনও কোনও সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীরা যান্ত্রিক কৌশলে শব্দ উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু তাদের শব্দকে বাজনা বলা যায় না; যেহেতু তাদের শব্দে সুসঙ্গত কোনও সুরের ঝঙ্কার নেই। বিশেষতঃ দু-একটি প্রাণী ছাড়া এদের অনেকেরই শব্দবোধ আছে কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। আড়, ট্যাংরা, চেক্‌ভাগা প্রভৃতি মাছকে জল থেকে তুলে ধরলেইকান্‌কোর উভয় পার্শ্বস্থিত কাঁটা দুটিকে সামনে ও পিছনে নেড়ে কটর কটর শব্দে বিকট আওয়াজ করতে থাকে। কট্‌কটে মাছকে জল থেকে তোলা মাত্রই দাঁতের সাহায্যে কট্‌কট্ শব্দ করে পেট ফুলাতে থাকে। পাতিচাঁদা মাছকে জল থেকে তুললেই বুক ও পিঠের কাঁটাগুলিকে খাড়া করে বীণার ঝঙ্কারের মত ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ করে থাকে। অবশ্য শব্দ এত ক্ষীণ যে, বিশেষ মনোযোগ না দিলে কানে পৌঁছায় না, তবে স্পর্শ করলে কম্পন অনুভূত হয়। সিঙ্গি, মাগুর প্রভৃতি মাছেরা উত্তেজিত হলে জলের উপর মাথা তুলে কুপ্‌ কুপ্‌ শব্দ করে, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় জলের নীচে এরা কেউ এরূপ শব্দ করে না। এতেই বোঝা যায়, আততায়ীর ভীতি উৎপাদনের নিমিত্তই এরা এরূপ শব্দ করে থাকে। ওড়বার সময় কোনও কোনও পাখীর ডানা ও পালকের সংস্পর্শে বাতাসের

মধ্যে অনেক প্রকারের শ্রুতিমধুর শব্দ উৎপন্ন হয়ে থাকে। উড়ন্ত মশা-মাছির ডানা থেকেই একটানা সুরের মত শব্দ নির্গত হয়; কিন্তু কোনটিকেই যন্ত্র-সঙ্গীত আখ্যা দেওয়া যায় না, কারণ এদের কেউ ইচ্ছানুযায়ী শব্দ উৎপাদন করে না। কোন এক জাতের টিকটিকি লেজ কাঁপিয়ে শব্দ উৎপাদন করে। র‍্যাট্‌ল সাপের লেজ থেকেও খট্‌ খট্‌ শব্দ উত্থিত হয়। এর কোনটাই সঙ্গীত নয়, ভয় দেখাবার কৌশলমাত্র। চাক রক্ষা করবার সময় বোলতা, ভীমরুল ও মৌমাছিরা আততায়ীকে সম্মুখে দেখলে ডানা কাঁপিয়ে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ করতে থাকে। সাপের শ্রবণেন্দ্রিয় সম্পর্কে অনেক বিতর্ক আছে। কেউ কেউ বলেন, সাপ বাঁশীর সুরে সাড়া দিয়ে থাকে। সাপের সঙ্গীতবোধ আছে কিনা জানি না; কিন্তু সাপ অপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরের কীট-পতঙ্গের মধ্যেও শ্রবণশক্তির পরিচয় পেয়েছি। অভিব্যক্তির স্তরে মাকড়সা অতি নিম্নশ্রেণীর জীব। এই মাকড়সার শ্রবণশক্তি সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। কোনও এক ব্যক্তি ঘরে বসে বেহালা বাজাতেন। প্রায় প্রত্যেক দিনই নাকি একটি মাকড়সা যন্ত্র-সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়ে ছাদ থেকে কিছু দূর নেমে এসে সূতায় ঝুলে থাকতো। বাজনা বন্ধ হলেই আবার সূতা বেয়ে উপরে উঠে যেত। এ কাহিনী সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক, আমি নিজে কোনও কোনও জাতীয় মাকড়সাকে যন্ত্র-সঙ্গীতের কোনও একটি নির্দিষ্ট সুরে সাড়া দিতে দেখেছি। জালের উপর মাকড়সাটি নিরিবিলি বসে আছে, খুব জোরে কাঠে কাঠে ঠুকে যতবারই আওয়াজ করেছি, ততবারই সে আঁৎকে উঠেছে। ধাতব তার সবলে প্রসারিত রেখে তাতে আঘাত করলে যে ঝঙ্কার উৎপন্ন হয়, তাতে তাকে অদ্ভুত ভঙ্গীতে নৃত্য করে সাড়া দিতে দেখেছি। শ্রবণেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব না থাকলে এরূপ ঘটনা সম্ভব হতো কিনা বলা যায় না। মাকড়সার কথা ছেড়ে দিলেও নিম্নস্তরের অন্যান্য কীট-পতঙ্গের সঙ্গীতে রসবোধ দেখলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। এদের কেউ কণ্ঠসঙ্গীতে পারদর্শী নয়, অর্থাৎ এদের কারও কণ্ঠস্বর নেই; কিন্তু যন্ত্র-সঙ্গীতে এরা অদ্ভুত কৃতিত্ব অর্জন করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ পতঙ্গেরা বাজনা বাজিয়ে স্ত্রী-পতঙ্গদের আকৃষ্ট করবার চেষ্টা

করে থাকে ; কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে মনে হয় যেন কেবল চিত্তবিনোদনের জন্যেই এরা ঐকতানে বাজনা বাজিয়ে থাকে। এদের শ্রবণশক্তির প্রখরতা সম্বন্ধেও সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ নেই, কোনও কোনও জাতের পতঙ্গের মধ্যে আবার এমন অদ্ভুত ঘটনা দেখতে পাওয়া যায় যে, তারা স্বজাতীয়দের বাজনায় আকৃষ্ট তো হয়ই অধিকন্তু মানুষের যন্ত্রসঙ্গীতে, এমন কি তাদের গানেও আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

পল্লীগ্রামে একবার কোনও একটা দীঘির ধারে সোপানশ্রেণীর উপর বসে কয়েকজন গল্পগুজব করছিলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। এমন সময় সকলের অনুরোধে একজন গান ধরলেন। গান সুরু হবার পাঁচ-সাত মিনিট পরেই আশেপাশের গাছপালার উপর থেকে দু-একটি করে ঝিঁঝিপোকা উড়ে এসে আমাদের গায়ে বসতে লাগলো। গান চলছিল ; দেখতে দেখতে আরও অনেক ঝিঁঝিপোকা উড়ে এসে আমাদের অস্থির করে তুললো। গান থামতেই কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের উৎপাত বন্ধ হয়ে গেল। প্রায় পনেরো-বিশ মিনিট পরে পুনরায় গান সুরু হতেই দেখা গেল আবার দু-একটি করে ঝিঁঝিপোকা উড়ে এসে গায়ে পড়ছে। সবুজ রঙের ঝিঁঝিপোকাদের একটা অদ্ভুত স্বভাব এই যে, ক্রমাগত খট্‌খট্‌ করে কোনও কর্কশ আওয়াজ শুনলেও সেখানে ছুটে আসবে। পূর্ববঙ্গের অনেক পল্লী অঞ্চলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঝিঁঝিপোকা ধরবার এক অদ্ভুত খেলা প্রচলিত আছে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে যখন ঝিঁঝিপোকার আবির্ভাব ঘটে, তখন সন্ধ্যাকালে ছেলেমেয়েরা সকলে মিলে ঝিঁঝিপোকার ছড়া সুর করে আবৃত্তি করতে থাকে এবং প্রত্যেকে দু-হাতে দুটি নারিকেলের মালা ঠুকে সঙ্গে সঙ্গে তাল দিতে থাকে। ঐ শব্দ শুনে স্ত্রী-পুরুষ উভয় জাতীয় ঝিঁঝিপোকা উড়ে এসে গায়ে বসে। তখন অনায়াসেই তাদের ধরে ফেলে। ডানায় ধরে রাখলে অথবা বুকে একটু চাপ দিলেই পোকাগুলি কট্‌ কট্‌ কড়-ড়-ড়-ড় করে বিকট শব্দ করতে থাকে। এতেই ছেলেমেয়েদের আনন্দ।

আমাদের দেশে দুই জাতীয় ঝিঁঝিপোকা সচরাচর নজরে পড়ে। এক জাতীয় পোকা সবুজ রঙের ; অপর জাতীয় পোকার গায়ের রং ধূসর এবং

ডানার উপর ফোঁটা ফোঁটা কতকগুলি দাগ। সবুজ পোকাগুলিই সাধারণের নিকট পরিচিত। এদের ডানাশূন্য পুত্তলীগুলি গাছের গুঁড়ি অথবা অন্য কোনও পরিস্কৃত স্থানে চুপ করে বসে। স্থির হয়ে বসবার কয়েক ঘণ্টা পরে পুত্তলীর পিঠের উপরের দিক লম্বালম্বিভাবে ফেটে যায় এবং সেই ফাটলের ভিতর থেকে ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ ঝিঁঝিপোকা বের হয়ে আসে। শীতের অবসানে এগুলিকে সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু বর্ষার প্রারম্ভেই আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। পুরুষ পতঙ্গগুলিই অতি উচ্চৈঃস্বরে 'ঝিন্‌ঝিন্‌' আওয়াজ করে থাকে। দিনের বেলাই এদের বাজনার প্রশস্ত সময়, প্রায় সারাদিনই কোনও-না-কোনও দলের বাজনা শুনতে পাওয়া যায়। সমস্ত নিস্তব্ধ—কোথাও কোনও শব্দ নেই—হঠাৎ কোনও পাতার আড়াল থেকে কিট্ কিট্ কিট্ কিরির-র-র-র শব্দে কর্ণভেদী আওয়াজ উত্থিত হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই অপর কোনও পাতার আড়াল থেকে অনুরূপ শব্দ আসতে লাগলো, দেখতে দেখতে নানা দিক থেকে সেই একই সুরে সুর মিলিয়ে ঐকতান সুরু হয়ে গেল। দু-একটা এই ঐকতানে সুর মিলাতে গিয়ে সময় সময় সঙ্গৎ বেঠিক করে ফেলে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দু-চার বার শব্দ করে সঙ্গৎ ঠিক হচ্ছে না বুঝতে পেরেই যেন তৎক্ষণাৎ চুপ করে যায়। খানিক বাদে একমাত্রা শেষ হয়ে গেলে দ্বিতীয় মাত্রার প্রথম থেকেই সুর মিলিয়ে ঐকতানে যোগদান করে। যখন চতুর্দিক থেকে সকলে মিলে ঐকতান সুরু করে, তখন কেবল ঝিন্ ঝিন্ আওয়াজ শোনা যায়। সুর যেমন কর্কশ তেমনই সুতীক্ষ্ণ। কর্ণপটহে যেন সুচের মত বিঁধতে থাকে। সুরগ্রাম ক্রমশঃ সুউচ্চ পর্দায় উঠে যায়, আবার ধীরে ধীরে ধীরে নীচের পর্দায় নেমে আসে। এরূপ তালে তালে অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটানা সঙ্গীত চলতে থাকে। মনে হয় সুরের ঝঙ্কার যেন এক দিক থেকে আরম্ভ করে চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে আসছে।

বর্ষা আরম্ভ হলেই ধূসর বর্ণের ঝিঁঝিপোকার বাজনা সুরু হয়। এরা কাঠ-ঝিঁঝি নামে পরিচিত। সবুজ রঙের পোকাগুলির চেয়ে এরা আকারে ছোট। কাঠ-ঝিঁঝি প্রায়ই প্রায়ই গাছের উঁচু ডালে অবস্থান করে বলেই

লোকের নজরে পড়ে না। কেবল ঝিরঝির শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এরাও ঐকতানে বাজনা বাজিয়ে থাকে; কিন্তু শব্দ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ ও একঘেয়ে বলে সহজে মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। ঝিঁঝিপোকার শরীরের উভয় পার্শ্বে দুটি গভীর গর্তের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডানার মত দুটি পর্দা আছে। ঐ পর্দাগুলিকে দ্রুতগতিতে কাঁপিয়ে তারা শব্দ উৎপাদন করে থাকে। গর্তের আবরণ ড্রামের পর্দার মত কেঁপে উঠে ডানার ক্ষীণ শব্দকম্পনকে বহু গুণে বাড়িয়ে এরূপ উচ্চ সুরে পরিণত করে।

## কীট-পতঙ্গের লুকোচুরি

শিয়াল, সজারু, অপোসাম প্রভৃতি জানোয়ার শত্রুহস্তে লাঞ্ছিত হলে আত্মরক্ষার জন্যে যেমন মৃতের মত ভান করে পড়ে থাকে এবং সুযোগ বুঝলেই ছুটে পালায়, নিম্নশ্রেণীর কীট-পতঙ্গের মধ্যে অহরহই সেরূপ দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। ধরা মাত্রই ফড়িং প্রবল বেগে ডানা নেড়ে পালাবার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টার পর, শত্রুর হাত থেকে কোনক্রমে নিস্তার লাভের উপায় না দেখলে মৃতের মত ভান করে অসাড়ভাবে পড়ে থাকে। মনে হবে যেন মরে যাবার পর দেহটা শক্ত হয়ে গেছে। তখন সেটাকে ধরে রাখবার কথা কারও মনে উদয় হয় না। ছাড়া পাবার পর কিছুক্ষণ মৃতের মত পড়ে থেকে হঠাৎ চক্ষের নিমেষে উড়ে পালায়। একটা ফড়িং ধরে মাকড়সার জালের উপর ছুঁড়ে দিল ফড়িংটা জালের আঠায় আটকে যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গেই জাল থেকে মুক্ত হবার জন্যে প্রাণপণে ঝাপ্‌টা-ঝাপটি সুরু করে দেবে। ফড়িংটা যদি আকারে বেশ বড় হয়, তবে দেখা যাবে মাকড়সাটা ভয়ে জালের এক প্রান্তে গিয়ে লুকিয়ে আছে। প্রাণপণে চেষ্টা করেও ফড়িংটা যখন বুঝতে পারে আর মুক্ত হবার উপায় নেই, তখন সে শিকারীর কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে অন্য উপায় অবলম্বন করে। সে তখন মড়ার মত চুপ করে পড়ে থাকে। বেশ কিছু সময় কেটে যায় একটুকুও নড়াচাড়া করে না। এদিকে মাকড়সা জালের দূর প্রান্তে আত্মগোপন করে ওৎ পেতে রয়েছে। নড়াচড়া বন্ধ হবার কিছুক্ষণ পরে যখন বুঝতে পারে যে শিকার নিশ্চয়ই নিস্তেজ হয়ে পড়েছে,

তখন ধীরে ধীরে জালের সূতা বেয়ে ফড়িংটার কাছে উপস্থিত হয়। কিন্তু শিকার তখনও নড়াচড়া না করলে সে চুপ করে বসে থাকে। মাকড়সাদের এক অদ্ভুত স্বভাব দেখা যায়—এরা মৃতদেহ আহার করে না। মৃত কীট-পতঙ্গ জালে ফেলে দিলে হয় জাল ঝেড়ে নয়তো জাল কেটে সেটাকে ফেলে দেয়। জাল পেতে শিকার ধরে এরূপ বিভিন্ন জাতের অধিকাংশ মাকড়সারই সাধারণতঃ এই রীতি। যাহোক, মৃত মনে করে মাকড়সাটা অসাড় ফড়িংটার কাছে বসে সময় সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। কিন্তু ফড়িংটা স্বভাবের তাড়নায়ই হোক বা অনেকক্ষণ একভাবে থাকায় অস্বস্তির দরুণই হোক একটু গা ঝাড়া দিতেই মাকড়সা ছুটে গিয়ে তার ঘাড় কামড়ে ধরে এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরের পশ্চাদ্ভাগ থেকে ফিতার মত সূতা বের করে তাকে জড়িয়ে ফেলে। ফড়িংটা যদি আরও কিছুক্ষণ ঐ ভাবে ধৈর্য ধরে অসাড়ভাবে থাকতে পারতো তবে মাকড়সা তাকে সত্য সত্যই মৃত মনে করে জাল কেটে ফেলে দিত। শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত মাকড়সারাও কিন্তু মৃতের মত ভান করে প্রাণরক্ষা করে থাকে। ছুটাছুটি করেও শত্রুর কবল থেকে মুক্ত হতে না পারলে তাকে বিভ্রান্ত করবার উদ্দেশ্যে হাত-পা গুটিয়ে ক্ষুদ্র এক এক ডেলা ঝুল বা ঐরূপ কোনও অকিঞ্চিৎকর পদার্থের মত নিস্পন্দভাবে পড়ে থাকে। শত উত্যক্ত করলেও এই অবস্থায় পলায়নের চেষ্টা করে না। কতকটা যেন কচ্ছপের মত অবস্থা-প্রাপ্ত হয়। মাকড়সা বলে কোনও ক্রমেই চিনতে পারা যায় না। চোখের সামনে থাকলেও তাকে তখন খুঁজে বের করা দুষ্কর হয়ে পড়ে।

কমা-প্রজাপতি নামে অদ্ভুত আকৃতির এক প্রকার প্রজাপতি দেখতে পাওয়া যায়। এদের ডানাগুলি স্বভাবতঃই যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন। ডানা মুড়ে পত্র-পল্লবের উপর বসে থাকলে গাছের ছিন্নপত্র ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। কোন জাতীয় শত্রুর ভয়ে এরা এরূপ লুকোচুরি খেলে থাকে, তা বুঝতে পারা যায় না।

আমাদের দেশে কয়েক জাতীয় সূতলি পোকা দেখা যায়। এরা মথ জাতীয় এক প্রকার প্রজাপতির বাচ্চা। গাছের পাতা খেয়েই এরা জীবন-ধারণ করে। সূতলি পোকার শরীরের মধ্যদেশে পায়ের অস্তিত্ব নেই।

দেহের সম্মুখভাগ এবং পশ্চাদ্ভাগে পা-গুলি অবস্থিত। এই জন্যেই এরা জোঁকের মত চলাফেরা করে। যে গাছে সুতলি পোকা বিচরণ করে তার রং এবং সুতলি পোকার শরীরের রং দেখতে প্রায় একই রকমের। কাজেই বর্ণসামঞ্জস্যে বিভ্রান্ত হয়ে শত্রুরা অনেক সময়েই প্রতারিত হয়ে থাকে। চড়ুই পাখীরা এদের পরম শত্রু। এই শত্রুদের প্রতারণা করবার জন্য এরা আর এক প্রকার অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করে থাকে। সরু সরু ডালের গায়ে পশ্চাদ্ভাগের পা আটকে শরীরটাকে কাঠির মত বাইরের দিকে প্রসারিত করে দেয় এবং এই অবস্থায় সারাদিন নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। দেখে মনে হয় যেন ডালের গায়ে একটি পত্রশূন্য বোঁটা লেগে রয়েছে। পাখীদের ভয়ে সারাদিন এভাবে থেকে রাতের বেলায় আহারান্বেষণে বহির্গত হয়। শত্রুর নিকট এই চাতুরি ধরা পড়ে গেলে তৎক্ষণাৎ ডালের গায়ে সুতা এঁটে মাকড়সার মত নীচে ঝুলে পড়ে। ঝোপঝাড়ের মধ্যে সুতার প্রান্তে কাঠির মত সুতলি পোকা ঝুলে আছে একটু লক্ষ্য করলে ঐ দৃশ্য সহজেই নজরে পড়ে। এক জাতের সুতলি পোকা দেখতে পাওয়া যায়, তারা যে গাছের পাতা খেয়ে জীবনধারণ করে, দিনের বেলায় সেই গাছের ডাল আঁকড়ে নীচের দিকে ঝুলে থাকে। মনে হয় যেন সরু সরু লাঠির মত কতকগুলি ফল ঝুলছে। এক-একটা পল্লবের নিকটবর্তী ডাল থেকে এরূপ অসংখ্য পোকা ঝুলতে দেখা যায়।

শরীরের পশ্চাদ্ভাগে শুঁড়ওয়ালা সবুজ রঙের এক জাতীয় মথ-প্রজাপতির বাচ্চা পাখীদের উপাদেয় খাদ্য। এরাও গাছের পাতা খেয়ে শরীরপোষণ করে। দিনের আলো বেড়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই এরা খাওয়া বন্ধ করে এবং একটা পাতা যত দূর খাওয়া হয়ে গেছে তারই কাছে মাথা উঁচু করে এক প্রকার প্রকার অদ্ভুত ভঙ্গীতে বসে থাকে। দেখে স্বভাবতঃই মনে হয় যেন বোঁটার গায়ে একটি কুঁড়ি গজিয়ে উঠেছে। শত্রুর দৃষ্টি এড়াবার এটাই তাদের প্রধান ফন্দী।

কীট-পতঙ্গেরা সাধারণতঃ ডিম পেড়েই খালাস, বাচ্চাদের কোনও খোঁজ-খবর নেয় না। দুর্বল ও অসহায় হলেও নিজেরাই তাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা

করে থাকে। এই আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় তারা যে কত রকম অদ্ভুত কৌশল ও অনুকরণ শক্তির পরিচয় দিয়ে থাকে তা লক্ষ্য করলে বিস্মিত হতে হয়। আমাদের দেশীয় রক্ততিলক-প্রজাপতির বাচ্চারা পুত্তলী-অবস্থায় নিরাপদে কাটাবার জন্যে এমন এক অদ্ভুত আকৃতি পরিগ্রহ করে যে, দেখলেই যেন একটা বিতৃষ্ণার ভাব উদয় হয়; তার কাছ ঘেঁষতেই প্রবৃত্তি হয় না। কাঠ-পোকারা ( কতকটা ক্ষুদ্রকায় গুবরে পোকার মত দেখতে ) গাছের গায়ে ডিম পেড়ে তার আর কোনও খোঁজখবর নেয় না। ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে গাছের গায়েই অবস্থান করে। পাখীরা এদের ভীষণ শত্রু। গুটি বেঁধে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করবার সময় সহজেই শত্রুর কবলে পড়তে পারে—এই ভয়ে সেই গাছের ফলের অনুকরণে গুটি নির্মাণ করে তার মধ্যে নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান করে। এদের শত্রুরা, এমন কি, মানুষেরাও সহজে বুঝতে পারে না যে, সেগুলি গাছের ফল, না পোকার গুটি। ফ্লাটা নামক এক জাতের পতঙ্গের বাচ্চা শত্রুর নজর এড়াবার জন্যে পত্রশূন্য সরু ডালের গায়ে পর পর গুটি নির্মাণ করে শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে। দেখলে ডালের পাতা বা বোঁটায় ঝুলনো ফল বলে মনে হয়। নিম্নশ্রেণীর কীট-পতঙ্গের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায় যে, তারা তাদের দেহের রং ও শরীরের অদ্ভুত আকৃতির সাহায্যে অপরকে বিভ্রান্ত করে আহার সংগ্রহ ও আত্মরক্ষা—এই উভয়বিধ ব্যবস্থাই করে নিয়েছে। আমাদের দেশের নালা-ডোবা, পুকুরে জলজ লতাপাতার মধ্যে কাঠির মত ধূসর রঙের এক প্রকার পোকা বোধ হয় সকলেরই নজরে পড়ে থাকবে। এরা জলজ ঘাসের মধ্যে নীচের দিকে মুখ করে হাত-পা ছড়িয়ে ডালপালা-সংযুক্ত একটি তৃণখণ্ডের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চলভাবে চুপ করে পড়ে থাকে। গায়ের রং এবং চেহারা দেখে অন্যের তো দূরের কথা, মানুষেরাই বুঝতে পারে না যে, সেটা একটা প্রাণী কিংবা মৃত ঘাস। ছোট ছোট মাছ ও জলপোকারা ঘুরতে ঘুরতে নিশ্চিন্ত মনে তার নিকটস্থ হওয়া মাত্রই চোখের নিমেষে কোন একটাকে ধরে ফেলে। এরা উভচর প্রাণী, তবে দিনের আলোতে ডাঙায় থাকতে চায় না। ডাঙায় ছেড়ে দিলেই শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে মনে করে হাত-পা লম্বালম্বিভাবে প্রসারিত করে ঠিক মৃতের

মত পড়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরেই উঠে মাকড়সার মত লম্বা লম্বা পা ফেলে জলের দিকে পালাবার চেষ্টা করে। আমাদের দেশে গাছপালার উপরেও কয়েক প্রকার কাঠিপোকা দেখা যায়। এরা সম্পূর্ণরূপে স্থলচর। কিন্তু এদের শিকার ধরবার ও আত্মরক্ষা করবার কৌশল সম্পূর্ণ জল-কাঠির মত।

আমাদের দেশের খাল-বিল-ডোবা প্রভৃতি জলাশয়ের ধারে ছোট ছোট ঝোপের মধ্যে এক রকম কাঠি-মাকড়সা দেখতে পাওয়া যায়। ওরা শয়ানভাবে জাল পেতে শত্রুর দৃষ্টি এড়াবার জন্যে অথবা শিকারকে ধোঁকা দেবার জন্যে পাগুলিকে উভয় দিকে একত্রিত ভাবে প্রসারিত করে ঠিক একটি কাঠির মত জালের সূতা অথবা পাতার গায়ে লেগে থাকে। জানা না থাকলে কিছুতেই বুঝবার উপায় নাই যে, সেটা একটা কাঠি কিংবা মাকড়সা। শিকার জালে পড়বামাত্র হাত-পা ছড়িয়ে ছুটে গিয়ে তাকে আক্রমণ করে। শিকারকে আয়ত্ত করে আবার ঠিক পূর্বের মত পা ছড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে ধীরে ধীরে তাকে উদরস্থ করতে থাকে।

আমাদের দেশে গাঁদা, ডালিয়া, সূর্যমুখী প্রভৃতি ফুলের পাপড়ির মধ্যে সাদা, হলুদ বা সবুজাভ এক প্রকার সুদৃশ্য মাকড়সা দেখতে পাওয়া যায়। এদের চালচলন কতকটা কাঁকড়ার মত বলে এগুলিকে কাঁকড়া-মাকড়সা বলা হয়। ফুলের রং অনুযায়ী এদের দেহের রঙেরও পার্থক্য দেখা যায়। ছোট ছোট পাখী ও কুমোরে-পোকারা এদের পরম শত্রু। সর্বদাই একস্থানে চুপ করে বসে থাকে বলে এবং ফুলের রঙের সঙ্গে দেহের রং মিলে যাওয়ায় শত্রুরা এদের সহজে খুঁজে বের করতে পারে না। তাছাড়া এরূপ লুকোচুরির ফলে নিরীহ পোকামাকড়েরা মধুর লোভে নির্ভাবনায় ফুলের উপর উপবেশন করা মাত্রই এদের কবলে পতিত হয়। এদের জীবনযাত্রা প্রণালী পর্যবেক্ষণ করবার সময় বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিকারের আশায় একই স্থানে নিশ্চল ভাবে বসে রয়েছে। কীট-পতঙ্গ ফলের উপর বসবামাত্রই চোখের নিমেষে তাকে ধরে ফেলবে। শিকার অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হলে ধরা পড়েও সময় সময় উড়ে পালায়। শিকার পলায়ন করবার সময় হয়তো সম্মুখের পা দুটি ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় ঠিক সেই

ভাবেই ঊর্ধ্বপদ হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেবে ; একটু নড়ে বসে পা দু-খানাকে স্বস্থানে গুটিয়ে রাখবে না।

পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতের হাজার হাজার মাকড়সা দেখা যায়। এদের মধ্যে কতকগুলি জাতের অনুকরণ-শক্তির কথা শুনলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। এ পর্যন্ত কলকাতা ও তার আশেপাশে বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ছাব্বিশ রকমের বিভিন্ন আকৃতির অনুকরণকারী পিঁপড়ে-মাকড়সা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি। আমার মনে হয় যত রকমের পিঁপড়েই আমরা দেখতে পাই, তাদের প্রায় প্রতেকেরই অনুকরণকারী পিঁপড়ে-মাকড়সার অস্তিত্ব রয়েছে। আমাদের দেশীয় দুর্ধর্ষ নালসো বা লাল-পিঁপড়েকে অন্ততঃ তিন জাতের বিভিন্ন মাকড়সা অনুকরণ করে থাকে। এদের মধ্যে দু-জাতের মাকড়সা লাল-পিঁপড়ে শিকার করে জীবন ধারণ করে। পিঁপড়ে ধরবার জন্যেই ঐ দুই জাতের অনুকরণকারী মাকড়সা এই কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। ডেঁয়ো পিঁপড়ের অনুকরণকারী তিন-চার জাতের মাকড়সাকে কলকাতা ও তার আশেপাশে বিচরণ করতে দেখা যায়। শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই এদের অনেকে এই অনুকরণবৃত্তির আশ্রয় নিয়েছে। কেবল এক জাতের মাকড়সা এই অনুকরণ-ক্ষমতাকে দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়েছে। এরা প্রধানতঃ ডেঁয়ো পিঁপড়ে শিকার করেই জীবনধারণ করে। ডেঁয়ো পিঁপড়েরা নিজেদের সঙ্গী বলে ভুল করে এদের কাছে এলেই তারা তিন-চার জনে মিলে তাকে কাবু করে ফেলে।

লঙ্কা দ্বীপে নাকি পাতার মত ডানাওয়ালা এক প্রকার গঙ্গাফড়িংও দেখা যায়। এদের ডানা দেখতে ঠিক চওড়া একটা পাতার মত শিরতোলা। শিকার অন্বেষণে এরা পাতার উপরই বিচরণ করে এবং প্রায়ই শিকারের প্রতীক্ষায় এক স্থানে চুপ করে বসে থাকে। কীট-পতঙ্গেরা এদের পাতা মনে করে নিকটস্থ হলেই আর রক্ষা নেই। সাঁড়াশীর মত সম্মুখস্থ একজোড়া দাড়ার সাহায্যে তাকে চেপে ধরে। পাখীরা এদের স্বাভাবিক শত্রু। কিন্তু প্রায়ই তারা এদের পাতা মনে করে প্রতারিত হয়ে থাকে। দক্ষিণ ভারতের গঞ্জিলাস নামক এক প্রকার গঙ্গাফড়িঙের কথা শোনা যায়। এই গঙ্গাফড়িঙের

আকৃতি অতি অদ্ভুত। দেখতে ঠিক এক-একটি অর্কিড ফুলের মত। যেমন রং তেমনই গঠন—পাতার গায়ে পিছনের পা আটকে মুখ নীচু করে ঝুলে থাকে। ফুল মনে করে ছোট ছোট কীট-পতঙ্গেরা নিকটে আসামাত্রই ধরে খেয়ে ফেলে। ফুল মনে করে পাখীরাও এদের আক্রমণ করে না।

শুষ্ক ডাল অথবা লতাপাতার গায়ে আর এক প্রকার অদ্ভুত গঙ্গাফড়িং দেখতে পাওয়া যায়। শিকারান্বেষণে যখন সরু সরু ডালের গাত্রসংলগ্ন হয়ে অবস্থান করে তখন সেগুলিকে শুষ্ক তৃণখণ্ড ছাড়া আর কিছুই মনে করা যায় না। এদের এই অদ্ভুত আকৃতিতে প্রতারিত হয়ে ছোট ছোট কীট-পতঙ্গেরা নিকটে উপস্থিত হলেই এদের দ্বারা অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে জীবন শেষ করে।

## কীট-পতঙ্গের শিল্পনৈপুণ্য

শিবপুরের বাগানে একবার প্রজাপতি ও পোকামাকড় সংগ্রহ করছিলাম। প্রকাণ্ড একটা গাছের নীচে অনেকটা জায়গা বড় বড় দুর্বাঘাসে ছেয়ে গেছে। তার মধ্যে কয়েক রকমের পিঁপড়ে-মাকড়সার আনাগোনা দেখে ক্লোরোফর্ম-গ্যাস প্রয়োগে অসাড় করে সেগুলিকে ধরবার চেষ্টা করছিলাম। প্রায় ২০।২৫ গজ দূরে সহসা একটা মাঝারিগোছের গাছের দিকে নজর পড়তেই অদ্ভুত রকমের ফুল দেখে কয়েকটা ফুল সংগ্রহ করবার জন্যে গাছটার দিকে অগ্রসর হলাম। গাছের কাণ্ডটা প্রায় দশ-বারো ফুট লম্বা হবে। কাণ্ডের বেড়টাও ১৬।১৭ ইঞ্চির বেশী নয়। কাণ্ডটার গায়ে কোনও ডালপালা নেই। কেবল মাথার উপরিভাগে পত্র-পল্লবগুলি ছত্রাকারে বিস্তৃত হয়ে আছে। গাছটার কাছে গিয়ে দেখলাম কাণ্ডটার চার দিকেই বাদামী রঙের বড় বড় কাঁটায় ভর্তি। কাঁটাগুলি দেখে গাছটার আত্মরক্ষার অপূর্ব কৌশলের কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ মনে হলো, একটা কাঁটা যেন একটু নড়ে উঠলো। বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। কাঁটাটাকে নড়তে দেখলাম কেন? তবে কি চোখের ভুল? বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করতেই নজরে পড়লো একটা কাঁটাই নয়, এখানে-সেখানে অনেক কাঁটাই মাঝে মাঝে নড়ে উঠছে। একটা কাঁটা ধরে টানতেই অতি সহজেই গাছের গা থেকে উঠে আসলো—যেন নরম আঠা দিয়ে আলতোভাবে সংলগ্ন ছিল। কাঁটাটা তুলার মত নরম এবং ফাঁপা। ধারালো ব্লেড দিয়ে একটা কাঁটা চিরে

ফেলতেই ভিতর থেকে সরু এবং লম্বা একটা পোকা বেরিয়ে পড়লো। পোকাটার মুখের দিকটা গাঢ় খয়েরী রঙের, কিন্তু শরীরটার রং হালকা বাদামী। কাঁটার মত পদার্থটা যে, পোকাটার বাসা বা বহিরাবরণ মাত্র সেটা সহজেই বোঝা গেল।

দিন কয়েক বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখা গেল—এই পোকাগুলি মুখ থেকে সূক্ষ্ম সুতা বের করে তার সাহায্যে গাছের ছালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ একত্রে জুড়ে কাঁটার মত বাসার কাঠামো নির্মাণ করে। অবশেষে গাছের গা থেকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লাল্‌চে রঙের টুক্‌রা সংগ্রহ করে কাঠামোর গায়ে রঙের প্রলেপের মত সর্বত্র সমভাবে এঁটে দেয়। কাজেই স্বাভাবিক কাঁটার সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে কোনও পার্থক্যই উপলব্ধি হয় না। ভিতরকার পোকাটা এই কাঁটার মত বাসাটাকে নিয়েই আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে থাকে। পোকাটার মুখের সম্মুখভাগে বাঁকানো সাঁড়াশীর মত দুটি ধারালো দাঁত আছে। এই দাঁতের সাহায্যেই এরা গাছের ছালের রসালো অংশ কুরে খায় এবং পরিত্যক্ত অংশটুকু দেহাবরণের গায়ে এঁটে দেয়, এবং ছাল কামড়ে ধরেই এরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে থাকে। নির্দিষ্ট এক জাতীয় গাছের সঙ্গে এই কাঁটা-পোকার সম্বন্ধ যেন পরস্পরের প্রতি সাহায্যমূলক। গাছের অনিষ্টকারী শত্রুরা কাঁটা-পোকাগুলিকে প্রকৃত কাঁটা মনে করে এর কাছে আসতে ভয় পায়। প্রতিদানে গাছগুলি যেন তাদের ছাল খেতে দিয়ে তাদের বাঁচিয়ে রাখে। যাহোক, খেতে খেতে পোকাটা পূর্ণবয়স্ক হবার পর বাসাটাকে এক স্থানে দৃঢ়ভাবে আট্‌কে রেখে তার মধ্যেই পুত্তলীতে রূপান্তরিত হয়। কিছুকাল পুত্তলী অবস্থায় নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকবার পর এক প্রকার ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গের রূপ ধারণ করে গুটি কেটে বের হয়ে যায়। যাযাবর মানুষের মত ঘরবাড়ী সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়—কাঁটা-পোকার মত এরূপ অসংখ্য রকমারি পোকা আমাদের দেশে দেখা যায়। এরাসাধারণতঃ ঝুড়ি-পোকা নামে পরিচিত। বিভিন্ন জাতীয় ঝুড়ি-পোকার বাসা নির্মাণের কৌশল এবং কারুকার্য দেখলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কীট-পতঙ্গের বাচ্চাগুলিই অপূর্ব

শিল্পকুশলতা এবং কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকে। পূর্ণবয়স্ক কীট-পতঙ্গেরা কিন্তু এ বিষয়ে তাদের তুলনায় সম্পূর্ণ অক্ষম।

শিল্প-চর্চায়, সৌন্দর্যসৃষ্টিতে মানুষ অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছে। মনুষ্যেতর প্রাণীরা সৌন্দর্যসৃষ্টি অথবা শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দেয় বটে, কিন্তু তা কেবল মানুষের দৃষ্টিতে রমণীয়; তাদের নিজেদের কোনও সৌন্দর্যবোধ আছে কিনা—সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ এদের শিল্পনৈপুণ্যের মধ্যে কোনও বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় না। বাসস্থল নির্মাণেই প্রধাণতঃ এদের কর্ম-কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীরা প্রত্যেকেই তাদের কোনও একটা সুনির্দিষ্ট পন্থায় তাদের আশ্রয়স্থল নির্মাণ অথবা তাতে নির্দিষ্ট কারুকার্য করে থাকে। এটা একটা স্বাভাবিক সংস্কারজাত ব্যাপার। মানুষের শিল্পনৈপুণ্য বা সৌন্দর্যসৃষ্টির কৃতিত্ব পৌনঃপুনিক অভ্যাসের দ্বারা অর্জন করতে হয়। কাজেই সকলে একই রকম কৃতিত্বের অধিকারী হয় না। কিন্তু মনুষ্যেতর প্রাণী-জগতে এর বিপরীত ঘটনাই দেখা যায়। স্বাভাবিক সংস্কারবশে প্রত্যেকেই তারা একই রকমের শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে থাকে। সৌন্দর্যবোধের কথা বাদ দিলেও প্রয়োজনের তাগিদে মনুষ্যেতর প্রাণী, বিশেষতঃ কীট-পতঙ্গজাতীয় প্রাণীরা যেরূপ শিল্প-দক্ষতার পরিচয় দেয়—বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখলে তাতে বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না।

দৈহিক গঠনের বিষয়ে বিবেচনা করলে জীব-জগতে মানুষের পরেই বানর জাতীয় প্রাণীদের স্থান নির্দেশ করতে হয়। এদের মধ্যে শিম্পাঞ্জি, ওরাং-উটান প্রভৃতিকে মানুষের নিকটতম জ্ঞাতি বলা যেতে পারে। হস্তপদ-বিশিষ্ট এই প্রাণীরা বৃক্ষের উপরিভাগে বাসস্থল নির্মাণ করে থাকে। কিন্তু তাতে না আছে কোন সৌন্দর্য, না আছে কোন কৌশল। সাধারণ একটা কাক-চিলের বাসাতেও যে নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়, এতে তাও নেই। কতকগুলি ডালপালা একত্রিত করে কোনও রকমে বসবার অথবা শোবার স্থান করে নেয় মাত্র। তাদের চেয়ে অনেক নিম্নপর্যায়ের প্রাণী মেঠো-ইঁদুর যেরূপ বাসস্থল নির্মাণ করে, তা অনেকাংশেই উন্নত। এরা সুবিন্যস্তভাবে চতুর্দিক বন্ধ করে গোলাকার বাসা নির্মাণ করে এবং ভিতরে যাতায়াত করবার

একটি মাত্র পথ রাখে। ভিতরে তুলা বা অন্য কোনও কোমল পদার্থের আস্তরণ দিয়ে দেয়। বিভার জাতীয় প্রাণীদের বাসস্থল নির্মাণের কৌশল দেখবার মত। কিন্তু বিভিন্ন জাতীয় পাখীরা বাসা নির্মাণে যেরূপ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দেয়, তার সঙ্গে উপরিউক্ত প্রাণীদের বাসার কোনও তুলনাই চলে না। বাবুই পাখীর বাসা অনেকেই দেখে থাকবেন। বাসাগুলির সৌন্দর্য এবং নির্মাণ-কৌশল দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। টুনটুনি পাখী অতি ক্ষুদ্র হলেও সূঁচের মত ঠোঁটের সাহায্যে অতি নিপুণভাবে পাতা সেলাই করে বাসা নির্মাণ করে। পাতা মুড়ে সেলাই করবার কায়দা দেখলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। মিজল্‌টো নামক পাখীরা তুলা বা পশম সংগ্রহ করে তার সাহায্যে অপূর্ব বাসা নির্মাণ করে থাকে। তুলা বা পশম সংগ্রহ করতে না পারলে গাছের ছাল থেকে সূক্ষ্ম তন্তু সংগ্রহ করে তার সাহায্যে বাসা নির্মাণ করে। বাইরে থেকে দেখে বাসাটাকে অপল্‌কা মনে হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে খুবই দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন। অস্ট্রেলিয়ার ফ্যানটেল নামক পাখীর বাসার নির্মাণ-কৌশল এবং গঠনসৌকর্যে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। ব্ল্যাক-বার্ড নামক পাখীর বাসার অনাড়ম্বর সৌন্দর্যেও মুগ্ধ হতে হয়। কিন্তু এরা সকলেই অভিব্যক্তির ধাপে অপেক্ষাকৃত উন্নত পর্যায়ের প্রাণী। নিম্নশ্রেণীর কীট-পতঙ্গের বিষয়-আলোচনা করলেই দেখা যাবে—সৌন্দর্যসৃষ্টিতে এবং শিল্পনৈপুণ্যে এরা উন্নত শ্রেণীর প্রাণীকে বহুদূর অতিক্রম করে গেছে। মাকড়সার কথাই ধরা যাক। এই ক্ষুদ্রকায় প্রাণীরা কিরূপ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অপূর্ব কৌশলে এক-একখানি নিখুঁত জাল নির্মাণ করে তোলে তা সকলেই লক্ষ্য করেছেন। মাকড়সার জালের কার্য-কারিতাও যেমন অদ্ভুত—গঠন-সৌন্দর্যও এর তেমনি অপূর্ব। তাছাড়া কয়েক জাতীয় মাকড়সা চতুর্দিকে সূতা ছড়িয়ে মধ্যস্থলে গর্তের মত করে ফাঁদ পেতে রাখে—তার গঠনকৌশল এবং কারুকার্যও কম বিস্ময়কর নয়। বোল্‌তা, মৌমাছি, ভীমরুল প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গ কর্তৃক নির্মিত চাক পরম বিস্ময়ের বস্তু। ভ্রমরের বাসা দেখলেও বিস্মিত হতে হয়। ভ্রমরেরা বাসা প্রস্তুত করবার পূর্বে প্রথমতঃ লম্বা গর্তযুক্ত অথবা ফাঁপা কোনও পুরাতন কাষ্ঠখণ্ড

নির্বাচন করে সবুজ পাতার অন্বেষণে বহির্গত হয়। সাধারণতঃ গোলাপ বা ওই রকমের কোন গাছের পাতা ঈষৎ গোলাকারে কেটে নিয়ে আসে এবং চুরুটের মধ্যে তামাকের পাতা যেভাবে সাজানো থাকে অনেকটা সেভাবে পাতাগুলিকে পরপর সাজিয়ে ছোট একটা চুরুটের মতই বাসা নির্মাণ করে। পাতার ভাঁজের মধ্যস্থলে ডিম পেড়ে তার মধ্যে বাচ্চার আহারের ব্যবস্থাও করে রাখে। এক-একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে পরপর সাজিয়ে আট-দশটা পাতার গুটি রেখে দেয়। প্রত্যেকটি গুটির অভ্যন্তরেই এক-একটা করে ডিম থাকে।

থুথু-পোকা নামে আমাদের দেশের বনে-জঙ্গলে এক-প্রকার ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গ দেখা যায়। এদের বাচ্চাগুলি অদ্ভুত উপায়ে শরীর থেকে বুদবুদের মত প্রচুর পরিমাণ থুথু বের করে তার অভ্যন্তরে আত্মগোপন করে বসে থাকে। এই থুথুর আবরণই তাদের বাসা। এর গঠন-প্রণালীরও একটা বিশিষ্ট রূপ আছে।

গুবরে পোকার মত এক প্রকার ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গের বাচ্চাগুলি যেরূপ আশ্চর্য কৌশলে এবং অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে বাসা নির্মাণ করে তার মধ্যে নিরুদ্বেগে বসবাস করে, তা দেখলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। পাঁচ-ছয় ইঞ্চি লম্বা পাতাকে এরা কেবল মুখের সাহায্যে মুড়ে সুতা দিয়ে সুসংবদ্ধভাবে জুড়ে দেয়। এই পোকাদের বাসা দেখে অনেক সময় টুনটুনি পাখীর বাসা বলে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। বড় একটা কচুপাতাকে আগাগোড়া মুড়ে ঠিক একটা লম্বা নলের মত গড়ে তোলে, প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা সাধারণ একটা ক্যাটারপিলার একাই এরূপ অসাধ্যসাধন করে থাকে। ক্যাডিস-ফ্লাই নামে আমাদের দেশে অনেক জাতীয় ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গ দেখা যায়। এদের বাচ্চাগুলি জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের বাসা তৈরী করে। এক-একটা বাসা দেখলে মনে হয় যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর, ইটের কুচি সাজিয়ে কেউ যেন ছোট ছোট নল তৈরী করে রেখেছে। এক-জাতীয় ক্যাডিস-ফ্লাই-বাচ্চারা কুল গাছের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডালে দলবদ্ধভাবে বাসা নির্মাণ করে। বাসাগুলি দেখতে ঠিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শামুকের মত কুণ্ডলী পাকানো।

এতক্ষণ যে সব কীট-পতঙ্গের শিল্পনৈপুণ্যের কথা বললাম তারা সকলেই নির্দিষ্ট স্থানে বাসগৃহ তৈরী করে বসবাস করে। কিন্তু পূর্বোক্ত যাযাবর প্রকৃতির পোকারা বাসগৃহ সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা করলেও সেগুলি নির্মাণে অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে থাকে। যে কোনও বাগানে গোলাপ, করমচা অথবা ঐ ধরণের অন্যান্য গাছের প্রতি একটু মনোযোগ দিয়ে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যাবে যে, তাদের ডালপালা বা পাতার সঙ্গে কালো রঙের দুলের মত এখানে-সেখানে এক একটি অদ্ভুত পদার্থ ঝুলছে। প্রথম দৃষ্টিতে এগুলিকে ময়লা বা ঝুল বলেই মনে হবে। কিন্তু একটিকে তুলে এনে পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে—লম্বা গোলাকার ঝুলের মত পদার্থটির চতুর্দিকে এক ইঞ্চি ও দেড় ইঞ্চি লম্বা কতকগুলি শুকনো কাঠি যেন শক্ত আঠা দিয়ে বাসাটার গায়ের উপর এঁটে দেওয়া হয়েছে। সহজে কাঠিগুলিকে টেনে বের করা যায় না। কাঠিগুলি তুলে ফেললেই তুলার মত কোমল পদার্থে নির্মিত একটি নল দেখা যাবে। তুলার আবরণ ছিঁড়ে দেখলেই তার মধ্য থেকে প্রায় তিন-চার ইঞ্চি লম্বা একটি পোকা বেরিয়ে পড়বে। এই পোকাটি এক জাতীয় ক্ষুদ্রকায় মথের বাচ্চা। এরা গাছের ছাল ও পাতা খেয়ে থাকে এবং শত্রুর দৃষ্টি এড়াবার জন্যে শরীরের চতুর্দিকে আবরণ নির্মাণ করে তার উপর ছোট ছোট ডালপালার টুক্‌রা কেটে এনে বসিয়ে দেয়। বাসার মুখটা থাকে উপরের দিকে। পোকাটা মুখ বাড়িয়ে ধারালো দাঁতের সাহায্যে ডালপালা কামড়ে ধরে ঝুলতে ঝুলতেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে থাকে। বিশ্রাম করবার সময় বাসার মুখের কাছে সঞ্চিত আল্‌গা সুতার সাহায্যে বোঁটার মত করে বাসাটাকে দৃঢ়ভাবে ঝুলিয়ে রাখে। পোকাটা ভিতরে আত্মগোপন করে থাকে। ছোট ছোট পাখীরা এদের পরম শত্রু। দেখতে পেলেই তৎক্ষণাৎ ধরে গলাধঃকরণ করে। কিন্তু এই দুর্ভেদ্য আবরণের মধ্যে তারা যেমন নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করতে পারে তেমনই আবার শত্রুর দৃষ্টিবিভ্রমও ঘটিয়ে আত্মরক্ষা করে। পোকাটা যথেষ্ট বড় হবার পর ঝুলানো বাসার মধ্যেই পুত্তলীতে রূপান্তরিত হয় এবং উপযুক্ত সময়ে মথের রূপ ধারণ করে গুটি কেটে বের হয়ে যায়।

ঘাস-পাতা, লতা-গুল্মের মধ্যে ইঞ্চিখানেক লম্বা এক প্রকার ঝুড়ি-বাসা দেখতে পাওয়া যায়। এরা দুর্বা-ঘাসের ছোট ছোট টুক্‌রা সংগ্রহ করে স্তরে স্তরে এমনভাবে বাসার উপরিভাগে সাজিয়ে দেয় দেখলে মনে হয় যেন কোনও নিপুণ কারিগর সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে সুদৃশ্য নক্‌শা অঙ্কিত করে রেখেছে। সুতার মত সরু ও লম্বাটে ধরণের পোকাটা সেই বাসাটাকে সঙ্গে নিয়ে খাদ্যান্বেষণে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে থাকে। আত্মগোপনের কৌশল এদের এমনই নিখুঁত যে, পশুপক্ষী তো দূরের কথা, সাবধানী চোখও এদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে থাকে। সুপারীগাছের কাণ্ডে প্রায় সর্বত্রই সবুজ রঙের গোল দাগের মত শ্যাওলা জাতীয় এক প্রকার পদার্থ জন্মাতে দেখা যায়। এই সকল সুপারীগাছের গায়ে সবুজ শ্যাওলার সাহায্যে গঠিত অবিন্যস্ত ডালপালাসমন্বিত এক প্রকার অদ্ভুত ক্ষুদ্রকায় পদার্থকে নড়ে-চড়ে বেড়াতে দেখা যায়। প্রথমে মনে হবে—কোনও রকমে হয়তো শ্যাওলার টুক্‌রাগুলি জমাট বেঁধে ঐরূপ একটা আকৃতি তৈরী করেছে। কিন্তু একটাকে হাতে তুলে ছিঁড়ে ফেললেই দেখা যাবে—ঐ অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট শ্যাওলার মধ্যে সুতার মত সূক্ষ্ম লম্বাটে একটা পোকা রয়েছে। শত্রুর চোখে ধূলি নিক্ষেপ করবার উদ্দেশ্যেই সে ঐরূপ বাসা নির্মাণ করে থাকে। ঐ বাসা নিয়ে পোকাটা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়।

আমাদের দেশে ঘরের বেড়া অথবা দেয়ালের গায়ে চিঁড়ে-পোকা নামে এক প্রকার অদ্ভুত পোকা বোধ হয় সকলেই দেখেছেন। ছোট, বড় এবং অন্যান্য রকমারি প্রায় পাঁচ-ছয়টি বিভিন্ন জাতীয় চিঁড়ে-পোকা দেখতে পাওয়া যায়। এরাও ঝুড়ি-পোকারই গোষ্ঠীভুক্ত। পোকাটার বাসা দেখতে ঠিক চ্যাপ্টা একটা চিঁড়ের মত। দেয়ালের গায়ে অনবরত এগুলিকে থেমে থেমে চলতে দেখা যায়। চিঁড়ে-পোকার বাসার একটা বিশেষত্ব এই যে, অন্যান্য পোকার বাসার মত এদের বাসার একটা দরজা থাকে না। যাতায়াত করবার জন্যে দু-দিকে দুটি মুখ রেখে দেয়। দরকারমত যে কোনও দিক থেকেই বাসাটাকে ব্যবহার করতে পারে। চলতে চলতে সম্মুখের দিকে বাধা পেলে তৎক্ষণাৎ অপর দিকের মুখ কাজে লাগিয়ে থাকে। এক মুখ বন্ধ করে দিলে

সে অপর দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কাজ করতে থাকে। নলখাগড়া বা বাঁশের বেড়ার গায়ে অপর এক জাতীয় ঝুড়ি-পোকা দেখতে পাওয়া যায় যারা সাধারণতঃ ছোলা-পোকা নামে পরিচিত। ছোলা-পোকা দেখতেও ঠিক একটি আস্ত ছোলার মত। ছোলার মত আবরণটার অভ্যন্তরে একটা সরু নলের মধ্যে পোকাটা আত্মগোপন করে থাকে। বেড়ার গায়ে যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক শ্যাওলা জাতীয় পদার্থ জন্মে এরা সেগুলিকে কুরে কুরে খায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, এরা পূর্বোক্ত কাঁটা-পোকারই নিকটতম জ্ঞাতি। এই জাতীয় পোকাগুলি সকলেই পরিণত বয়সে মথজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গে রূপান্তরিত হয়। কয়েক জাতের ঝুড়ি-পোকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালকের টুক্‌রা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁশ অথবা ডিমের খোলা সংগ্রহ করে সেগুলিকে এলোমেলো ভাবে আটকে দিয়ে বাসা নির্মাণ করে এবং আবর্জনার মত সেই বাসাটাকে নিয়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়। শত্রুর দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাবার এটি একটি প্রকৃষ্ট উপায়। আমাদের দেশে আবর্জনার মত বাসা নির্মাণকারী যে সব ঝুড়ি-পোকা দেখা যায়, বাসা নির্মাণে এদের আত্মরক্ষার নিখুঁৎ কৌশল দেখে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়।

জলের মধ্যে বিচরণকারী বিভিন্ন জাতীয় ঝুড়ি-পোকারও অভাব নেই। জলের মধ্যে ভাসমান পাতি-শালুকের পাতাগুলি একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে—পাতাগুলির অনেক স্থানই কোনও পোকায় যেন অর্ধবৃত্তাকারে কেটে নিয়ে গেছে। আরও একটু অনুসন্ধান করলেই এই অর্ধবৃত্তাকার দুটি পত্র-খণ্ডকে দু-ভাঁজে একত্রিত অবস্থায় জলের উপর ইতস্ততঃ চলে বেড়াতে দেখা যায়। এটি এক প্রকার ঝুড়ি-পোকার কাণ্ড। পোকাটা দেখতে চ্যাপ্টা এবং অনেকটা শোঁয়াপোকার মত। মুখের ধারালো চোয়ালের সাহায্যে এক টুক্‌রা পাতা কেটে সেটাকে জলে ভাসিয়ে অন্য একটা পাতার উপর নিয়ে আসে এবং এক প্রকার আঠালো পদার্থের সাহায্যে জুড়ে দেয়, পরে নীচের পাতাটাকে ঐ মাপে কেটে নেয়। তখন ভেলার মত জলে ভাসতে থাকে। পোকাটা উভয় পাতার মধ্যস্থলে অবস্থান করে এবং সাঁতার কাটবার মত বাসাটাকে

নিয়েই খাদ্যান্বেষণে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে। কিছুকাল পরে বাসার অভ্যন্তরে সাদা গুটি প্রস্তুত করে পুত্তলীতে পরিণত হয় এবং যথাসময়ে ক্ষুদ্র পতঙ্গরূপ ধারণ করে উড়ে যায়।

এস্থলে অল্প কয়েক রকম ঝুড়ি-পোকার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে ঝোপঝাড় বা ছোট ছোট গাছপালার মধ্যে এক ধরণের পোকাদের বাণ্ডিল বাঁধা শুক্‌নো কাঠির বাসা বুনতে দেখা যায়। ছোট ছোট গাছপালার সরু ডালগুলিকে ইঞ্চিখানেকেরও কিছু বেশী করে কেটে নিয়ে সুতা দিয়ে পেন্সিলের মত মোটা বাসা তৈরী করে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখে এবং প্রয়োজনমত মুখ বের করে ডাল কাম্‌ড়ে ধরে ইতস্ততঃ যাতায়াত করে। পোকাগুলিকে দেখা যায় না, কেবল বাসাটাকেই একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করতে দেখা যায়। এরা বাগানের গোলাপ ও অন্যান্য গাছের ভয়ানক অনিষ্ট করে থাকে। গাছের পাতা খেয়ে বড় হয়ে পুত্তলী রূপ ধারণ করে এবং যথা সময়ে খোলস বদ্‌লে পতঙ্গরূপ ধারণ করে উড়ে যায়। এই ধরণের আর এক প্রকার অপেক্ষাকৃত ছোট ঝুড়ি-পোকা ঘাস পাতার মধ্যে দেখা যায়। এরা ঘাসের ছোট ছোট পাতা দিয়ে অতি সুদৃশ্য বাসা তৈরী করে সেই বাসা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এদেরও বাসা নির্মাণের শিল্প-নৈপুণ্য দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

## গঙ্গাফড়িং

কীট-পতঙ্গাদি নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে গঙ্গাফড়িং-এর মত এমন চালচলন ও অদ্ভুত অঙ্গসঞ্চালনক্ষম পতঙ্গ সহসা বড় একটা নজরে পড়ে না। সাধারণ কীট-পতঙ্গশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হলেও এরা অভিব্যক্তির কোন্ ধারায় এবং কিরূপ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এরূপ আকৃতি ও প্রকৃতি আয়ত্ত করে নিয়েছে তার ইতিহাস বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নেই। জীবজগতের ক্রমবিকাশের ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আনুবীক্ষণিক আদি জীবেরা কেবল আহার-বিহারেই ব্যাপৃত থাকে। শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হবার আশঙ্কায় পূর্বাহ্নে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা তেমন কিছু দেখা যায় না। শত্রুর আক্রমণ স্পর্শেন্দ্রিয়-গোচর হলে শরীর সঙ্কুচিত করে প্রাণরক্ষার চেষ্টা করে মাত্র। দর্শনেন্দ্রিয়ের অভাবই এর প্রধান কারণ হতে পারে; কিন্তু সুনির্দিষ্ট দর্শনেন্দ্রিয়ের অভাব মনে হলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে দেখা যায় যে, এরা সর্বদাই আলো-আঁধারের তারতম্য অনুভব করে থাকে। তথাপি উন্নতশ্রেণীর কীটের মত এগুলিকে আত্মরক্ষার্থে তেমন সচেষ্ট দেখা যায় না। এদের শত্রুর সংখ্যা যে কম, তাও বলা চলে না। সমজাতীয় শত্রু কম হলেও অপেক্ষাকৃত উন্নতশ্রেণীর শত্রু অসংখ্য। তবে হয়তো এদের বংশবৃদ্ধির হার ও সহজ উপায় এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবের উদরে প্রবেশ করেও সময়ে সময়ে বংশবৃদ্ধি করবার ক্ষমতা এই ত্রুটির পরিপূরক হয়েছে। তারপর প্রোটোজোয়া প্রভৃতি আর এক ধাপ উন্নত স্তরের জীবের বেলায়ও দেখতে পাওয়া যায় যে, প্রকৃত-

প্রস্তাবে আক্রান্ত না হলে তারাও প্রতিক্রিয়ার কোনও লক্ষণই প্রকাশ করে না ; কিন্তু আক্রান্ত হলে এক দিকে ছুটে পালাতে চেষ্টা করে। বিপদ এড়াবার জন্য পূর্বাহ্নে স্থান ত্যাগ বা সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে শত্রুর গতিবিধি টের পেয়ে, আক্রান্ত হবার পূর্বেই সাবধান হবার উপায় অবলম্বন করবার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এতদূর উন্নত হলেও কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি অমেরুদণ্ডী প্রাণী কোনও কোনও বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষের পরিচয় দিলেও এদের শরীর ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি এমনভাবে গঠিত যে সম্মুখ দিকের বিপদ-আপদ বা শত্রুর গতি-বিধি লক্ষ্য করে পূর্বাহ্নে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে ; কিন্তু পিছনে বা আশেপাশের অবস্থা তদারক করবার ক্ষমতা খুবই কম। কারণ কীট-পতঙ্গাদির চোখ বিভিন্নভাবে গঠিত হলেও ইচ্ছামত ঘাড় বা মাথা ঘুরিয়েফিরিয়ে চার দিকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবার শক্তি নেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সাধারণ কীট-পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত হলেও গঙ্গাফড়িং, মনুষ্য প্রভৃতি সর্বোন্নত প্রাণীদের মত মাথা ও ঘাড় ঘুরিয়েফিরিয়ে এমন কি গলা বাড়িয়ে ও হেলিয়ে চতুর্দিকের অবস্থা তদারক করবার কৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছে। দূর থেকে আব্‌ছা গোছের কিছু একটা দেখতে পেলে যুক্তকরে প্রার্থনারত মানুষের মত সম্মুখের পায়ের মত দাড়া দুটি প্রসারিত করে মাথা উঁচু করে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। বস্তুটা কি, সম্যক উপলব্ধি করতে না পারলে—লম্বা কাঠির মত গলাটি হেলিয়ে-দুলিয়ে এদিক-ওদিক বেশ করে দেখবার চেষ্টা করে ; কিন্তু পরিষ্কার ভাবে না বুঝে সহসা কাছে ঘেঁষে না। এতেও সুবিধা না হলে মাথাটি ঘুরিয়েফিরিয়ে চারদিকের অবস্থা বিশেষভাবে তদন্ত করে। জিরাফের লম্বা গলা যেমন বহু দূর থেকে কোনও নির্দিষ্ট স্থানের অবস্থা লক্ষ্য করবার সহায়তা করে, এদেরও ঠিক তেমনি ব্যবস্থা আছে। সমস্ত শরীরের প্রায় অর্ধেক লম্বা, কাঠির মত গলা উঁচু করে এরা জিরাফের মতই দূর থেকে শিকার অথবা শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে। তখন এদের দেখে মনে এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হয়—নিম্নশ্রেণীর পতঙ্গজাতীয় প্রাণী বলে কিছুতেই ধারণা করতে প্রবৃত্তি হয় না।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বিভিন্ন আকৃতির গঙ্গাফড়িং দেখা যায়।

সম্মুখের পা দুখানি অনবরত প্রার্থনারত মনুষ্যের যুক্ত হস্তের মত ভাঁজ করে রাখে বলে সাধারণতঃ এরা 'প্রার্থনারত ম্যান্টিস' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। এদেশে এরা গঙ্গাইলাস বা গঙ্গাফড়িং নামে পরিচিত। ফড়িং-এর সঙ্গে এদের দৈহিক আকৃতির অনেকটা সামঞ্জস্য থাকলেও গঙ্গাফড়িং নামের তাৎপর্য ঠিক বুঝা যায় না। পূর্ববঙ্গের কোনও কোনও অঞ্চলে এদের সাপের মাসী বলা হয় এবং সাধারণ পতঙ্গ থেকে ভিন্ন এদের অদ্ভুত চালচলনের জন্যে কতকটা ভীতির চোখে দেখে। সাপ যেমন ফণা তুলে এদিক-ওদিক দুলতে থাকে—এগুলিকেও ঠিক সেরূপই দেখায়। বোধ হয় এই কারণেই এরা সাপের মাসী আখ্যা পেয়েছে।

পৃথিবীতে এপর্যন্ত প্রায় আট শতের উপর বিভিন্ন জাতীয় গঙ্গাফড়িং দেখতে পাওয়া গেছে। আমাদের দেশেই প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ রকমের বিভিন্ন শ্রেণীর গঙ্গাফড়িং দেখা যায়। তার মধ্যে কচি কলাপাতার মত সবুজ রঙের গঙ্গাফড়িংই সমধিক পরিচিত। এই প্রসঙ্গে সবুজ গঙ্গাফড়িং-এর কথাই বলছি। এরা প্রায় আড়াই থেকে তিন ইঞ্চি লম্বা হয়। এদের দেহের আকৃতি অদ্ভুত ; অন্যান্য সাধারণ ফড়িং বা পতঙ্গের মত নয়। পেটের দিকে প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা। সরু কাঠির মত গলাটিও এক ইঞ্চি-দেড় ইঞ্চি লম্বা হয়। বড় বড় চোখওয়ালা ত্রিকোণাকার মস্তকটি যেন এই কাঠির মাথায় আলগাভাবে বসানো রয়েছে। মাথার উভয় পার্শ্বে শিঙের মত দুটি শুঁড় দেখা যায়। কাঠির অগ্রভাগে মস্তকের ঠিক নিম্নেই একজোড়া চ্যাপ্টা পা। এই পাজোড়া খুবই অদ্ভুত। উপরে-নীচে করাতের দাঁতের মত সারবন্দীভাবে অনেকগুলি কাঁটা সাজানো থাকে। এই পাজোড়া ঠিক সাঁড়াশীর মত করে হাতের কাজ করে। সর্বদাই পা দুখানি যুক্তভাবে প্রার্থনার ভঙ্গীতে অবস্থান করে। পেটের সম্মুখভাগে বাকী চারখানি পা। এদের গঠন সাধারণ কীট-পতঙ্গের পায়ের মত। প্রান্তভাগে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাঁকানো নখ আছে। এই চারখানা পায়ের সাহায্যেই এরা লতাপাতার উপর চলাফেরা করে। সম্মুখের পা দুখানির সাহায্যে শত্রুকে আক্রমণ, শিকার ধরা বা আহার্য গলাধঃকরণের কাজ করে থাকে। শিকার

একবার এই সাঁড়াশীর মত পায়ের কবলে পড়লে আর পালাবার উপায় থাকে না, তারপর শিকার মুখের কাছে নিয়ে ঠিক হনুমানের মত ভঙ্গীতে ধীরে ধীরে ভক্ষণ করে থাকে। এরা নানা জাতীয় ফড়িং, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি খেয়ে উজাড় করে ফেলে। কোন কোন দেশে এমন গঙ্গাফড়িংও দেখা যায়, যারা ছোট ছোট পাখী, ব্যাং, টিকটিকি প্রভৃতি ধরে খেয়ে থাকে। এদেশীয় সবুজ রঙের গঙ্গাফড়িংগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট স্বজাতীয়দের খেয়ে উদরপূরণ করে থাকে। স্ত্রী-গঙ্গাফড়িং সুবিধা পেলে পুরুষ-ফড়িংকে ধরে খেয়ে ফেলে। এরা সাধারণতঃ লতাপাতার মধ্যে শিকার অন্বেষণে হেঁটে বেড়ায়; প্রয়োজন বোধ করলে ডানা মেলে দূরতর স্থানে উড়ে যায়। এমনভাবে মিশে থাকে যে, শত্রু কিংবা শিকার কেউ এদের অস্তিত্ব টের পায় না। শিকার দেখতে পেলেই অতি সন্তর্পণে নিকটে এসে সম্মুখের সাঁড়াশী উঁচিয়ে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে এবং সুবিধামত আক্রমণ করে সাঁড়াশী দিয়ে চেপে ধরে ফেলে। এদেশীয় সবুজ রঙের গঙ্গাফড়িংগুলি শিকার ধরবার জন্যে সময়ে সময়ে অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করে থাকে। লতাপাতার বা পত্রপল্লবের উপর এমনভাবে বসে থাকে যেন এক জাতীয় ফুল বা কচিপাতার মত মনে হয়। মৃদু বাতাসে ফুল বা পাতাগুলি যেমন আস্তে আস্তে দোলে, এরাও সেরূপ গলা নেড়ে আস্তে আস্তে দোল খেতে থাকে—অন্যান্য কীট-পতঙ্গেরা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে ঐস্থানে অবতরণ করবা-মাত্রই গঙ্গাফড়িং-এর কবলে পড়ে প্রাণ হারায়। সাধারণতঃ গঙ্গাফড়িং-এর অনুকরণ শক্তি অত্যন্ত প্রবল এবং নিখুঁত। ব্রেজিল দেশীয় এক জাতীয় গঙ্গাফড়িং উই ধরে খায়। এজন্যে তারা উইয়ের চেহারার অনুকরণ করে থাকে। আমাদের দেশীয় সবুজ কালো ডোরাকাটা ও ধূসর রঙের গঙ্গা-ফড়িংকেও লতাপাতার মধ্যে থেকে চিনে বের করা দুষ্কর। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক জাতীয় গঙ্গাফড়িং হাতে ধরেও বুঝতে পারা যায় না যে এরা শুষ্ক পত্র, না জীবন্ত প্রাণী। এমনই এদের দেহের গঠন যে দেখলে অবাক হয়ে থাকতে হয়। দুই রকমের গঙ্গাফড়িংকে একই স্থানে ছেড়ে দিলে লড়াই বাধবার উপক্রম হয়ে থাকে। লড়াইয়ের ফলে একটিকে

অপরটির হাতে পড়ে প্রাণত্যাগ করতে হয়। আমাদের দেশে নালা, ডোবা ও পুকুরের মধ্যে অনেকটা গঙ্গাফড়িং-এর অনুরূপ ধূসর রঙের এক জাতীয় পতঙ্গ দেখা যায়। এদের মুখের সম্মুখে হাতের মত ভাঁজ করা দুখানি সাঁড়াশীও আছে; এর সাহায্যে তারা শিকার ধরে। এদের গঙ্গাফড়িং-এর মত ডানাও আছে—প্রয়োজনমত এক জলাশয় থেকে অন্য জলাশয়ে উড়ে যেতে পারে। শিকার ধরবার কৌশলও ঠিক গঙ্গাফড়িং-এর অনুরূপ। ঐগুলিকে অনেকে মেছো-গঙ্গাফড়িং বলে থাকে, কারণ মাছই এদের প্রধান শিকার।

স্ত্রী-গঙ্গাফড়িং সুপারীর মত একদিকে সূচলো একটি গুটির মধ্যে ডিম পেড়ে সেটিকে গাছের ডালে আটকে রাখে। এক-একটা গুটির মধ্যে ৩০ থেকে ৪০টা পর্যন্ত ডিম থাকে। সাধারণতঃ গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই ডিম ফুটে বাচ্চাগুলি গুটি থেকে বের হয়ে আসে। আকৃতি-প্রকৃতিতে বাচ্চাগুলিকে দেখতে পরিণত বয়স্কদের মতই; কিন্তু এদের ডানা থাকে না। আবদ্ধ স্থানে রেখে এদের ডিম ফুটিয়ে দেখেছি—দলবদ্ধভাবে এদের চালচলন ও গতিভঙ্গী অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। আলিপুরের পশুশালায় নীল-গলাওয়ালা সারসগুলির গতিভঙ্গী বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করেছেন; কেউ এক দিক দিয়ে অগ্রসর হলেই তারা সকলেই গলা বাড়িয়ে এক সঙ্গে এক দিকে সরে যায়। একটি যেমন করবে অপরগুলিও ঠিক গড্ডালিকা প্রবাহের মত সেরূপই করবে। এই গঙ্গাফড়িং-এর বাচ্চাগুলিও ঠিক সেরূপ—এক দিক দিয়ে একটু ভয় দেখালে বা কাল কিছু এগিয়ে দিলে সারসগুলির মত গলা বাড়িয়ে ও হেলেদুলে দলবদ্ধভাবে অপর দিকে ছুটে যায় এবং এক স্থানে জটলা করে মাথা ও লম্বা গলা ঘুরিয়েফিরিয়ে অতি অদ্ভুতভঙ্গীতে শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। সিনেমার ছবিতে আফ্রিকার জঙ্গলের জিরাফের দলকে যেরূপ ছুটতে দেখেছি—গঙ্গাফড়িং-এর বাচ্চাগুলির একযোগে পলায়নের দৃশ্য দেখতেও অনেকটা সেরূপ।

# পরিশিষ্ট

## গবেষক গোপালচন্দ্র

গোপালচন্দ্রের মৌলিক গবেষণা প্রধানতঃ মাকড়সা, পিঁপড়ে, প্রজাপতি, শোঁয়াপোকা, মাছ ও ব্যাঙাচি নিয়ে। আমাদের দেশের মাকড়সা যে মাছ, ব্যাঙাচি, চামচিকা, টিকটিকি, আরশোলা, কাঁকড়াবিছা, এমন কি ছোট সাপ ধরে খায়, তা গোপালচন্দ্রই প্রথমে লক্ষ্য করেন। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণাগারে স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরি করে তার মধ্যে তিনি মাকড়সা, পিঁপড়ে, প্রজাপতি প্রভৃতি প্রতিপালন করেই এদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। মাকড়সার যৌন-মিলন, যৌন-মিলনের পূর্বে স্ত্রী-মাকড়সার চার দিকে পুরুষ মাকড়সার ঘুরে ঘুরে নৃত্য, যৌন-মিলনের পরে পুরুষ মাকড়সার সর্বাঙ্গ স্ত্রী-মাকড়সা চিবিয়ে খেয়ে ফেলে, মাকড়সার ডিম পাড়া, ডিমের থলির প্রতি স্ত্রী-মাকড়সার মাতৃসুলভ আকর্ষণ, ডুবুরী-মাকড়সার জলের তলায় লুকানো ও আবার ১৫।২০ মিনিট পরে জলের উপর ভেসে ওঠা এবং এদের মাছ ধরে খাওয়া, মাকড়সার ঝগ্ড়াটে স্বভাব ও তাদের মারামারি এবং মারামারির ফলে অঙ্গহানি বা মৃত্যু, লাল ও কালো পিঁপড়ে-অনুকরণকারী মাকড়সার স্বভাব ও পিঁপড়ের দেহরস শোষণ করা, তাদের খোলসত্যাগ বা নির্মোচন (Moulting) এবং রূপান্তর প্রভৃতি মৌলিক তথ্যগুলি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। মৎস্যাহারী মাকড়সার বিশেষত্বগুলি প্রবন্ধাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের "ট্র্যানজ্যাকশনে"। তিনি ৪৬টি পিঁপড়ে-অনুকরণকারী মাকড়সার জীবনেতিহাস পর্যবেক্ষণ করেছেন। কয়েকটি নতুন প্রজাতিও আবিষ্কার করেছেন।

প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি থেকে দেখা যায় গোপালচন্দ্র প্রায় একই সঙ্গে মাকড়সা, পিঁপড়ে ও প্রজাপতি নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। পথে-ঘাটে যেখানেই তিনি যেতেন সব জায়গায় তাঁর তীক্ষ্ণ কৌতূহলী দৃষ্টি

পড়তো। পোকা-মাকড়েরা কোথায় কি করছে, কি খাচ্ছে প্রভৃতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। এই সব কীট-পতঙ্গের গতিবিধি অনুসরণ করতে করতে কখনও তিনি পৌঁছতেন কারও ঘরের জানলার ধারে, আবার কখনও পুকুর-ঘাটের নিকটে। তাঁর অন্য কোন খেয়াল থাকতো না, শুধু তাঁর মনপ্রাণ পড়ে থাকত ঐ ভাগ্যবান কীট-পতঙ্গের উপর। প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর গতিবিধি সন্দেহ করায় তাঁকে অনেক স্থানে নিগৃহীত হতে হয়েছিল। বিদ্রূপ, অপমান ও দৈহিক লাঞ্ছনা ভোগ করেও গোপালচন্দ্র কোন দিনই দমে যান নি। কৌতূহলী মানুষ তাঁর কৌতূহল নিবৃত্তি করার কত চেষ্টাই না করতেন! প্রজাপতির জীবনেতিহাস সম্বন্ধে তিনি অতি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। গাছের পাতায় প্রজাপতির ডিম থেকে শোঁয়াপোকায় পরিণত হওয়া, শোঁয়াপোকা থেকে কয়েকবার নির্মোচনের পর পূর্ণবয়স্ক সুন্দর প্রজাপতিতে রূপান্তর সত্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার। শোঁয়াপোকা কত কুৎসিৎ, দেখলেই যেন ভয় হয়। এই শোঁয়াপোকার সুন্দর প্রজাপতিতে পরিণত হওয়া হর্মোন দ্বারা কিরূপে প্রভাবান্বিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়, তা আজ জানা গেলেও চল্লিশ বছর পূর্বে অজানা ছিল। গোপালচন্দ্রের গবেষণা ও প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় এবং একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, মাকড়সা, পিঁপড়ে ও প্রজাপতির উপর মৌলিক তথ্যগুলি ভবিষ্যতে শারীরবিদ্‌দের ও প্রাণ-রসায়নবিদ্‌দের গবেষণার পথ বহু দিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তিনি শোঁয়াপোকার মৃত্যু-অভিযান যা নিরীক্ষণ করেছেন সেটা সত্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার। তাদের ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এক— খাদ্যান্বেষণ। গড্ডালিকাপ্রবাহের মত একটি শোঁয়াপোকা যে দিকে যায় সকলেই দলে দলে তাকে অনুসরণ করে, সে পথ যতই বিপজ্জনক হোক না কেন। তিনি দেখেছিলেন এক লজ্জাবতী লতার টবের কিনারার উপরে কতকগুলি শোঁয়াপোকা খাদ্যান্বেষণের জন্যে উঠেছিল। তারা টবের কিনারার ওপরে দিনের পর দিন ঘুরে চলেছিল, তাদের আর বিশ্রাম ছিল না। তারা এতই নির্বোধ যে, টবের গা বেয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টাও করে নি। কয়েক দিন অনাহারে অবিরাম ঘুরতে ঘুরতে নিদারুণ ক্লান্তিতে সকলেরই

৫১৬ দিনের মধ্যে একে একে মৃত্যু হলো। শোঁয়াপোকার এই ভ্রমণ-প্রবণতার কারণ জানতে হলে তাদের স্নায়ুতন্ত্রের গঠন-কৌশল ও এর কর্মক্ষমতা বিষয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন। এ পথও গোপালচন্দ্র উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যেও অনুরূপ মৃত্যু-অভিযানের কথা জানা আছে।

আপনারা তো বড় যুদ্ধের কথা শুনেছেন, কিন্তু আমি বলব অনেকেই পিঁপড়ের যুদ্ধ দেখেন নি। হাজার হাজার পিঁপড়ের সে কি ভীষণ যুদ্ধ ঘটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এই কলকাতারই কাছে, সোনারপুরের একটি বাগানে, ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে। যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল বৈকালে এবং চলেছিল প্রায় দুই দিন। হাজার হাজার সৈন্য নিহত হয়েছিল এই যুদ্ধে। সত্যই তাদের যুদ্ধে নিপুণতা প্রশংসনীয়। যুদ্ধের সময় সৈনিক পিঁপড়েরা শরীরের পশ্চাদদিক থেকে মাঝে মাঝে এক ঝাঁঝাঁলো গ্যাস বের করে দিয়ে শত্রুদের নিস্তেজ করে দিচ্ছিল। গরিলাযুদ্ধ ও হাতাহাতি প্রচণ্ড যুদ্ধ তো চলেছিলই। যুদ্ধের কিছুক্ষণের মধ্যেই যখন বিচক্ষন সৈনিকেরা আর একটি ফ্রণ্ট বা রণাঙ্গণ খুলে সেই দিকে ধাবিত হলো তখন দেখা গেল হাজার হাজার লাল পিঁপড়ের মৃতদেহে পূর্বেকার রণভূমি লাল হয়ে উঠেছিল। চোখে না দেখলে সে দৃশ্য বিশ্বাস করা যায় না। পরিত্যক্ত রণভূমি থেকে এক তীব্র গন্ধ আসছিল, সে গন্ধ ঐ বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধ। এই ঘটনার পরও তিনি বহুবার পিঁপড়ের রণকৌশল নিরীক্ষণ করেছেন। এটা স্পষ্ট যে, প্রতিটি প্রাণীর শরীরে আত্মরক্ষার ও আক্রমণের জন্যে ব্যবস্থা আছে। তবে বহু তথ্যই আমাদের অজানা। এই সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করার জন্যে প্রয়োজন শুধু এই প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর ন্যায় নিরলস প্রচেষ্টা, অধ্যবসায়, কৌতূহলী এবং বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী।

পিঁপড়ের প্রজাতি নির্ণয় এবং যৌন পরিবর্তন সম্বন্ধে মৌলিক তথ্য—গোপালচন্দ্র যা দিয়েছেন, সেগুলি প্রাণী-শারীরবৃত্তে গবেষণার পথ আরও এক দিকে উন্মুক্ত করেছে। পিঁপড়ের পুরুষ, রাণী ও শ্রমিকের জন্ম বা তাদের মধ্যে যৌন-পরিবর্তন সম্বন্ধে তিনি যে তথ্যগুলি প্রকাশিত করেছেন,

সেগুলি এখনও গবেষণার বিষয়। ১৯৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন রাণী-পিঁপড়ের নিষিক্ত ডিম থেকে শ্রমিক এবং অনিষিক্ত ডিম থেকে পুরুষ পিঁপড়ের জন্ম হয়। শ্রমিক পিঁপড়েরা সারা বছর অনিষিক্ত ডিম পাড়ে। কাজেই এই ডিমগুলি থেকেই কেবলমাত্র শ্রমিকের জন্ম হয়। পিঁপড়ের বাসায় সাধারণতঃ শ্রমিকেরাই বাস করে। ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে পুরুষ ও রাণী-পিঁপড়ের আবির্ভাব হয়। গ্রীষ্মকালে গাছে যখন নতুন মঞ্জরী বা ফুলের কুঁড়ি দেখা যায় এবং অ্যাফিড্স ও অন্যান্য পোকামাকড় আসে সে সময় শ্রমিক পিঁপড়েগুলি অ্যাফিড্সের ক্ষরিত রস সংগ্রহ করে এনে বাচ্চাদের খাওয়ায়। লাল পিঁপড়ের কৃত্রিম বাসায় ফুলের কুঁড়ি ও অ্যাফিড্স সরবরাহ করে তিনি পুরুষ ও রাণী-পিঁপড়ে জন্মাতে দেখেছেন। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে তাঁর ধারণা হলো লাল পিঁপড়ের মধ্যে পুষ্টিকর পদার্থের তারতম্যের জন্যে এদের যৌন-পরিবর্তন সম্ভব হতে পারে। উপরিউক্ত ক্ষরিত রসবিহীন খাদ্য দিয়ে তিনি দেখেছেন সেই বাসায় কেবলমাত্র শ্রমিক পিঁপড়ের জন্ম হয়। পিঁপড়ের শরীরের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে খাদ্যের পরিমাণ ও উপাদানের উপর। রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন অ্যাফিড্সের ক্ষরিত রসে প্রচুর ভিটামিন $B_1$ আছে। তবে শুধু ভিটামিন $B_1$ প্রয়োগ করলেই পিঁপড়ের এরূপ যৌন-পরিবর্তন হয় না। সম্ভবতঃ ভিটামিন $B_1$ সমেত অন্যান্য পুষ্টিকর পদার্থ ও ভিটামিন দিয়ে পিঁপড়ের গ্রন্থিগুলিকে উদ্দীপিত করিয়ে প্রকৃত পুরুষ ও স্ত্রীর বিশেষ গাঠনিক ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটানোর জন্যে প্রয়োজন। পিঁপড়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে যৌন-পরিবর্তন হয় কিনা বলা কঠিন। তবে এটুকু বলা যেতে পারে যে, গোপালচন্দ্রের নির্দেশিত গবেষণার পথে গবেষকগণ অগ্রসর হলে বহু রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারবেন। আমাদের দেশে যে পিঁপড়েগুলি পাওয়া যায়, তাদের ভিটামিন বা হর্মোন নিয়ন্ত্রিত শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতি খুব বেশী জানা নেই।

পিঁপড়ের প্রণয়ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। কোন

এক প্রজাতির পিঁপড়ের মধ্যে (Diacamma vagans, Smith) যে স্ত্রী-পিঁপড়ে আছে সেটা পূর্বে জানা ছিল না। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে একটি নিবন্ধে হুইলার (W. Weeler) মত প্রকাশ করেছিলেন ডায়াকামা (Diacamma) জাতের পিঁপড়ের মধ্যে কোন কোন শ্রমিকেরা (Gynaecoid workers) স্ত্রী-পিঁপড়ের কাজ করে। হুইলারের এই মত তিনি সমর্থন করলেন না। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণাগারে স্বাভাবিক পরিবেশে পিঁপড়ে প্রতিপালন করেএবং তাদের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করে তিনি পরীক্ষা করতে লাগলেন যে তাদের মধ্যে স্ত্রী-জাতীয় পিঁপড়ে পাওয়া যায় কিনা। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, পিঁপড়েগুলিকে অল্প খাদ্য দিলে সেই দলের বাইরে থেকে পুরুষ পিঁপড়ে এসে হাজির হয়। কিছুক্ষণ পর দেখা যেত কোন কোন শ্রমিকের সঙ্গে পুরুষ পিঁপড়ের যৌন-মিলন। এই দৃশ্য দেখে তিনি তিনি ধারণা করলেন এই বিশেষ শ্রমিকেরা হয়তো প্রকৃত শ্রমিক পিঁপড়ে নয়, তারা প্রকৃত পক্ষে স্ত্রী-পিঁপড়ে।

গোপালচন্দ্রের কাজের আর শেষ নেই, বেশীরভাগ গবেষণা তিনি একাই করেছেন। এক কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি অন্য কাজও করতেন। যদিও প্রধানতঃ বিভিন্ন প্রাণীদের স্বভাব-ধর্ম ইত্যাদি পরীক্ষানিরীক্ষা করতেন, তারই ফাঁকে পুনরায় উদ্ভিদ নিয়ে কাজ করে যেতেন। উদ্ভিদ থেকে কীট-পতঙ্গ কীট-পতঙ্গ থেকে প্রোটোজোয়া ( এককোষী প্রাণী ), মাছ, ব্যাঙাচি, সাপ ও বেজী, আবার উদ্ভিদ, আবার কীট-পতঙ্গ, এভাবেই আসা যাওয়া চলেছিল। প্রোটোজোয়া সম্বন্ধে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা আছে। কত রকমের যে অদ্ভুত প্রোটোজোয়া আছে তার যেন আর ইয়ত্তা নেই। ডায়াটমের (Bacillaria paradoxa) সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আলোর সংস্পর্শে বা অন্য কোন উদ্দীপনায় ডায়াটমের দেহ প্রসারিত হয়ে মালার আকার ধারণ করে এবং পরক্ষণেই পূর্ব আকৃতিতে ফিরে যাবার প্রচেণ্টা আরম্ভ হয়। মাছ জলে বাস করে, আবার কোন কোন মাছের জলে ডুবেই মৃত্যু ঘটে। গোপালচন্দ্র দাবী করেন কৈ মাছের 'জল ডুবি' পরীক্ষা তিনিই প্রথমে করেন। সাপের বিষ নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন। সাপ

ও বেজীর লড়ায়ের তাৎপর্য তিনি পরীক্ষা করে জানবার চেষ্টাও করেছেন। এই সমস্ত কাজের মধ্যেও লজ্জাবতী লতার পাতার সংকোচন-প্রসারণের কারণ সম্বন্ধে তিনি অনুসন্ধান করেছিলেন। সহকর্মীদের সঙ্গে যখন লজ্জাবতী লতার পালভাইনাসের নির্যাসের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে সক্রিয় পদার্থটি অনুসন্ধান করেছিলেন, সে সময় তিনি লক্ষ্য করেন পালভাইনাসের সংকোচনের উপর জলের ভূমিকাই প্রধান। জেনী রেনৎসের মাইমোসিন মতবাদ, তিনি মেনে নিতে পারলেন না।

যে সময়ে গোপালচন্দ্র পিঁপড়ের বৃদ্ধি ও যৌন পরিবর্তনের উপর বিভিন্ন পুষ্টিকর পদার্থের ও অ্যান্টি-বায়োটিকের কার্যকারিতা নিরীক্ষা করছিলেন, সেই সময় তিনি কতকগুলি ব্যাঙাচি জলে রেখে তার মধ্যে কিছুটা পেনিসিলিন দিলেন। পেনিসিলিন প্রয়োগে ব্যাঙাচির দেহে কি পরিবর্তন হয়, তা তিনি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। অনেকেই জানেন ব্যাঙ জলে ডিম পাড়ে। দু-এক দিনের মধ্যেই ডিম ফুটে ছোট ছোট ব্যাঙাচি বের হয়। সে সময় এরা লেজের সাহায্যে জলে সাঁতার কাটে। ব্যাঙাচি ক্রমশঃ বড় হতে থাকে এবং পিছনের পা দেখা দেয়। জলজ উদ্ভিদের পাতা ও শ্যাওলা খেয়ে এরা বেশ পরিপুষ্ট হয়। প্রায় দেড়-দুই মাসের শেষে এদের সামনের পা দেখা দেয়, তারপর ২।৩ দিনের মধ্যেই লেজটি দেহের সঙ্গে মিশে যায় এবং পূর্ণবয়স্ক ব্যাঙের আকৃতি ধারণ করে জল থেকে বেরিয়ে আসে। ব্যাঙাচির এই ধারাবাহিক পরিবর্তনের উপর পেনিসিলিন ও ষ্ট্রেপটোমাইসিনের ক্রিয়া তিনি পরীক্ষা করতে লাগলেন। তিনি বললেন পেনিসিলিন প্রয়োগে ব্যাঙাচির রূপান্তর অনেক দেরীতে হয় এবং ভিটামিন $B_2$ প্রয়োগে রূপান্তর তাড়াতাড়ি হয়। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এ বিষয়ে তিনি একটি ছোট প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের তৎকালীন ডিরেক্টর ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু গোপালচন্দ্রের এই উল্লেখযোগ্য নিরীক্ষায় উৎসাহিত হয়ে এ পথে উন্নততর গবেষণার জন্য মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রধান ডঃ প্রমথনাথ নন্দীর সহায়তায় একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বর্তমান লেখকের এই পরিকল্পনায় যোগ দেবার সৌভাগ্য হয় ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে। ব্যাঙাচির রূপান্তর একটি

জটিল পদ্ধতি। পাশ্চাত্য দেশে বহু প্রখ্যাত বিজ্ঞানী বহু বছর যাবৎ ব্যাঙাচির রূপান্তরের রহস্য উদ্ঘাটন করার চেস্টা করে আসছেন। হয়তো বলা যেতে পারে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রাণী-শারীরবৃত্তের বিভাগে গোপালচন্দ্র এবং তাঁর সহকর্মীগণ ব্যাঙাচির রূপান্তর সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন।

গোপালচন্দ্র বহু বৈজ্ঞানিক সমস্যা সৃষ্টি করেছেন এবং গবেষণার পথ বহু দিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তাঁর গবেষণালব্ধ বিষয়বস্তু আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিল। ডুবুরী মাকড়সার স্বভাব-ধর্ম এবং অন্যান্য কীট-পতঙ্গের জীবনযাত্রা প্রণালী, যেগুলি তিনি প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলি আমেরিকায় এবং অন্যান্য দেশেও বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। এর প্রমাণ বিভিন্ন দেশ-বিদেশের পত্রিকায় পাওয়া যায়। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে কীট-পতঙ্গের উপর আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রে (International Union of the study on social insects) ভারতীয় শাখা পরিচালনা করার জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। অনিবার্য কারণবশতঃ তিনি সেই আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে যোগদান করতে পারেন নি।

সীমিত পৃষ্ঠার মধ্যে গবেষক শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের গবেষণার বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করতে হলে অনেক কিছুই বাদ পড়ে যায়। এই প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর গবেষণার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তাঁরাই ভবিষ্যতে উপলব্ধি করবেন, যাঁরা তাঁর উন্মুক্ত পথে উন্নততর গবেষণায় ব্রতী হবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী না নিয়ে নিজের অধ্যবসায়ে প্রাণীজগতের রহস্য তিনি যা উদ্ঘাটন করেছেন, বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়গুলি তিনি যেভাবে সহজ ও সরল বাংলা ভাষায় বহু প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন, সেগুলি বিজ্ঞান জগতে অতি মূল্যবান সম্পদ। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বিজ্ঞানচর্চা ছাড়েন নি। এখনও তিনি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখে চলেছেন এবং দেখে যাচ্ছেন বিভিন্ন প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। সত্যই এঁর বিজ্ঞান সাধনায় আমাদের মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে যায়।



গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

এক পুরুষ ধরিয়া তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের সেবা করিয়া আসিয়াছেন।...বঙ্গভাষী প্রত্যেক বিজ্ঞান-সাধক গোপালবাবুর বৈজ্ঞানিক আলোচনায় কৃতিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রচেষ্টা খুব কমই হয়েছে। অক্ষয় কুমার দত্তের পর যে দু-একজনের নাম করিতে পারা যায় তাঁহাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গোপালবাবু।

সুকুমার সেন

তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি প্রথম যৌবন হইতে পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ মারা বিজ্ঞানী নহেন কিন্তু তিনি প্রকৃত বিজ্ঞানী।

বনফুল

যে কালে একমতে ইংরেজী ভাষা ছাড়া বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার বিষয়বস্তু প্রকাশের অন্য কোন উপায় ছিল না, সেই সময়েও তিনি বাংলা ভাষাতেই তাঁর গবেষণার বিষয়গুলি প্রকাশ করতেন। অর্ধশতাব্দীর অধিককাল তিনি বাংলা ভাষায় অজস্র বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করে দেশের জনগণের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা প্রসারে সহায়তা করে এসেছেন।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

গোপালবাবুর রচনার সঙ্গে আমি বহুকাল ধরে পরিচিত। পপুলার সায়েন্স তাঁর মতো লেখবার ক্ষমতা খুব কম লেখকেরই আছে।

অন্নদাশঙ্কর রায়